আশ্বিন ও কার্ত্তিক, ১৩২৪

সবুজ পত্র

সম্পাদক

শ্রীপ্রমথ চৌধুরী

বার্ষিক মূল্য দুই টাকা ছয় আনা।

সবুজ পত্র কার্য্যালয়, ৩ নং হেষ্টিংস্ ষ্ট্রীট,

কলিকাতা।

৪৩

কলিকাতা।
৩ নং হেষ্টিংস্ ষ্ট্রীট
শ্রীপ্রমথ চৌধুরী এম্, এ, বার-য়্যাট-ল কর্ত্তৃক
প্রকাশিত।

কলিকাতা।
উইক্লী নোটস প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্,
৩ নং হেষ্টিংস্ ষ্ট্রীট।
শ্রীসারদা প্রসাদ দাস দ্বারা মুদ্রিত।

অন্নচিন্তা।

—:※:—
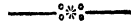
(১)

আমাদের বৈশেষিকেরা বলেছেন অভাব একটী পদার্থ। এমন সূক্ষ্মদৃষ্টি না থাক্‌লে কি আর তাঁদের চোখে পরমাণু ধরা পড়ে। আজ এই ঘোরতর অন্নাভাবের দিনে, অভাব যে একটা অতি কঠিন পদার্থ তাতে কে সন্দেহ করে? অথচ এই তত্ত্বটী প্রাচীন আচার্য্যেরা জেনেছিলেন, যোগবলে। কেননা সে কালের ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতের ঘরে যে অন্নাভাব ছিল না সে বিষয়ে একালের ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতেরা একমত, আর বিলাতী সভ্যতাই যে দেশের সমস্ত রকম অভাবের মূল, অর্থাৎ ঐ সভ্যতার আমদানীর পূর্ব্বে যে দেশে কোনও কিছুরই অভাব ছিল না এ তো আমাদের সকলেরই জানা কথা। সুতরাং কি ঘরে কি বাইরে কোনও স্থানেই বৈশেষিক আচার্য্যেরা অভাবকে প্রত্যক্ষ করেন নাই। কাজেই সে সম্বন্ধে তাঁরা যে তত্ত্বটী প্রচার করেছেন সেটী পুরাণের ভবিষ্যৎরাজবংশাবলীর মত, আর সুশ্রুতের শারীর-স্থান-বিদ্যার মত সম্পূর্ণ ধ্যানলব্ধ সামগ্রী।

কুতার্কিক লোকে হয়তো এই খানে তর্ক তুল্‌বেন যে বৈশেষিকেরা যে অভাবকে পদার্থ বলেছেন সে অভাবের অর্থ কেবল negation. আর পদার্থ মানে বস্তু নয় বিলাতী দর্শনে যাকে বলে category তাই। এবং এই তত্ত্বটীর অর্থ মাত্র এই যে অভাব বা negation মনন-

ব্যাপারের অর্থাৎ thought-এর একটা necessary ক্যাটিগরি। কিন্তু এই তর্ক আর কিছুই নয়, এ হ'ল হিন্দু দর্শনের পবিত্র মন্দিরেও ম্লেচ্ছ সংস্পর্শ ঘটিয়ে তার জাত মারবার চেষ্টা। নিশ্চয় জানি কোনও খাঁটি হিন্দু এ সব তর্কে কান দেবেন না। সুতরাং এ তর্কের উত্তর দেওয়া নিষ্প্রয়োজন।

প্রাচীনকালে যে ভারতবর্ষে অন্নাভাব ছিল না তার একটী অতি নিঃসংশয় প্রমাণ আছে। মাধবাচার্য্য তাঁর সর্ব্বদর্শন-সংগ্রহে ছোট বড় সমস্ত রকম দর্শনের বিবরণ দিয়েছেন। একটি পাণিনিদর্শনের বর্ণনা আছে যাতে প্রমাণ করা হয়েছে যে ব্যাকরণ-শাস্ত্রই পরম পুরুষার্থের সাধন; ঐ শাস্ত্রের পারদর্শী না হ'লে সংসার-সাগর পারের আশা দুরাশা এবং ঐ শাস্ত্রই মোক্ষমার্গের অতি সরল রাজপথ।' এমন কি একটী রসেশ্বরদর্শন আছে যাতে যুক্তি এবং শ্রুতি উভয় প্রমাণেই প্রতিপাদিত হ'য়েছে যে রস বা পারদই পরব্রহ্ম। রসার্ণব, রসহৃদয় প্রভৃতি প্রামাণিক দার্শনিক গ্রন্থ থেকে যুক্তি-প্রমাণ উদ্ধৃত হয়েছে; এবং রসজ্ঞেরা শুনে খুসি হবেন যে শ্রুতিপ্রমাণটী আহৃত হ'য়েছে সেটী তাঁদের সুপরিচিত "রসো বৈ সঃ রসো হ্যেবায়ং লব্ধানন্দী ভবতি" এই শ্রুতিবাক্য। এমন পুঁথিতেও অন্নদর্শন ব'লে কোনও দর্শনের বিবরণ দূরে থাক নাম পর্য্যন্ত নেই। এ থেকে কেবল এই অনুমানই সম্ভব যে প্রাচীনকালে এ দেশে অন্নাভাব না থাকায় অন্নচিন্তাও ছিল না, এবং বিষয়টা সম্বন্ধে একবারে চিন্তার অভাবেই এ বিষয়ে কোনও দর্শনের উদ্ভব হয় নি। কেননা ও-বিষয়ে কিছুমাত্র চিন্তা থাক্‌লে যে তার একটা দর্শনও থাক্‌ত তাতে বোধ হয় যে প্রমাণ দেখিয়েছি তারপর আর কোনও বুদ্ধিমান লোকে সন্দেহ ক'র্‌বেন না। এবং আমার এই

যুক্তিটী যে সম্পূর্ণরূপে 'বিজ্ঞানানুমোদিত ঐতিহাসিক প্রণালী সম্মত' তাও নিশ্চয়ই সকলেই স্বীকার ক'র্‌বেন।

কিন্তু যখন বৈজ্ঞানিক-ঐতিহাসিকের উচ্চাসন একবার গ্রহণ করেছি তখন কোনও সত্যই গোপন কর্‌লে চল্‌বে না। অপ্রীতিকর হলেও সত্য কথাই প্রকাশ করে বলতে হবে! অপ্রাচীন দার্শনিক যুগে (১) যে, দেশে অন্নাভাব ও অন্নচিন্তা ছিল না এ বিষয়ে সর্ব্ব-দর্শন-সংগ্রহের প্রমাণ অকাট্য। কিন্তু ঐতিহাসিকের নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে দেখলে দেখা যাবে যে খুব প্রাচীন অর্থাৎ বৈদিক যুগে কিছু কিছু অন্নাভাব ছিল। কেননা শ্রুতিতে অন্ন সম্বন্ধে আলোচনা দেখা যায়। এর বিস্তৃত প্রমাণ দেওয়া অনাবশ্যক! একটা দৃষ্টান্ত দিলেই যথেষ্ট হতে পারে। ধরুন তৈত্তিরীয় উপনিষদের ভৃগুবরুণের উপাখ্যান। আমার সুপণ্ডিত পাঠকগণের অবশ্যই এই শ্রুতি-প্রসঙ্গটী জানা আছে। বরুণের পুত্র ভৃগু যখন পিতার কাছে ব্রহ্ম সম্বন্ধে উপদেশ জিজ্ঞাসা করলেন তখন বরুণ তাঁকে বললেন তপস্যাদ্বারাই ব্রহ্মকে জানা যায়, তুমি তপস্যা কর। তবে সুবিধার জন্য ব্রহ্মের সম্বন্ধে একটা 'ফরমুলা' বলে দিলেন, 'যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে' ইত্যাদি। তপস্যা করে ভৃগু জানলেন অন্নই ব্রহ্ম। অন্ন থেকেই সকলের জন্ম হয়, জন্মের পর অন্নের বলেই সকলে বেঁচে থাকে, অন্নের দিকেই সকলের গতি এবং শেষে অন্নেই সবাই লীন হয়,' অতএব অন্নই ব্রহ্ম। ভৃগু এই জ্ঞানটুকু লাভ করে পিতার কাছে গেলে বরুণ তাঁকে আবার তপস্যা করতে বললেন। দ্বিতীয়বার তপস্যায়

(১) আদি অন্ত ঠিক জানা না থাকলেও এই রকম যে একটা যুগ ছিল এটা জানা আছে। ম্যাক্সমুলর দেখুন।

ভৃগুর বোধ হল প্রাণই ব্রহ্ম। এই রকমে তৃতীয়বারে জানলেন মনই ব্রহ্ম। চতুর্থ বারে বুঝলেন বিজ্ঞানই ব্রহ্ম। অবশেষে শেষবার তপস্যায় এই জ্ঞানে পৌঁছিলেন যে আনন্দই ব্রহ্ম। এই হল ভৃগু-বরুণের গল্প, যাকে বলে 'ভার্গবী বারুণী বিদ্যা'। এই শ্রুতি সম্বন্ধে শঙ্কর ও অন্যান্য ভাষ্যকারেরা নানা তর্ক তুলেছেন, 'পঞ্চকোষ বিবেক' নানা রকম সব দুর্ব্বোধ্য জটিলতার অবতারণা করেছেন কিন্তু এর প্রকৃত অথচ সহজ ইঙ্গিতটী কেহই ধরতে পারেন নি। এই উপাখ্যানের প্রকৃত তাৎপর্য্য কি এই নয় যে গোড়ায় অন্ন থাকলে তবেই শেষ পর্য্যন্ত আনন্দ পাওয়া যায়! ইহাই যে শ্রুতির প্রকৃত মর্ম্ম ও শিক্ষা তাতে আমার বিন্দুমাত্র সংশয় নেই, এবং একটু বিচার করে দেখলে বোধ হয় পাঠকেরও কোনও সন্দেহ থাকবে না। কেননা উপাখ্যানটী শেষ করেই শ্রুতি চারটী পরিচ্ছেদে কেবল অন্নেরই প্রশংসা করেছেন। এবং তার মধ্যে এমন সব শ্রুতি আছে যাতে যে-কোনও 'ইকনমিষ্টের' প্রাণ আহ্লাদে নৃত্য করে উঠবে। কিন্তু প্রকৃত ব্যাপারটা এই যে উপাখ্যানটী পড়লেই বিংশশতাব্দীর সভ্যতার উজ্জ্বল আলোতে ওর প্রকৃত অর্থটা স্পষ্ট ধরা পড়ে; এবং শঙ্কর প্রভৃতি প্রাচীন দার্শনিকেরা কেন যে ওর যথার্থ মর্ম্ম বুঝতে পারেন নি তার কারণও সুস্পষ্ট হয়ে উঠে। পূর্ব্বেই প্রমাণ করেছি যে ঐ সব দার্শনিকদের সময়ে কোনও অন্নাভাব ও অন্নচিন্তা ছিল না। এবং তাঁদের যে কোনও historical sense বা 'ঐতিহাসিক অনুভূতি' ছিল না তা যাঁর ঐ sense বিন্দুমাত্র আছে তিনিই জানেন। সেইজন্য বৈদিক সময় যে তাঁদের সময়ের চেয়ে কিছুমাত্র অন্য রকম ছিল এটা তাঁরা কল্পনাই করতে পারতেন না। ফলে বর্ত্তমান কালে

আমরা যে higher criticism বা 'উচ্চতর অঙ্গের সমালোচনার' বলে প্রাচীনকালের মনের কথাটা একবারে ঠিকঠাক বুঝে নিতে পারি, শঙ্কর প্রভৃতির সে সামর্থ্য ছিল না। অবশ্য ঐ সমালোচনা-প্রণালীর নামের higher বিশেষণটা যাঁরা ও-প্রণালীটা প্রবর্ত্তন করেছেন তাঁরাই দিয়েছেন, কিন্তু সত্যের খাতিরে বিনয়কে উপেক্ষা করবার মত সৎসাহস তাঁদের সকলেরি ছিল।

যা হোক পূর্ব্ববর্ত্তী আলোচনার ফলে এটা বেশ জানা গেল যে বৈদিক সময়ের পরে আর অন্নচিন্তায় আমাদের পূর্ব্বপুরুষেরা বড় মাথা ঘামান নি। তাঁরা ব্রহ্মসূত্র রচনা করেছেন এবং কামসূত্রেরও অনাদর করেন নি, কিন্তু মাঝখান থেকে অন্নসূত্রটা একেবারে বাদ দিয়েছেন। এর ফলভোগ করছি আমরা, তাঁদের এ যুগের বংশ-ধরেরা। আমাদের অন্নের অভাব অত্যন্ত বেশী, এবং কিসে ও বস্তুটার কিছু সংস্থান হয় তার একটা মোটামুটী রকম মীমাংসারও বিশেষ প্রয়োজন; কিন্তু বহুযুগের বংশাক্রমিক অনভ্যাসের ফলে ও-সম্বন্ধে চিন্তা বা আলোচনা করতে গেলেই গোলযোগ উপস্থিত হয়। তখন আমরা কে যে কি বলি তার কিছু ঠিক থাকে না। সেইজন্য আমাদের বাঙ্গালা-দেশে দেখা যায়, যিনি আইনের বিদ্যা ও বক্তৃতা বেচে টাকা জমিয়েছেন, তিনি সভায় দাঁড়িয়ে বাঙ্গালীর ছেলেকে ইস্কুল কলেজে বৃথা সময় নষ্ট না করে চট্‌পট্‌ ব্যবসা-বাণিজ্যে লেগে যেতে খুব জোরাল বক্তৃতা দেন। অবশ্য সেই ব্যবসা-বাণিজ্যের মূলধনের জন্য তাঁর জমান টাকার কোনও অংশ পাওয়া যাবে না, কেন না তাঁর যে বংশধর ওকালতি করবে কিন্তু উপার্জ্জন করবে না তার জন্য সটা সঞ্চিত থাকা নিতান্ত দরকার। এবং বলা বাহুল্য, যে শিল্প-

বাণিজ্যে না ঢুকে লেখাপড়া শিখে চাকুরী খুঁজে বেড়ায় বলে বাঙ্গলার যুবকেরা লেখায় ও বক্তৃতায় হিতৈষিদের গঞ্জনা শুনছে, সেই শিল্প ও বাণিজ্য দেশের কোথায় যে তাদের জন্য অপেক্ষা করে বসে আছে সেটা তাদের দেখান কেউ প্রয়োজন মনে করি নে। ভাবটা এই যে নাইবা থাক্‌ল বাঙ্গালীর ছেলের মূলধন নাই বা থাক্‌ল দেশে তাদের জন্য কোনও শিল্প-বাণিজ্য, তারা কেন প্রত্যেকেই বিনা মূলধনে আরম্ভ করে নিজের চেষ্টায় এক একটা শিল্পের বড় বড় কারখানা গড়ে তোলে না, বড় রকম ব্যবসার মালিক হয়ে বসে না। কেননা কোনও কোনও দেশে কোনও কোনও লোক যে কদাচিৎ ঐ রকম ব্যাপার করেছে, তা ত পুঁথিতেই লেখা আছে। তারপর আমাদের এই অন্ন-সমস্যার সমাধানের জন্য স্কুল কলেজ সব তুলে দিয়ে সে জায়গায় কৃষিপরীক্ষাশালা ও শিল্প-বিদ্যালয় খোলাই যে একমাত্র উপায় সে বিষয়ে কেউ যুক্তি-তর্ক দেখান; আর যাঁরা কাজের লোক তাঁরা যে হয় কোনও ছেলেকে, যা-হোক কিছু একটা শিখে আসবার জন্য, যে একটা হোক বিদেশে যাওয়ার জাহাজ-ভাড়া সাহায্যের জন্য চাঁদার খাতায় স্বাক্ষর করাতে আরম্ভ করেন। আর এ যুগের বাঙ্গালীর ছেলেও হয়েছে এক অদ্ভুত জীব। বর্ত্তমানে ধনেজনে যে জাতি পৃথিবীর মাথায় বসে আছেন শোনা যায়, বুকের মধ্যে তাঁদের হৃৎ-পিণ্ডে পৌঁছিতে হ'লে তাঁদের গায়ের জামার অংশবিশেষের ভিতর দিয়াই তার সোজা, এবং মন্দ লোকে বলে একমাত্র পথ। বাঙ্গালীর ছেলের অবস্থাটা ঠিক উল্টো। নিজের পকেট সম্বন্ধেও খুব বেশী সজাগ ও উৎসাহান্বিত করতে হলে, এদের একেবারে বুকের মধ্যে ঘা না দিলে কোনই ফল পাওয়া যায় না। দেশী শিল্পকে উৎসাহ

দলকে পুরোণো বৌ-মাষ্টারের দল—আর যে দলে ছোকরা বেশী জুড়ি কম, সে দলকে নতুন বৌ-মাষ্টারের দল বলাই সঙ্গত। এ দুটি নাম এই দুই দলের গায়ে যে কেমন খাপে খাপে বসে যায়, তা যাঁর চোখ আছে তাঁকে আর দেখিয়ে দিতে হবে না।

এ দলাদলির কারণটা যে কি, তা আমাদের বুঝে দেখা আবশ্যক।

এবার কংগ্রেসের যাত্রা শুনতে ভারত-সাম্রাজ্যের বড়কর্ত্তা স্বয়ং মন্‌টেগু সাহেব, সাত সমুদ্র তের নদী পাড়ি দিয়ে এদেশে আস্‌ছেন; এবং গুজব এই যে, তাঁকে খুসি করতে পারলে, তিনি আমাদের একটা মস্ত বড় পেলা দেবেন—স্বরাজ্য। সুতরাং এবারে কে মূল গায়েন হবেন—তাই নিয়েই যত মারামারি। মন্‌টেগু সাহেবের মনের খবর আমরা বড় একটা রাখিনে; কার গলা শুনে তিনি খুসি হবেন আর কার গলা শুনে তিনি চটে যাবেন,—পুরুষের মেয়েলি গলা আর স্ত্রীলোকের মর্দ্দানা আওয়াজ, এ দুয়ের ভিতর কোনটি তাঁর বেশী পছন্দসই—সে কথা বলা আমাদের পক্ষে অসাধ্য, কেননা আমরা হচ্ছি সাহিত্যিক, রাজনৈতিক নই। যেহেতু আমাদের কাজ হচ্ছে ঘরের খেয়ে বনের মোষ তাড়ানো, আর এঁদের পরের খেয়ে দেশের গরু চরানো,—সে কারণ আমরা অবশ্য এঁদের চাইতে ঢের বেশী নির্ব্বোধ জীব। তবে সাহিত্যের দিক থেকে এ কথা আমরা নির্ভয়ে বল্‌তে পারি যে, শ্রীমতী আনি বেসাণ্ট যে বক্তৃতা পাঠ করবেন, তা পাঠ করে আমরা খুসি হব; কেননা তাতে এমন একটি জিনিস থাকবে, যা কংগ্রেসের ধাতে

নূতন দল এর উত্তরে বলেন,—হ্যাদেখো, তোমরা গত ত্রিশ বৎসর ধরে চেয়ে আসছ বটে, কিন্তু মেকি ছাড়া আর কিছু পেয়ে এসো নি। এখন যখন বিলেত আমাদের বহুকালের দেনা পরিশোধ কর্‌তে উদ্যত হয়েছে—তখন আমাদের ন্যায্য পাওনা আমরা ষোল আনা বুঝে নেব, আর তার প্রতি পয়সাটি বাজিয়ে নেব।

এখন ন্যায্য পাওনাটা কি, তাই নিয়েই ত যত গোল। এ বিষয়ে কোনও পক্ষের যে একটা পরিষ্কার ধারণা আছে, তার পরিচয় ত তাঁদের কথাবার্ত্তায় বড় একটা পাওয়া যায় না। গোলের মূল ত ঐখানেই। আমাদের ভাবী "স্বরাজের" একটা স্পষ্ট রূপ কারও চোখে নেই— অথচ তার নাম সকলের মুখেই রয়েছে। অতএব আসল বস্তুর চাইতে তার নামের মাহাত্ম্য ঢের বেড়ে গেছে! তাই "হোম-রুল" এবং সেল্‌ফ্‌-গভর্ণ্‌মেণ্ট উভয়ে যুদ্ধং দেহি বলে কংগ্রেসের আসরে নেবেছেন। অথচ এই দুটি বাক্যের যে একই অর্থ, তার দলিল কংগ্রেস ও মোস্‌লেম লীগের দস্তখতি দরখাস্ত। অতএব দেখা গেল ঝগড়াটা পালা নিয়েও নয়, কেননা উভয় পক্ষের মতেই এবার কংগ্রেসে অযোধ্যা কাণ্ডের অভিনয় হবে—অর্থাৎ লক্ষ্ণৌএর পালার পুনরভিনয় হবে। সুতরাং দাঁড়াল এই যে—"বর বড় কি কণে বড়" এই নিয়েই আড়াআড়ি।

রাজনীতিতে রাজনীতিতে যখন বিবাদ ঘটে, তখন তার মীমাংসা করে দিতে পারে একমাত্র সরল নীতি ; আর যেখানে দু-পক্ষই বেঁকে বসে, সেখানে তাদের সিধে করে বসাতে পারে একমাত্র সেই লোক— যিনি কোনও পক্ষেরই তাঁবে নন, এবং দু-পক্ষেরই উপরে। সুতরাং এ অবস্থায় স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ মধ্যস্থ হতে বাধ্য হয়েছেন।

রবীন্দ্রনাথের এই আসরে নামাতে, দেশে হরিষে বিষাদ উপস্থিত হয়েছে। রাজনীতি যাঁদের ব্যবসা নয়, সেই সব দেশভক্ত লোকের হর্ষের কারণ,—তাঁরা জানেন মনের উদারতায় আর হৃদয়ের গভীরতায় তাঁর সমকক্ষ ভারতবর্ষে আর দ্বিতীয় ব্যক্তি নেই, এবং তাঁর বাণী পৃথিবীসুদ্ধ লোক কাণ খাড়া করে শুনবে, কেননা ভাষার সৌন্দর্য্যে আর ভাবের ঐশ্বর্য্যে সে বাণীর তুলনা ভূ-ভারতে মেলা দুর্লভ। অপর পক্ষে রাজনীতি যাঁদের পেশা, তাঁরা ভয় পান যে কংগ্রেসের আসরে দণ্ডায়মান হলে তিনি শুধু প্রেমের গান গাইবেন,—কেননা তিনি কবি। তিনি যে হিংসার গান গাইবেন না, এ কথা সত্য। দেশের কথা আর দ্বেষের কথা যে এক কথা নয়, এ বানান-জ্ঞান তাঁর আছে।—ভয়ের আরও কারণ আছে। রবীন্দ্রনাথ শুধু কবি নন, তার উপর তিনি বাউল,—সুতরাং তিনি কংগ্রেসের সাধা রাগ ও বাঁধা তাল কিছুই মানবেন না, এমন কি সে বৈঠকের কায়দাকানুনও নয়। যেখানে হাঁটুগেড়ে বসে সুরভাঁজা দস্তুর, সেখানে হয়ত তিনি খাড়া হয়ে দাঁড়িয়ে খোলা গলায় এমনি সুর ধরে দেবেন, যে সুরের আগুন

ছড়িয়ে যাবে সবখানে। কাজেই রাজনীতির পেশাদার ওস্তাদেরা হয় গালে হাত দিয়ে বসে ঢোক গিলছেন, নয় বিড়বিড় করে প্রলাপ বকছেন।

আমি বলি তোমাদের কোনও ভয় নেই। যে চোরা গলিতে তোমরা ঢুকেছ, সেখান থেকে কেউ যদি তোমাদের উদ্ধার করতে পারে—তাহলে এক রবীন্দ্রনাথই পারবেন, অপর কেউ পারবে না। কেননা তিনি মুক্ত আকাশের দেশের লোক,—তাঁর অনুগামী যে হবে, তাকে দিনের আলোয় সত্যের সরল ও উদার রাজপথে আসতেই হবে।

এদিকে তোমরা ত ভ্রাতৃবিরোধে মেতে আছ,—আর ওদিকে? ওদিকে এ দেশের বে-সরকারী ইংরেজের দলও মন্টেগু সাহেবকে বেশ ভাল করে গান শোনাবার জন্য বদ্ধপরিকর হয়েছেন। তাঁরা Bray-Chorus নামক একটি বিলাতি যাত্রার দল এক রাতে গড়ে তুলেছেন। এঁদের পালার নাম স্বরাজ-দমন, এবং তার ধুয়ো হচ্ছে—"হয় এদেশ থেকে সরব নয় এদেশকে সারব"। এতে আমাদের দু দলই ভয় খেয়ে গেছেন। চীৎকার এঁদের স্বরু হলে যে আমাদের সারা হয়, তার পরিচয় ত পূর্ব্বেও পেয়েছি। এর কারণও বেশ স্পষ্ট। কেননা প্রথমতঃ এঁরা গাইবেন বীররসের গান, আর আমরা করুণরসের; দ্বিতীয়তঃ এঁদের গলার জোর আমাদের চাইতে ঢের বেশী; তৃতীয়তঃ এঁরা সকলে একসঙ্গে গলা মিলিয়ে গাইতে পারেন—

যা আমরা মোটেই পারি নে। সুতরাং এ আশঙ্কা অসঙ্গত নয় যে, এঁদের বিরাট harmony-র ভিতর আমাদের স্বরাটের melody শোনাই যাবে না—বিশেষতঃ যখন ইংরেজ-কাগজওয়ালাদের জর্ম্মাণ ফুফুব্যাণ্ড গাল ফুলিয়ে দিন নেই রাত নেই এঁদের সঙ্গত করবে।

——————

মনু বলেছেন ভারতবর্ষে চারটি মাত্র বর্ণ আছে,— ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্র—কিন্তু নাস্তি পঞ্চমঃ। এ ত সেকালের কথা। একালে ভারতবর্ষে, চন্দ্রের দুই পক্ষের মত সবে দুটিমাত্র বর্ণ আছে,—কালো আর সাদা; এ সত্যটা আমরা ভুলে যাচ্ছিলুম বলে এই বে-সরকারী ইংরেজের দল সেটি আবার আমাদের কানে ধরে মনে করিয়ে দিয়েছেন। এর পর কালোর ভিতর দুটি পক্ষের স্বষ্টি শুধু দৃষ্টির অভাব থেকেই সম্ভব হয়।

——————

এ অবস্থায় আশা করা যায় যে, কংগ্রেসের দুটি ভাঙ্গাদল আবার জোড়া লাগবে। তবে প্রশ্ন হচ্ছে এই যে—কেমন করে? আমি বলি, তোমরা যা করে ভেঙ্গেছিলে, আবার তাই করে জোড় লাগাও,—অর্থাৎ না ভেবেচিন্তে। বিচ্ছেদ ঘটেছিল রাগের মাথায়—মিলন ঘটুক অনুরাগের ক্রোড়ে। অনুরাগ যে স্বভাবতঃই রাগের অনুসরণ করে, তার পরিচয় ত তার উপসর্গেই পাওয়া যায়।

———

"খণ্ডিতার" পুনর্মিলন ঘটাতে হলে অবশ্য কিঞ্চিৎ সাধ্যসাধনার আবশ্যক। এ সাধাসাধি একটু বেশী করেই করতে হবে, কেননা যাদের বাইরে মান নেই তাদের যে ঘরে অভিমান বেশী—এ সত্য ত জগদ্বিখ্যাত; আর তা ছাড়া এ কার্য্য নবীনদের পক্ষে করাই সঙ্গত, কেননা অতীতের প্রতি ভক্তি ত আমাদের সহজ ধর্ম্ম। তবে প্রবীণদের প্রতি আমার সানুনয় অনুরোধ এই যে, মানভঞ্জনের পালাটা যেন বেশী লম্বা না করেন। নইলে আমাদের রাজনীতির মিলনান্ত নাটক চাই কি বিয়োগান্ত প্রহসন হয়ে উঠতে পারে।

বাজারে গুজব যে, প্রবীণদল যেমন অভ্যর্থনা সমিতি হতে পালিয়ে এ যাত্রা নবীন দলের হাত থেকে বেঁচেছেন—তেমনি তাঁরা চেষ্টায় আছেন যে, বাঙ্গলা থেকে পালিয়ে এ যাত্রা কংগ্রেসকে বাঁচাবেন। কংগ্রেস ঠাঁই-নাড়া হলেই যে তাজা হয়ে উঠবে; তার কোনই সম্ভাবনা নেই। স্বরাটের নাম শুনলেই আমার সুরাটের কথা মনে পড়ে। দেশ যে একটু বেসামাল হলেই সুরট হয়ে ওঠে—যাঁর কিছুমাত্র রাগের জ্ঞান আছে, তিনিই তা জানেন। এ বিষয়ে আর বেশী কিছু বলা নিষ্প্রয়োজন। আক্কেলে ইসারা বাস্।

এই গৃহবিবাদের মূলে একটা ভুল ধারণা আছে। দুপক্ষই মনে করছেন যে, তাঁরা কে কি বলেন তার উপরই ভারতবর্ষের সমস্ত ভবিষ্যৎ নির্ভর করছে। এ হচ্ছে একটি প্রকাণ্ড ভ্রান্তি! ব্রিটীশ-সাম্রাজ্যে ভারত-বর্ষের স্থান যে কোথায়, সে সমস্যা আজ শুধু ঘরের সমস্যা নয়—

বাইরেরও সমস্যা। এবং এ সমস্যার মীমাংসায় ঘরের চাইতে বাইরের হাত বেশী থাকবে। কেননা যে সকল পলিটিকাল কূপ-মণ্ডুকদের দৃষ্টি ঘরের দেওয়ালেই আবদ্ধ, তাঁদের কাকলিও ঘরের বাইরে যায় না। ভারতবর্ষের ভাগ্য যে প্রসন্ন হয়েছে, সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই—কিন্তু তার ভিতর বিধাতার হাত আছে। ধর্ম্মের ঢাক আকাশে বাজে, কিন্তু সংসারের হট্টগোলে তার আওয়াজ আমরা বারোমাস শুনতে পাই নে। আজকের দিনে আকাশজুড়ে ধর্ম্মের জয়-ঢাক বেজে উঠেছে,এবং তার ধ্বনি বিশ্বমানবের কানে এসে পৌঁচেছে—এমন কি কোটী কোটী ভারতবাসীরাও তা শুনতে পেয়েছে,—কেননা তারা মূক হলেও বধির নয়। এই হচ্ছে একমাত্র আশার কথা। জাতীয় জীবনের একটি বিরাট পর্ব্ব তখনই রচিত হয়, যখন জাতির মনে একটি নূতন সত্যের আবির্ভাব হয়। এ ক্ষেত্রে বিশ্বমানব যে সত্যের সাক্ষাৎকার লাভ করেছে, সে হচ্ছে এই যে,—মানুষের সঙ্গে মানুষের আসল সম্পর্কটা হচ্ছে ভাই ভাইয়ের সম্পর্ক, দাস ও প্রভুর নয়। এই সত্যকে জীবনে প্রতিষ্ঠিত করাই হচ্ছে নবযুগের ধর্ম্ম। এই যুগ-ধর্ম্মের সাধনায় সকলকেই চাই, অথচ কাউকেও চাই নে;—অতএব সকলে এক হও, একলা সকল হতে চেষ্টা করো না।

৩০শে সেপ্টেম্বর ১৯১৭।

বীরবল।

আমার ধর্ম্ম।

—*—

সকল মানুষেরই "আমার ধর্ম্ম" বলে একটা বিশেষ জিনিস আছে। কিন্তু সেইটীকেই সে স্পষ্ট করে জানে না। সে জানে আমি খৃস্টান, আমি মুসলমান, আমি বৈষ্ণব, আমি শাক্ত ইত্যাদি। কিন্তু সে নিজেকে যে-ধর্ম্মাবলম্বী বলে জন্মকাল থেকে মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত নিশ্চিন্ত আছে সে হয় ত সত্য তা নয়। নাম গ্রহণেই এমন একটা আড়াল তৈরি করে দেয় যাতে নিজের ভিতরকার ধর্ম্মটা তার নিজের চোখেও পড়ে না।

কোন্ ধর্ম্মটি তার? যে-ধর্ম্ম মনের ভিতরে গোপনে থেকে তাকে সৃষ্টি করে তুল্‌চে। জীবজন্তুকে গড়ে তোলে তার অন্তর্নিহিত প্রাণ-ধর্ম্ম। সেই প্রাণধর্ম্মটির কোনো খবর রাখা জন্তুর পক্ষে দরকারই নেই। মানুষের আর-একটি প্রাণ আছে সেটা শারীর প্রাণের চেয়ে বড়—সেইটে তার মনুষ্যত্ব। এই প্রাণের ভিতরকার সৃজনী-শক্তিই হচ্চে তার ধর্ম্ম। এই জন্যে আমাদের ভাষায় ধর্ম্ম শব্দ খুব একটা অর্থপূর্ণ শব্দ। জলের জলত্বই হচ্চে জলের ধর্ম্ম, আগুনের আগুনত্বই হচ্চে আগুনের ধর্ম্ম। তেমনি মানুষের ধর্ম্মটিই হচ্চে তার অন্তরতম সত্য।

মানুষের প্রত্যেকের মধ্যে সত্যের একটি বিশ্বরূপ আছে আবার সেই সঙ্গে তার একটি বিশেষরূপ আছে। সেইটেই হচ্চে তার বিশেষ ধর্ম্ম। সেইখানেই সে-ব্যক্তি সংসারের বিচিত্রতা রক্ষা করচে। সৃষ্টির পক্ষে এই বিচিত্রতা বহুমূল্য সামগ্রী। এইজন্যে এ'কে সম্পূর্ণ নষ্ট

করবার শক্তি আমাদের হাতে নেই। আমি সাম্যনীতিকে যতই মানিনে কেন তবু অন্য সকলের সঙ্গে আমার চেহারার বৈষম্যকে আমি কোনো-মতেই লুপ্ত করতে পারিনে। তেমনি সাম্প্রদায়িক সাধারণ নাম গ্রহণ করে' আমি যতই মনে করি না কেন যে, আমি সম্প্রদায়ের সকলেরই সঙ্গে সমান ধর্ম্মের, তবু আমার অন্তর্য্যামী জানেন মনুষ্যত্বের মূলে আমার ধর্ম্মের একটি বিশিষ্টতা বিরাজ করচে। সেই বিশিষ্টতাতেই আমার অন্তর্য্যামীর বিশেষ আনন্দ।

কিন্তু পূর্ব্বেই বলেচি যেটা বাইরে থেকে দেখা যায় সেটা আমার সাম্প্রদায়িক ধর্ম্ম—সেই সাধারণ পরিচয়েই লোকসমাজে আমার ধর্ম্মগত পরিচয়। সেটা যেন আমার মাথার উপরকার পাগড়ি। কিন্তু যেটা আমার মাথার ভিতরকার মগজ, যেটা অদৃশ্য, যে-পরিচয়টি আমার অন্তর্যামীর কাছে ব্যক্ত, হঠাৎ বাইরে থেকে কেউ যদি বলে তার উপরকার প্রাণময় রহস্যের আবরণ ফুটো হয়ে সেটা বেরিয়ে পড়েছে, এমন কি তার উপাদান বিশ্লেষণ করে তাকে যদি বিশেষ একটা শ্রেণীর মধ্যে বদ্ধ করে দেয় তাহলে চমকে উঠতে হয়।

আমার সেই অবস্থা হয়েচে। সম্প্রতি কোনো কাগজে একটি সমালোচনা বেরিয়েচে তাতে জানা গেল আমার মধ্যে একটি ধর্ম্মতত্ত্ব আছে, এবং সেই তত্ত্বটি একটি বিশেষ শ্রেণীর।

হঠাৎ কেউ যদি আমাকে বল্‌ত আমার প্রেতমূর্ত্তিটা দেখা যাচ্চে তাহলে সেটা যেমন একটা ভাবনার কথা হত এও তার চেয়ে কম নয়। কেননা মানুষের মর্ত্ত্যলীলা সাঙ্গ না হলে প্রেতলীলা সুরু হয় না। আমার প্রেতটি দেখা দিয়েছে এ কথা বল্লে এই বোঝায় যে, আমার বর্ত্তমান আমার পক্ষে আর সত্য নয় আমার অতীতটাই আমার পক্ষে

একমাত্র সত্য। আমার ধর্ম্ম আমার জীবনেরই মূলে। সেই জীবন এখনো চল্‌চে—কিন্তু মাঝে থেকে কোনো এক সময়ে তার ধর্ম্মটা এম্‌নি থেমে গিয়েচে যে, তার উপরে টিকিট মেরে তাকে জাদুঘরে কৌতূহলী দর্শকদের চোখের সম্মুখে ধরে রাখা যায় এই সংবাদটা বিশ্বাস করা শক্ত।

কয়েক বৎসর পূর্ব্বে অন্য-একটি কাগজে অন্য-একজন লেখক আমার রচিত ধর্ম্মসঙ্গীতের একটি সমালোচনা বের করেছিলেন। তাতে বেছে বেছে আমার কাঁচা বয়সের কয়েকটি গান দৃষ্টান্ত স্বরূপ চেপে ধরে তিনি তাঁর ইচ্ছামত সিদ্ধান্ত গড়ে তুলে ছিলেন। যেখানে আমি থামি নি সেখানে আমি থেমেচি এমন ভাবের একটা ফোটোগ্রাফ তুল্‌লে মানুষকে অপদস্থ করা হয়। চল্‌তি ঘোড়ার আকাশে-পা-তোলা ছবির থেকে প্রমাণ হয় না যে, বরাবর তার পা আকাশেই তোলা ছিল এবং আকাশেই তোলা আছে। এইজন্যে চলার ছবি ফোটোগ্রাফে হাস্যকর হয়, কেবলমাত্র আর্টিষ্টের তুলিতেই তার রূপ ধরা পড়ে।

কিন্তু কথাটা হয়ত সম্পূর্ণ সত্য নয়। হয়ত যার মূলটা চেতনার অগোচরে তার ডগার দিকের কোনো-একটা প্রকাশ বাইরে দৃশ্যমান হয়েচে। সেই রকম দৃশ্যমান হবামাত্র বাইরের জগতের সঙ্গে তার একটা ব্যবহার আরম্ভ হয়েচে। যখনি সেই ব্যবহার আরম্ভ হয় তখনি জগৎ আপনার কাজের সুবিধার জন্যে তাকে কোনো-একটা বিশেষ শ্রেণীর চিহ্নে চিহ্নিত করে তবে নিশ্চিন্ত হয়। নইলে তার দাম ঠিক করা বা প্রয়োজন ঠিক করা চলে না।

বাইরের জগতে মানুষের যে পরিচয় সেইটেতেই তার প্রতিষ্ঠা। বাইরের এই পরিচয়টি যদি তার ভিতরের সত্যের সঙ্গে কোনো অংশে না

মেলে তাহলে তার অস্তিত্বের মধ্যে একটা আত্মবিচ্ছেদ ঘটে। কেননা মানুষ যে কেবল নিজের মধ্যে আছে তা নয়, সকলে তাকে যা জানে সেই জানার মধ্যেও সে অনেকখানি আছে। আপনাকে জানো এই কথাটাই শেষ কথা নয় আপনাকে জানাও এটাও খুব বড় কথা। সেই আপনাকে জানাবার চেষ্টা জগৎজুড়ে রয়েচে। আমার অন্তর্নিহিত ধর্ম্মতত্ত্বও নিজের মধ্যে নিজেকে ধারণ করে রাখতে পারে না—নিশ্চয়ই আমার গোচরে ও অগোচরে নানা রকম করে বাইরে নিজেকে জানিয়ে চলেচে।

এই জানিয়ে চলার কোনোদিন শেষ নেই। এর মধ্যে যদি কোনো সত্য থাকে তাহলে মৃত্যুর পরেও শেষ হবে না। অতএব চুপ করে গেলে ক্ষতি কি এমন কথা উঠতে পারে। নিজের কাব্যপরিচয় সম্বন্ধে ত চুপ করেই সকল কথা সহ্য করতে হয়। তার কারণ, সেটা রুচির কথা। রুচির প্রমাণ তর্কে হতে পারে না। রুচির প্রমাণ কালে। কালের ধৈর্য্য অসীম, রুচিকেও তার অনুসরণ করতে হয়। নিজের সমস্ত পাওনা সে নগদ আদায় করবার আশা করতে পারে না। কিন্তু যদি আমার কোনো একটা ধর্ম্মতত্ত্ব থাকে তবে তার পরিচয় সম্বন্ধে কোনো ভুল রেখে দেওয়া নিজের প্রতি এবং অন্যের প্রতি অন্যায় আচরণ করা। কারণ যেটা নিয়ে অন্যের সঙ্গে ব্যবহার চল্‌চে, যার প্রয়োজন এবং মূল্য সত্যভাবে স্থির হওয়া উচিত, সেটা নিয়ে কোনো যাচনদার যদি এমন কিছু বলেন, যা আমার মতে সঙ্গত নয় তবে চুপ করে গেলে নিতান্ত অবিনয় হবে।

অবশ্য একথা মান্‌তে হবে যে ধর্ম্মতত্ত্ব সম্বন্ধে আমার যা-কিছু প্রকাশ সে হচ্চে পথ-চল্‌তি পথিকের নোট-বইয়ের টোকা কথার,

মত। নিজের গম্যস্থানে পৌঁছে যাঁরা কোনো কথা বলেচেন তাঁদের কথা একেবারে সুস্পষ্ট। তাঁরা নিজের কথাকে নিজের বাইরে ধরে রেখে দেখতে পান। আমি আমার তত্ত্বকে তেমন করে নিজের থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেখি নি। সেই তত্ত্বটি গড়ে উঠতে উঠতে বেড়ে চল্‌তে চল্‌তে নানা রচনায় নিজের যে-সমস্ত চিহ্ন রেখে গেচে সেইগুলিই হচ্চে তার পরিচয়ের উপকরণ। এমন অবস্থায় মুস্কিল এই যে, এই উপকরণগুলিকে সমগ্র করে তোলবার সময় কে কোন্‌গুলিকে মুড়োর দিকে বা ল্যাজার দিকে কেমন করে সাজাবেন সে তাঁর নিজের সংস্কারের উপর নির্ভর করে।

অন্যে যেমন হয় তা করুন কিন্তু আমিও এই উপকরণগুলিকে নিজের হাতে জোড়া দিয়ে দেখতে চাই এর থেকে কোন্ ছবিটি ফুটে বেরয়।

:

কথা উঠেছে আমার ধর্ম্ম বাঁশির তানেই মোহিত; তার ঝোঁকটা প্রধানত শান্তির দিকেই, শক্তির দিকে নয়। এই কথাটাকে বিচার করে দেখা আমার নিজের জন্যেও দরকার।

কারো কারো পক্ষে ধর্ম্ম জিনিসটা সংসারের রণে ভঙ্গ দিয়ে পালাবার ভদ্র পথ। নিষ্ক্রিয়তার মধ্যে এমন একটা ছুটি নেওয়া যে-ছুটিতে লজ্জা নেই, এমন কি, গৌরব আছে। অর্থাৎ সংসার থেকে জীবন থেকে যে-যে অংশ বাদ দিলে কর্ম্মের দায় চোকে, ধর্ম্মের নামে সেই সমস্তকে বাদ দিয়ে একটা হাঁফ ছাড়তে পারার জায়গা পাওয়াকে কেউ কেউ ধর্ম্মের উদ্দেশ্য মনে করেন। এঁরা হলেন বৈরাগী। আবার ভোগীর দলও আছেন। তাঁরা সংসারের কতক-

গুলি বিশেষ রসসম্ভোগকে আধ্যাত্মিকতার মধ্যে চোলাই করে নিয়ে তাই পান করে জগতের আর-সমস্ত ভুলে থাকতে চান। অর্থাৎ এক দল এমন-একটি শান্তি চান, যে-শান্তি সংসারকে বাদ দিয়ে, আর অন্য দল এমন একটি স্বর্গ চান যে-স্বর্গ সংসারকে ভুলে গিয়ে। এই দুই দলই পালাবার পথকেই ধর্ম্মের পথ বলে মনে করেন।

আবার এমন দলও আছেন যাঁরা সমস্ত সুখ দুঃখ সমস্ত দ্বিধাদ্বন্দ্ব-সমেত এই সংসারকেই সত্যের মধ্যে জেনে চরিতার্থতা লাভ করাকেই ধর্ম্ম বলে জানেন। সংসারকে সংসারের মধ্যেই ধরে দেখলে তার সেই পরম অর্থটি পাওয়া যায় না। যে-অর্থ তাকে সর্ব্বত্র ওতপ্রোত করে' এবং সকল দিকে অতিক্রম করে' বিরাজ করচে। অতএব কোনো অংশে সত্যকে ত্যাগ করা নয় কিন্তু সর্ব্বাংশে সেই সত্যের পরম অর্থটিকে উপলব্ধি করাকেই তাঁরা ধর্ম্ম বলে জানেন।

ইস্কুল পালানোর দুটো লক্ষ্য থাকতে পারে। এক, কিছু না করা, আর-এক, মনের মত খেলা করা। ইস্কুলের মধ্যে যে-একটা সাধনার দুঃখ আছে সেইটে থেকে নিষ্কৃতি পাবার জন্যেই এমন করে প্রাচীর লঙ্ঘন, এমন করে দরোয়ানকে ঘুষ দেওয়া। কিন্তু আবার ঐ সাধনার দুঃখকে স্বীকার করবারও দু'রকম দিক আছে। একদল ছেলে আছে তারা নিয়মকে শাসনের ভয়ে মানে, আরেক দল ছেলে অভ্যস্ত নিয়ম পালনটাতেই আশ্রয় পায়—তারা প্রতিদিন ঠিক দস্তুরমত ঠিক সময়মত উপরওয়ালার আদেশমত যন্ত্রবৎ কাজ করে' যেতে পারলে নিশ্চিন্ত হয় এবং তাতে যেন একটা-কিছু লাভ হল বলে আত্মপ্রসাদ অনুভব করে। কিন্তু এই দুই দলেরই ছেলে নিয়মকেই চরম বলে দেখে—তার বাইরে কিছুকে দেখে না।

কিন্তু এমন ছেলেও আছে ইস্কুলের সাধনার দুঃখকে স্বেচ্ছায়, এমন কি, আনন্দে যে গ্রহণ করে, যেহেতু ইস্কুলের অভিপ্রায়কে সে মনের মধ্যে সত্য করে উপলব্ধি করেচে। এই অভিপ্রায়কে সত্য করে জানচে বলেই সে যে-মুহূর্ত্তে দুঃখকে পাচ্চে সেই মুহূর্ত্তে দুঃখকে অতিক্রম করচে, যে-মুহূর্ত্তে নিয়মকে মানচে সেই মুহূর্ত্তে তার মন তার থেকে মুক্তি লাভ করচে। এই মুক্তিই সত্যকার মুক্তি, সাধনা থেকে এড়িয়ে গিয়ে মুক্তি হচ্চে নিজেকে ফাঁকি দেওয়া। জ্ঞানের পরিপূর্ণতার একটি আনন্দচ্ছবি এই ছেলেটি চোখের সামনে দেখতে পাচ্চে বলেই উপস্থিত সমস্ত অসম্পূর্ণতাকে সমস্ত দুঃখকে সমস্ত বন্ধনকে সে সেই আনন্দেরই অন্তর্গত করে জানচে। এ ছেলের পক্ষে পালানো একেবারে অসম্ভব। তার যে-আনন্দ দুঃখকে স্বীকার করে সে আনন্দ কিছু না করার চেয়ে বড়, সে-আনন্দ খেলা করার চেয়ে বড়। সে-আনন্দ শাস্তির চেয়ে বড়, সে-আনন্দ বাঁশির তানের চেয়ে বড়।

এখন কথা হচ্চে এই যে, আমি কোন্ ধর্ম্মকে স্বীকার করি। এখানে একটা কথা মনে রাখতে হবে, আমি যখন "আমার ধর্ম্ম" কথাটা ব্যবহার করি তখন তার মানে এ নয় যে আমি কোনো একটা বিশেষ ধর্ম্মে সিদ্ধিলাভ করেছি। যে বলে আমি খৃষ্টান সে যে খৃষ্টের অনুরূপ হতে পেরেচে তা নয়—তার ব্যবহারে প্রত্যহ খৃষ্টান ধর্ম্মের বিরুদ্ধতা বিস্তর দেখা যায়। আমার কর্ম্ম, আমার বাক্য কখনো আমার ধর্ম্মের বিরুদ্ধে যে চলে না এত বড় মিথ্যা কথা বল্‌তে আমি চাই নে। কিন্তু প্রশ্ন এই যে, আমার ধর্ম্মের আদর্শটি কি ?

বাইরে আমার রচনার মধ্যে এর উত্তর নানা জায়গাতেই আছে। অন্তরেও যখন নিজেকে এই প্রশ্ন করি তখন আমার অন্তরাত্মা বলে—

আমিত কিছুকেই ছাড়বার পক্ষপাতী নই, কেননা সমস্তকে নিয়েই আমি সম্পূর্ণ।

"আমি যে সব নিতে চাইরে—
আপনাকে ভাই মেল্‌ব যে বাইরে।"

যখন কোনো অংশকে বাদ দিয়ে তবে সত্যকে সত্য বলি তখন তাকে অস্বীকার করি। সত্যের লক্ষণই এই যে, সমস্তই তার মধ্যে এসে মেলে। সেই মেলার মধ্যে আপাতত যতই অসামঞ্জস্য প্রতীয়মান হোক্ তার মূলে একটা গভীর সামঞ্জস্য আছে, নইলে সে আপনাকে আপনি হনন করত। অতএব, সামঞ্জস্য সত্যের ধর্ম্ম বলে বাদসাদ দিয়ে গোঁজামিলন দিয়ে একটা ঘরগড়া সামঞ্জস্য গড়ে তুল্‌লে সেটা সত্যকে বাধাগ্রস্ত করে তোলে। এক সময়ে মানুষ ঘরে বসে ঠিক করেছিল যে, পৃথিবী একটা পদ্মফুলের মত—তার কেন্দ্রস্থলে সুমেরু পর্ব্বতটি যেন বীজকোষ—চারিদিকে এক-একটি পাপড়ির মত এক-একটি মহাদেশ প্রসারিত। এ রকম কল্পনা করবার মূল কথাটা হচ্চে এই যে, সত্যের একটি সুষমা আছে—সেই সুষমা না থাক্‌লে সত্য আপনাকে আপনি ধারণ করে রাখ্‌তে পারে না। এ কথাটা যথার্থ। কিন্তু এই সুষমাটা বৈষম্যকে বাদ দিয়ে নয়—বৈষম্যকে গ্রহণ করে' এবং অতিক্রম করে'—শিব যেমন সমুদ্রমন্থনের সমস্ত বিষকে পান করে' তবে শিব। তাই সত্যের প্রতি শ্রদ্ধা করে' পৃথিবীটি বস্তুতঃ যেমন,—অর্থাৎ নানা অসমান অংশে বিভক্ত, তাকে তেম্‌নি করেই জান্‌বার সাহস থাকা চাই। ছাঁট-দেওয়া সত্য এবং ঘরগড়া সামঞ্জস্যের প্রতি আমার লোভ নেই। আমার লোভ আরো বেশী, তাই আমি অসামঞ্জস্যকেও ভয় করি নে।

যখন বয়স অল্প ছিল তখন নানা কারণে লোকালয়ের সঙ্গে আমার ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ ছিল না, তখন নিভৃতে বিশ্বপ্রকৃতির সঙ্গেই ছিল আমার একান্ত যোগ। এই যোগটি সহজেই শান্তিময়, কেননা এর মধ্যে দ্বন্দ্ব নেই, বিরোধ নেই, মনের সঙ্গে মনের, ইচ্ছার সঙ্গে ইচ্ছার সংঘাত নেই। এই অবস্থা ঠিক শিশুকালেরই সত্য অবস্থা। তখন অন্তঃপুরের অন্তরালে শান্তি এবং মাধুর্য্যেরই দরকার। বীজের দরকার মাটির বুকের মধ্যে বিরাট পৃথিবীর পর্দ্দার আড়ালে শান্তিতে রস শোষণ করা। ঝড় বৃষ্টি রৌদ্র ছায়ার ঘাত-প্রতিঘাত তখন তার জন্যে নয়। তেমনি এই বিশ্বপ্রকৃতির মধ্যে প্রচ্ছন্ন অবস্থায় ধর্ম্মবোধের যে আভাস মেলে সে হচ্চে বৃহতের আস্বাদনে। এইখানে শিশু কেবল তাঁকেই দেখে যিনি কেবল শান্তং, তাঁরই মধ্যে বেড়ে ওঠে যিনি কেবল সত্যং।

বিশ্বপ্রকৃতির সঙ্গে নিজের প্রকৃতির মিলটা অনুভব করা সহজ কেননা সেদিক থেকে কোনো চিত্ত আমাদের চিত্তকে কোথাও বাধা দেয় না। কিন্তু এই মিলটাতেই আমাদের তৃপ্তির সম্পূর্ণতা কখনই ঘট্‌তে পারে না। কেননা আমাদের চিত্ত আছে, সেও আপনার একটি বড় মিল চায়। এই মিলটা বিশ্বপ্রকৃতির ক্ষেত্রে সম্ভব নয়, বিশ্ব-মানবের ক্ষেত্রেই সম্ভব। সেইখানে আপনাকে ব্যাপ্ত করে আপনার বড়-আমির সঙ্গে আমরা মিল্‌তে চাই। সেইখানে আমরা আমাদের বড় পিতাকে, সখাকে, স্বামীকে, কর্ম্মের নেতাকে, পথের চালককে চাই। সেইখানে কেবল আমার ছোট-আমিকে নিয়েই যখন চলি তখন মনুষ্যত্ব পীড়িত হয়; তখন মৃত্যু ভয় দেখায়, ক্ষতি বিমর্ষ করে, তখন বর্ত্তমান ভবিষ্যৎকে হনন করতে থাকে, দুঃখ শোক এমন একান্ত হয়ে ওঠে যে, তাকে অতিক্রম করে কোথাও সান্ত্বনা দেখতে পাইনে, তখন

প্রাণপণে কেবলি সঞ্চয় করি, ত্যাগ করবার কোনো অর্থ দেখি নে, ছোট ছোট ছোট ঈর্ষাদ্বেষে মন জর্জ্জরিত হয়ে ওঠে—তখন

শুধু দিনযাপনের শুধু প্রাণ-ধারণের গ্লানি,
সরমের ডালি,
নিশি নিশি রুদ্ধ ঘরে ক্ষুদ্রশিখা স্তিমিত দীপের
ধূমাঙ্কিত কালী।

এই বড়-আগিকে চাওয়ার আবেগ ক্রমে আমার কবিতার মধ্যে যখন ফুটতে লাগ্‌ল, অর্থাৎ অঙ্কুররূপে বীজ যখন মাটি ফুঁড়ে বাইরের আকাশে দেখা দিলে, তারই উপক্রম দেখি, "সোণার তরীর" "বিশ্বনৃত্যে"।

বিপুল গভীর মধুর মন্দ্রে
কে বাজাবে সেই বাজনা,
উঠিবে চিত্ত করিয়া নৃত্য
বিস্মৃত হবে আপনা।

টুটিবে বন্ধ, মহা আনন্দ,
নব সঙ্গীতে নূতন ছন্দ,
হৃদয় সাগরে পূর্ণচন্দ্র
জাগাবে নবীন বাসনা।

কিন্তু এতেও বাজনার সুর। যদিও এ সুর মন্দ্র বটে কিন্তু মধুর মন্দ্র। যাই হোক্, কবিতার গতিটা এখানে প্রকৃতির ধাপ থেকে মানুষের ধাপে উঠ্‌চে। বিরাটের চিন্ময়তার পরিচয় লাভ করচে। তাই ঐ কবিতাতেই আছে ঃ—

ঐ কে বাজায় দিবস নিশায়
বসি অন্তর-আসনে
কালের যন্ত্রে বিচিত্র সুর,
কেহ শোনে কেহ না শোনে।

অর্থ কি তার ভাবিয়া না পাই,
কত জ্ঞানী গুণী চিন্তিছে তাই,
মহান্ মানব-মানস সদাই
উঠে পড়ে তারি শাসনে।

বিশ্বমানবের ইতিহাসকে যে একজন চিন্ময় পুরুষ সমস্ত বাধা বিঘ্ন ভেদ করে দুর্গমবন্ধুর পথ দিয়ে চালনা করচেন এখানে তাঁরি কথা দেখি। এখন হতে নিরবচ্ছিন্ন শান্তির পালা শেষ হল।

কিন্তু বিরোধ বিপ্লবের ভিতর দিয়ে মানুষ যে-ঐক্যটি খুঁজে বেড়াচ্চে সেই ঐক্যটি কি? সেই হচ্চে শিবং। এই যে মঙ্গল, এর মধ্যে একটা মস্ত দ্বন্দ্ব। অঙ্কুর এখানে দুইভাগ হয়ে বাড়্তে চলেচে, সুখ দুঃখ, ভালো মন্দ। মাটির মধ্যে যেটি ছিল, সেটি এক, সেটি শান্তং, সেখানে আলো আঁধারের লড়াই ছিল না। লড়াই যেখানে বাধ্‌ল সেখানে শিবকে যদি না জানি তবে সেখানকার সত্যকে জানা হবে না। এই শিবকে জানার বেদনা বড় তীব্র। এইখানে "মহদ্ভয়ং বজ্রমুদ্যতং।" কিন্তু এই বড় বেদনার মধ্যেই আমাদের ধর্ম্মবোধের যথার্থ জন্ম। বিশ্ব-প্রকৃতির বৃহৎশান্তির মধ্যে তার গর্ভবাস। আমার নিজের সম্বন্ধে নৈবেদ্যের দুটি কবিতায় এ কথা বলা আছে।

১।

মাতৃস্নেহ-বিগলিত স্তন্যক্ষীররস
পান করি হাসে শিশু আনন্দে অলস,
তেমনি বিহ্বল হর্ষে ভাব-রসরাশি
কৈশোর করেছি পান ; বাজায়েছি বাঁশি
প্রমত্ত পঞ্চম সুরে, প্রকৃতির বুকে
লালন-ললিত চিত্তে শিশুসম সুখে
ছিনু শুয়ে ; প্রভাত শর্ব্বরী সন্ধ্যাবধূ
নানা পাত্রে আনি দিত নানাবর্ণ মধু
পুষ্পগন্ধে মাখা। আজি সেই ভাবাবেশ,
সেই বিহ্বলতা যদি হয়ে থাকে শেষ,
প্রকৃতির স্পর্শমোহ গিয়া থাকে দূরে
কোন দুঃখ নাহি। পল্লী হতে রাজপুরে
এবার এনেছ মোরে,—দাও চিত্তে বল,
দেখাও সত্যের মূর্ত্তি কঠিন নির্ম্মল।

২।

আঘাত সংঘাত মাঝে দাঁড়াইনু আসি।
অঙ্গদ কুণ্ডল কণ্ঠী অলঙ্কার রাশি
খুলিয়া ফেলেছি দূরে। দাও হস্তে তুলি'
নিজ হাতে তোমার অমোঘ শরগুলি,
তোমার অক্ষয় তূণ। অস্ত্রে দীক্ষা দেহ
রণগুরু ! তোমার প্রবল পিতৃস্নেহ
ধ্বনিয়া উঠুক আজি কঠিন্ আদেশে।

কর মোরে সম্মানিত নব বীরবেশে,
দুরূহ কর্ত্তব্যভারে, দুঃসহ কঠোর
বেদনায়। পরাইয়া দাও অঙ্গে মোর
ক্ষতচিহ্ন-অলঙ্কার। ধন্য কর দাসে
সফল চেষ্টায় আর নিস্ফল প্রয়াসে।
ভাবের ললিত ক্রোড়ে না রাখি নিলীন
কর্ম্মক্ষেত্রে করি দাও সক্ষম স্বাধীন।

যে-শ্রেয় মানুষের আত্মাকে দুঃখের পথে দ্বন্দ্বের পথে অভয় দিয়ে এগিয়ে নিয়ে চলে সেই শ্রেয়কে আশ্রয় করেই প্রিয়কে পাবার আকাঙ্ক্ষাটি "চিত্রায়" "এবার ফিরাও মোরে" কবিতাটির মধ্যে সুস্পষ্ট ব্যক্ত হয়েচে। বাঁশির সুরের প্রতি ধিক্কার দিয়েই সে কবিতার আরম্ভ।

যেদিন জগতে চলে আসি,
কোন্ মা আমারে দিলি শুধু এই খেলাবার বাঁশি?
বাজাতে বাজাতে তাই মুগ্ধ হয়ে আপনার সুরে
দীর্ঘ দিন দীর্ঘ রাত্রি চলে গেনু একান্ত সুদূরে
ছাড়ায়ে সংসার সীমা!

মাধুর্য্যের যে শান্তি এ কবিতার লক্ষ্য তা নয়। এ কবিতায় যার অভিসার সে কে?

কে সে? জানিনা কে! চিনি নাই তারে,—
শুধু এইটুকু জানি,—তারি লাগি রাত্রি-অন্ধকারে
চলেছে মানবযাত্রী যুগ হতে যুগান্তর পানে
ঝড়ঝঞ্ঝা বজ্রপাতে, জ্বালায়ে ধরিয়া সাবধানে

অন্তর প্রদীপখানি। শুধু জানি, যে শুনেছে কানে
তাহার আহ্বানগীত, ছুটেছে সে নির্ভীক পরাণে
সঙ্কট আবর্ত্ত মাঝে, দিয়েছে সে বিশ্ব বিসর্জ্জন,
নির্য্যাতন লয়েছে সে বক্ষ পাতি; মৃত্যুর গর্জ্জন
শুনেছে সে সঙ্গীতের মত। দহিয়াছে অগ্নি তারে,
বিদ্ধ করিয়াছে শূল, ছিন্ন তারে করেছে কুঠারে;
সর্ব্বপ্রিয় বস্তু তার অকাতরে করিয়া ইন্ধন
চিরজন্ম তারি লাগি জ্বেলেছে সে হোম-হুতাশন,
হৃৎপিণ্ড করিয়া ছিন্ন রক্তপদ্ম অর্ঘ্য-উপহারে
ভক্তিভরে জন্মশোধ শেষপূজা পূজিয়াছে তারে
মরণে কৃতার্থ করি প্রাণ।

এর'পর থেকে, বিরাটচিত্তের সঙ্গে মানবচিত্তের ঘাত-প্রতিঘাতের কথা ক্ষণে ক্ষণে আমার কবিতার মধ্যে দেখা দিতে লাগল। দুইয়ের এই সংঘাত যে কেবল আরামের, কেবল মাধুর্য্যের তা নয়। অশেষের দিক থেকে যে-আহ্বান এসে পৌঁছয়, সে ত বাঁশির ললিত সুরে নয়। তাই সেই সুরের জবাবেই আছে,—

রে মোহিনী, রে নিষ্ঠুরা, ওরে রক্ত লোভাতুরা,
কঠোর স্বামিনী,
দিন মোর দিনু তোরে, শেষে নিতে চাস হরে
আমার যামিনী?
জগতে সবারি আছে সংসার সীমার কাছে
কোনোখানে শেষ,

কেন আসে মর্ম্ম ছেদি' সকল সমাপ্তি ভেদি'
তোমার আদেশ ?
বিশ্বজোড়া অন্ধকার সকলেরি আপনার
একেলার স্থান,
কোথা হতে তারো মাঝে বিদ্যুতের মত বাজে
তোমার আহ্বান !

এ আহ্বান এ ত শক্তিকেই আহ্বান ; কর্ম্মক্ষেত্রেই এর ডাক ; রসসম্ভোগের কুঞ্জকাননে নয়—সেইজন্যেই এর শেষ উত্তর এই :—

হবে হবে হবে জয়, হে দেবী, করিনে ভয়,
হব আমি জয়ী।
তোমার আহ্বান বাণী সফল করিব, রাণী,
হে মহিমাময়ী।
কাঁপিবে না ক্লান্ত কর, ভাঙিবে না কণ্ঠস্বর,
টুটিবে না বীণা,
নবীন প্রভাত লাগি দীর্ঘরাত্রি রব জাগি
দীপ নিবিবে না।
কর্ম্মভার নব প্রাতে নব সেবকের হাতে
করি যাব দান,
মোর শেষ কণ্ঠস্বরে যাইব ঘোষণা করে
তোমার আহ্বান।

আমার ধর্ম্ম আমার উপচেতন লোকের অন্ধকারের ভিতর থেকে ক্রমে ক্রমে চেতন লোকের আলোতে যে উঠে আসচে এই লেখাগুলি তারই স্পষ্ট ও অস্পষ্ট পায়ের চিহ্ন। সে চিহ্ন দেখলে বোঝা যায়

ওরে দুয়ার খুলে দে রে
বাজা শঙ্খ বাজা !
গভীর রাতে এসেচে আজ
আঁধার ঘরের রাজা !
বজ্র ডাকে শূন্যতলে,
বিদ্যুতেরি ঝিলিক্ ঝলে,
ছিন্ন শয়ন টেনে এনে
আঙিনা তোর সাজা !
ঝড়ের সাথে হঠাৎ এলো
দুঃখ রাতের রাজা।

ঐ "খেয়া"তে "দান" বলে একটি কবিতা আছে। তার বিষয়টি এই, যে, ফুলের মালা চেয়ে ছিলুম, কিন্তু কি পেলুম ?

এ ত মালা নয় গো, এ যে
তোমার তরবারি !
জ্বলে ওঠে আগুন যেন,
বজ্র-হেন ভারি,
এ যে তোমার তরবারি !

এমন যে দান এ পেয়ে কি আর শান্তিতে থাকবার জো আছে ? শান্তি যে বন্ধন যদি তাকে অশান্তির ভিতর দিয়ে না পাওয়া যায় ?

আজকে হতে জগৎমাঝে
ছাড়ব আমি ভয়।

আজ হতে মোর সকল কাজে
তোমার হবে জয়—
আমি ছাড়ব সকল ভয়।
মরণকে মোর দোসর করে'
রেখে গেছ আমার ঘরে,
আমি তারে বরণ করে'
রাখব পরাণময়।
তোমার তরবারি আমার
করবে বাঁধন ক্ষয়।
আমি ছাড়ব সকল ভয়।

এমন আরো অনেক গান উদ্ধৃত করা যেতে পারে—যাতে বিরাটের সেই অশান্তির সুর লেগেছে। কিন্তু সেই সঙ্গে এ কথা মানতেই হবে সেটা কেবল মাঝের কথা, শেষের কথা নয়। চরম কথাটা হচ্চে শান্তং শিবমদ্বৈতং। রুদ্রতাই যদি রুদ্রের চরম পরিচয় হত তাহলে সেই অসম্পূর্ণতায় আমাদের আত্মা কোনো আশ্রয় পেত না—তাহলে জগৎ রক্ষা পেত কোথায়? তাই ত মানুষ তাঁকে ডাকচে, রুদ্র যত্তে দক্ষিণং মুখং তেন মাং পাহি নিত্যং—রুদ্র তোমার যে প্রসন্ন মুখ—তার দ্বারা আমাকে রক্ষা কর। চরম সত্য এবং পরম সত্য হচ্চে ঐ প্রসন্ন মুখ। সেই সত্যই হচ্ছে সকল রুদ্রতার উপরে। কিন্তু এই সত্যে পৌঁছতে গেলে রুদ্রের স্পর্শ নিয়ে যেতে হবে! রুদ্রকে বাদ দিয়ে যে প্রসন্নতা, অশান্তিকে অস্বীকার করে যে শান্তি, সে ত স্বপ্ন, সে সত্য নয়।

বক্ষে তোমার বাজে বাঁশি,
সে কি সহজ গান ?
সেই সুরেতে জাগব আমি,
দাও মোরে সেই কান।
ভুলব না আর সহজেতে,
সেই প্রাণে মন উঠবে মেতে
মৃত্যুমাঝে ঢাকা আছে
যে অন্তহীন প্রাণ।
সে ঝড় যেন সই আনন্দে
চিত্তবীণার তারে
সপ্ত সিন্ধু দশ দিগন্ত
নাচাও যে ঝঙ্কারে।
আরাম হতে ছিন্ন করে
সেই গভীরে লও গো মোরে
অশান্তির অন্তরে যেথায়
শান্তি সুমহান॥

শারদোৎসব থেকে আরম্ভ করে ফাল্গুনী পর্য্যন্ত যতগুলি নাটক লিখেচি, যখন বিশেষ করে মন দিয়ে দেখি তখন দেখতে পাই প্রত্যেকের ভিতরকার ধুয়োটা ঐ একই। রাজা বেরিয়েচেন সকলের সঙ্গে মিলে শারদোৎসব করবার জন্যে। তিনি খুঁজচেন তাঁর সাথী। পথে দেখলেন ছেলেরা শরৎপ্রকৃতির আনন্দে যোগ দেবার জন্যে উৎসব করতে বেরিয়েছে। কিন্তু একটি ছেলে ছিল—উপনন্দ,—সমস্ত খেলাধুলো ছেড়ে সে তার প্রভুর ঋণ শোধ করবার জন্যে

নিভৃতে বসে একমনে কাজ করছিল। রাজা বল্লেন, তাঁর সত্যকার সাথী মিলেচে, কেননা ঐ ছেলেটির সঙ্গেই শরৎপ্রকৃতির সত্যকার আনন্দের যোগ—ঐ ছেলেটি দুঃখের সাধনা দিয়ে আনন্দের ঋণ শোধ করচে—সেই দুঃখেরই রূপ মধুরতম। বিশ্বই যে এই দুঃখ-তপস্যায় রত ;—অসীমের যে-দান সে নিজের মধ্যে পেয়েচে, অশ্রান্ত প্রয়াসের বেদনা দিয়ে সেই দানের সে শোধ করচে। প্রত্যেক ঘাসটি নিরলস চেষ্টার দ্বারা আপনাকে প্রকাশ করচে, এই প্রকাশ করতে গিয়েই সে আপন অন্তর্নিহিত সত্যের ঋণ শোধ করচে। এই যে নিরন্তর বেদনায় তার আত্মোৎসর্জ্জন, এই দুঃখই ত তার শ্রী, এই ত তার উৎসব, এতেই ত সে শরৎপ্রকৃতিকে সুন্দর করেচে, আনন্দময় করেচে। বাইরে থেকে দেখলে এ'কে খেলা মনে হয় কিন্তু এ ত খেলা নয়, এর মধ্যে লেশমাত্র বিরাম নেই। যেখানে আপন সত্যের ঋণশোধে শৈথিল্য, সেখানেই প্রকাশে বাধা, সেইখানেই কদর্য্যতা, সেইখানেই নিরানন্দ। আত্মার প্রকাশ আনন্দময়, এই জন্যেই সে দুঃখকে মৃত্যুকে স্বীকার করতে পারে—ভয়ে কিম্বা আলস্যে কিম্বা সংশয়ে এই দুঃখের পথকে যে লোক এড়িয়ে চলে জগতে সেইই আনন্দ থেকে বঞ্চিত হয়। শারদোৎসবের ভিতরকার কথাটাই এই—ও ত গাছ-তলায় বসে বসে বাঁশির সুর শোনবার কথা নয়।

"রাজা" নাটকে সুদর্শনা আপন অরূপ রাজাকে দেখতে চাইলে, রূপের মোহে মুগ্ধ হয়ে ভুল রাজার গলায় দিলে মালা, তারপরে সেই ভুলের মধ্যে দিয়ে পাপের মধ্যে দিয়ে যে-অগ্নিদাহ ঘটালে, যে-বিষম যুদ্ধ বাধিয়ে দিলে, অন্তরে বাহিরে যে ঘোর অশান্তি জাগিয়ে তুললে, তাতেই ত তাকে সত্য মিলনে পৌঁছিয়ে দিলে। প্রলয়ের মধ্যে

দিয়ে সৃষ্টির পথ। তাই উপনিষদে আছে তিনি তাপের দ্বারা তপ্ত হয়ে এই সমস্ত কিছু সৃষ্টি করলেন। আমাদের আত্মা যা সৃষ্টি করচে তাতে পদে পদে ব্যথা। কিন্তু তাকে যদি ব্যথাই বলি তবে শেষ কথা বলা হল না, সেই ব্যথাতেই সৌন্দর্য্য, তাতেই আনন্দ।

যে-বোধে আমাদের আত্মা আপনাকে জানে সে-বোধের অভ্যুদয় হয় বিরোধ অতিক্রম করে', আমাদের অভ্যাসের এবং আরামের প্রাচীরকে ভেঙে ফেলে'। সে-বোধে আমাদের মুক্তি, "দুর্গংপথস্তৎ-কবয়োবদন্তি"—দুঃখের দুর্গম পথ দিয়ে সে তার জয়ভেরী বাজিয়ে আসে—আতঙ্কে সে দিগ্‌দিগন্ত কাঁপিয়ে তোলে, তাকে শত্রু বলেই মনে করি—তার সঙ্গে লড়াই করে' তবে তাকে স্বীকার করতে হয়, কেননা "নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ"। অচলায়তনে এই কথাটাই আছে।

"মহাপঞ্চক। তুমি কি আমাদের গুরু?

দাদাঠাকুর। হাঁ, তুমি আমাকে চিন্‌বে না কিন্তু আমিই তোমাদের গুরু।

মহাপঞ্চক। তুমি গুরু? তুমি আমাদের সমস্ত নিয়ম লঙ্ঘন করে এ কোন্ পথ দিয়ে এলে? তোমাকে কে মান্‌বে?

দাদাঠাকুর। আমাকে মান্‌বে না জানি কিন্তু আমিই তোমাদের গুরু।

মহাপঞ্চক। তুমি গুরু? তবে এই শত্রুবেশে কেন?

দাদাঠাকুর। এই ত আমার গুরুর বেশ। তুমি যে আমার সঙ্গে লড়াই করবে—সেই লড়াই আমার গুরুর অভ্যর্থনা।

মহাপঞ্চক। আমি তোমাকে প্রণাম করব না।

দাদাঠাকুর। আমি তোমার প্রণাম গ্রহণ করব না, আমি তোমাকে প্রণত করব।

মহাপঞ্চক। তুমি আমাদের পূজা নিতে আসনি?

দাদাঠাকুর। আমি তোমাদের পূজা নিতে আসি নি, অপমান নিতে এসেচি।

আমি ত মনে করি আজ য়ুরোপে যে-যুদ্ধ বেধেচে সে ঐ গুরু এসেচেন বলে। তাঁকে অনেক দিনের টাকার প্রাচীর, মানের প্রাচীর, অহঙ্কারের প্রাচীর ভাঙ্‌তে হচ্চে। তিনি আস্‌বেন বলে কেউ প্রস্তুত ছিল না। কিন্তু তিনি যে সমারোহ করে আসবেন, তার জন্যে আয়োজন অনেক দিন থেকে চল্‌ছিল। য়ুরোপের সুদর্শনা যে মেকি রাজা সুবর্ণের রূপ দেখে তাকেই আপন স্বামী বলে ভুল করেছিল—তাই ত হঠাৎ আগুন জ্বল্‌ল, তাই ত সাত রাজার লড়াই বেধে গেল—তাই ত যে ছিল রাণী তাকে রথ ছেড়ে, তার সম্পদ ছেড়ে, পথের ধূলোর উপর দিয়ে হেঁটে মিলনের পথে অভিসারে যেতে হচ্চে।

এই কথাটাই গীতালির একটি গানে আছে:—

এক হাতে ওর কৃপাণ আছে,
আরেক হাতে হার,
ও যে ভেঙেচে তোর দ্বার।
আসেনি ও ভিক্ষা নিতে,
লড়াই করে নেবে জিতে
পরাণটি তোমার।
ও যে ভেঙেচে তোর দ্বার।

মরণেরি পথ দিয়ে ঐ
আস্‌চে জীবন মাঝে,
ও যে আসচে বীরের সাজে।
আধেক নিয়ে ফিরবে না রে,
যা আছে সব একেবারে
করবে অধিকার।
ও যে ভেঙেচে তোর দ্বার॥

এই যে দ্বন্দ্ব—মৃত্যু এবং জীবন, শক্তি এবং প্রেম, স্বার্থ এবং কল্যাণ; এই যে বিপরীতের বিরোধ, মানুষের ধর্ম্মবোধই যার সত্যকার সমাধান দেখ্‌তে পায়,—যে সমাধান পরম শান্তি, পরম মঙ্গল, পরম এক, এর সম্বন্ধে বারবার আমি বলেচি। শান্তিনিকেতন গ্রন্থ থেকে তার কিছু কিছু উদ্ধার করে দেখানো যেতে পারত। কিন্তু যেখানে আমি স্পষ্টত ধর্ম্মব্যাখ্যা করেচি, সেখানে আমি নিজের অন্তরতম কথা না বল্‌তেও পারি—সেখানে বাইরের শোনা কথা নিয়ে ব্যবহার করা অসম্ভব নয়। সাহিত্যরচনায় লেখকের প্রকৃতি নিজের অগোচরে নিজের পরিচয় দেয়—সেটা তাই অপেক্ষাকৃত বিশুদ্ধ। তাই কবিতা ও নাটকেরই সাক্ষ্য নিচ্চি।

জীবনকে সত্য বলে জান্‌তে গেলে মৃত্যুর মধ্যে দিয়ে তার পরিচয় চাই। যে মানুষ ভয় পেয়ে মৃত্যুকে এড়িয়ে জীবনকে আঁকড়ে রয়েচে, জীবনের পরে তার যথার্থ শ্রদ্ধা নেই বলে জীবনকে সে পায়নি। তাই সে জীবনের মধ্যে বাস করেও মৃত্যুর বিভীষিকায় প্রতিদিন মরে। যে লোক নিজে এগিয়ে গিয়ে মৃত্যুকে বন্দী করতে ছুটেচে, সে দেখ্‌তে পায়, যাকে সে ধরেচে সে মৃত্যুই নয়,—সে জীবন। যখন সাহস করে তার

সামনে দাঁড়াতে পারিনে, তখন পিছন দিকে তার ছায়াটা দেখি। সেইটে দেখে ডরিয়ে ডরিয়ে মরি। নির্ভয়ে যখন তার সাম্‌নে গিয়ে দাঁড়াই, তখন দেখি যে-সর্দ্দার জীবনের পথে আমাদের এগিয়ে নিয়ে যায়, সেই সর্দ্দারই মৃত্যুর তোরণদ্বারের মধ্যে আমাদের বহন করে নিয়ে যাচ্চে। ফাল্গুনীর গোড়াকার কথাটা হচ্চে এই যে, যুবকেরা বসন্ত উৎসব করতে বেরিয়েচে। কিন্তু এই উৎসব ত শুধু আমোদ করা নয়, এ ত অনায়াসে হবার জো নেই। জরার অবসাদ, মৃত্যুর ভয় লঙ্ঘন করে' তবে সেই নবজীবনের আনন্দে পৌঁছন যায়। তাই যুবকেরা বল্লে,—আন্‌ব সেই জরা-বুড়োকে বেঁধে, সেই মৃত্যুকে বন্দী করে'। মানুষের ইতিহাসে ত এই লীলা, এই বসন্তউৎসব বারে বারে দেখ্‌তে পাই। জরা সমাজকে ঘনিয়ে ধরে, প্রথা অচল হয়ে বসে, পুরাতনের অত্যাচার নূতন প্রাণকে দলন করে' নির্জ্জীব করতে চায়—তখন মানুষ মৃত্যুর মধ্যে ঝাঁপ দিয়ে পড়ে, বিপ্লবের ভিতর দিয়ে নব বসন্তের উৎসবের আয়োজন করে। সেই আয়োজনই ত য়ুরোপে চল্‌চে। সেখানে নূতন যুগের বসন্তের হোলি খেলা আরম্ভ হয়েচে। মানুষের ইতিহাস আপন চিরনবীন অমর মূর্ত্তি প্রকাশ করবে বলে মৃত্যুকে তলব করেচে। মৃত্যুই তার প্রসাধনে নিযুক্ত হয়েচে। তাই ফাল্গুনীতে বাউল বল্‌চে :—"যুগে যুগে মানুষ লড়াই করচে, আজ বসন্তের হাওয়া তারি ঢেউ। যারা মরে' অমর, বসন্তের কচি পাতায় তারা পত্র পাঠিয়েচে। দিগ্‌দিগন্তে তারা রটাচ্চে, —আমরা পথের বিচার করি নি, আমরা পাথেয়ের হিসাব রাখি নি, আমরা ছুটে এসেচি, আমরা ফুটে বেরিয়েচি। আমরা যদি ভাবতে বসতুম, তাহলে বসন্তের দশা কি হত?"—বসন্তের কচি পাতায় এই যে পত্র, এ কা'দের পত্র? যে সব পাতা ঝরে গিয়েছে—তারাই মৃত্যুর

যে, পথ সে চেনে না এবং সে জানে না ঠিক কোন্ দিকে সে যাচ্চে। পথটা সংসারের কি অতিসংসারের তাও সে বোঝে নি। যাকে দেখতে পাচ্চে তাকে নাম দিতে পারচে না, তাকে নানা নামে ডাকচে। যে লক্ষ্য মনে রেখে সে পা ফেলছিল বারবার হঠাৎ আশ্চর্য্য হয়ে দেখচে, আর-একটা দিকে কে তাকে নিয়ে চল্‌চে।

পদে পদে তুমি ভুলাইলে দিক,
কোথা যাব আজি নাহি পাই ঠিক,
ক্লান্ত হৃদয় ভ্রান্ত পথিক
এসেছি নূতন দেশে।
কখনো উদার গিরির শিখরে,
কভু বেদনার তমোগহ্বরে,
চিনিনা যে পথ সে পথের পরে
চলেছি পাগল বেশে।

এই আবছায়া রাস্তায় চল্‌তে চল্‌তে যে-একটি বোধ কবির সাম্‌নে ক্ষণে ক্ষণে চমক দিচ্ছিল, তার কথা তখনকার একটা চিঠিতে আছে, সেই চিঠির দুই এক অংশ তুলে দিই।

“কে আমাকে গভীর গম্ভীর ভাবে সমস্ত জিনিস দেখ্‌তে বল্‌চে,—কে আমাকে অভিনিবিষ্ট স্থির কর্ণে সমস্ত বিশ্বাতীত সঙ্গীত শুন্‌তে প্রবৃত্ত করচে, বাইরের সঙ্গে আমার সূক্ষ্ম ও প্রবলতম যোগসূত্রগুলিকে প্রতিদিন সজাগ সচেতন করে তুল্‌চে?

* * * *

আমরা বাইরের শাস্ত্র থেকে যে ধর্ম্ম পাই সে কখনই আমার ধর্ম্ম হয়ে ওঠে না। তার সঙ্গে কেবলমাত্র একটা অভ্যাসের যোগ জন্মে। ধর্ম্মকে নিজের মধ্যে উদ্ভূত করে তোলাই মানুষের চিরজীবনের সাধনা। চরম বেদনায় তাকে জন্মদান করতে হয়, নাড়ির শোণিত দিয়ে তাকে প্রাণদান করতে চাই, তার পরে জীবনে সুখ পাই আর না পাই আনন্দে চরিতার্থ হয়ে মরতে পারি।"

এমনি করে ক্রমে ক্রমে জীবনের মধ্যে ধর্ম্মকে স্পষ্ট করে স্বীকার করবার অবস্থা এসে পৌঁছল। যতই এটা এগিয়ে চল্‌ল ততই পূর্ব্ব-জীবনের সঙ্গে আসন্ন জীবনের একটা বিচ্ছেদ দেখা দিতে লাগ্‌ল। অনন্ত আকাশে বিশ্বপ্রকৃতির যে শান্তিময় মাধুর্য্য-আসনটা পাতা ছিল, সেটাকে হঠাৎ ছিন্ন বিচ্ছিন্ন করে বিরোধবিক্ষুব্ধ মানবলোকে রুদ্রবেশে কে দেখা দিল? এখন থেকে দ্বন্দ্বের দুঃখ, বিপ্লবের আলোড়ন। সেই নূতন বোধের অভ্যুদয় যে কি রকম ঝড়ের বেশে দেখা দিয়েছিল এই সময়কার বর্ষশেষ কবিতার মধ্যে সেই কথাটি আছে:—

হে দুর্দ্দম, হে নিশ্চিত, হে নূতন, নিষ্ঠুর নূতন,
সহজ প্রবল,
জীর্ণ পুষ্পদল যথা ধ্বংস ভ্রংশ করি চতুর্দ্দিকে
বাহিরায় ফল,—
পুরাতন-পর্ণপুট দীর্ণ করি বিকীর্ণ করিয়া
অপূর্ব্ব আকারে
তেমনি সবলে তুমি পরিপূর্ণ হয়েছ প্রকাশ,—
প্রণমি তোমারে।

তোমারে প্রণমি আমি, হে ভীষণ, সুস্নিগ্ধ শ্যামল,
অক্লান্ত অম্লান,
সদ্যোজাত মহাবীর, কি এনেছ করিয়া বহন
কিছু নাহি জান।
উড়েছে তোমার ধ্বজা মেঘরন্ধ্রচ্যুত তপনের
জ্বলদর্চ্চি-রেখা।
করজোড়ে চেয়ে আছি উর্দ্ধমুখে, পড়িতে জানিনা
কি তাহাতে লেখা।
হে কুমার, হাস্যমুখে তোমার ধনুকে দাও টান
ঝনন-রনন,
বক্ষের পঞ্জর ভেদি অন্তরেতে হউক কম্পিত
সুতীব্র স্বনন।
হে কিশোর, তুলে লও তোমার উদার জয়ভেরী,
করহ আহ্বান,
আমরা দাঁড়াব উঠে, আমরা ছুটিয়া বাহিরিব,
অর্পিব পরাণ।
চাবনা পশ্চাতে মোরা, মানিবনা বন্ধন ক্রন্দন,
হেরিবনা দিক্।
গণিবনা দিনক্ষণ, করিবনা বিতর্ক বিচার,
উদ্দাম পথিক।

রাত্রির প্রান্তে প্রভাতের যখন প্রথম সঞ্চার হয় তখন তার আভাসটা যেন কেবল অলঙ্কার রচনা করতে থাকে। আকাশের কোণে কোণে মেঘের গায়ে গায়ে নানা রকম রং ফুট্‌তে থাকে, গাছের মাথার

উপরটা ঝিকমিক্ করে, ঘাসে শিশিরগুলো ঝিল্‌মিল্ করতে সুরু করে,—সমস্ত ব্যাপারটা প্রধানত আলঙ্কারিক। কিন্তু তা'তে করে এটুকু বোঝা যায় যে রাতের পালা শেষ হয়ে দিনের পালা আরম্ভ হল। বোঝা যায় আকাশের অন্তরে অন্তরে সূর্য্যের স্পর্শ লেগেছে; বোঝা যায় সুপ্তরাত্রির নিভৃত গম্ভীর পরিব্যাপ্ত শান্তি শেষ হল, জাগরণের সমস্ত বেদনা সপ্তকে সপ্তকে মীড় টেনে এখনি অশান্ত সুরের ঝঙ্কারে বেজে উঠ্‌বে। এমনি করে ধর্ম্মবোধের প্রথম উন্মেষটা সাহিত্যের অলঙ্কারেই প্রকাশ পাচ্ছিল, তা মানস-প্রকৃতির শিখরে শিখরে কল্পনার মেঘে মেঘে নানা প্রকার রং ফলাচ্ছিল, কিন্তু তারই মধ্য থেকে পরিচয় পাওয়া যাচ্ছিল যে, বিশ্বপ্রকৃতির অখণ্ড শান্তি এবার বিদায় হল; নির্জ্জনে অরণ্যে পর্ব্বতে অজ্ঞাতবাসের মেয়াদ ফুরোল, এবারে বিশ্বমানবের রণক্ষেত্রে ভীষ্মপর্ব্ব। এই সময়ে বঙ্গদর্শনে "পাগল" বলে যে গদ্য প্রবন্ধ বের হয়েছিল সেইটে পড়লে বোঝা যাবে, কি কথাটা কল্পনার অলঙ্কারের ভিতর দিয়ে নিজেকে প্রকাশ করবার চেষ্টা করচে।

"আমি জানি, সুখ প্রতিদিনের সামগ্রী, আনন্দ প্রত্যহের অতীত। সুখ, শরীরের কোথাও পাছে ধূলা লাগে বলিয়া সঙ্কুচিত, আনন্দ ধূলায় গড়াগড়ি দিয়া নিখিলের সঙ্গে আপনার ব্যবধান ভাঙিয়া চুরমার করিয়া দেয়, এইজন্য সুখের পক্ষে ধূলা হেয়, আনন্দের পক্ষে ধূলা ভূষণ। সুখ, কিছু পাছে হারায় বলিয়া, ভীত; আনন্দ, যথাসর্ব্বস্ব বিতরণ করিয়া পরিতৃপ্ত; এইজন্য সুখের পক্ষে রিক্ততা দারিদ্র্য, আনন্দের পক্ষে দারিদ্র্যই ঐশ্বর্য্য। সুখ, ব্যবস্থার বন্ধনের মধ্যে আপনার শ্রীটুকুকে সতর্কভাবে রক্ষা করে; আনন্দ, সংহারের মুক্তির মধ্য দিয়া আপন সৌন্দর্য্যকে উদার ভাবে প্রকাশ করে; এইজন্য সুখ বাহিরের নিয়মে

বদ্ধ, আনন্দ সে বন্ধন ছিন্ন করিয়া আপনার নিয়ম আপনিই সৃষ্টি করে। সুধাটুকুর জন্য সুখ তাকাইয়া বসিয়া থাকে, দুঃখের বিষকে আনন্দ অনায়াসে পরিপাক করিয়া ফেলে। এইজন্য কেবল ভালটুকুর দিকেই সুখের পক্ষপাত, আনন্দের পক্ষে ভালমন্দ দুইই সমান।

"এই সৃষ্টির মধ্যে একটি পাগল আছেন, যাহা কিছু অভাবনীয়, তাহা খামখা তিনিই আনিয়া উপস্থিত করেন। * * নিয়মের দেবতা সংসারের সমস্ত পথকে পরিপূর্ণ চক্রপথ করিয়া তুলিবার চেষ্টা করিতেছেন, আর এই পাগল তাহাকে আক্ষিপ্ত করিয়া কুণ্ডলী আকার করিয়া তুলিতেছেন। এই পাগল আপন খেয়ালে সরীসৃপের বংশে পাখী এবং বানরের বংশে মানুষ উদ্ভাবিত করিতেছেন। যাহা হইয়াছে, যাহা আছে, তাহাকেই চিরস্থায়িরূপে রক্ষা করিবার জন্য সংসারে একটা বিষম চেষ্টা রহিয়াছে—ইনি সেটাকে ছারখার করিয়া দিয়া, যাহা নাই তাহারই জন্য পথ করিয়া দিতেছেন। ইহার হাতে বাঁশি নাই, সামঞ্জস্য ইঁহার সুর নহে, বিষাণ বাজিয়া উঠে, বিধিবিহিত যজ্ঞ নষ্ট হইয়া যায়, এবং কোথা হইতে একটি অপূর্ব্বতা উড়িয়া আসিয়া জুড়িয়া বসে।"

"* * * * * * আমাদের প্রতিদিনের একরঙা তুচ্ছতার মধ্যে হঠাৎ ভয়ঙ্কর, তার জ্বলজ্জটাকলাপ লইয়া, দেখা দেয়। সেই ভয়ঙ্কর, প্রকৃতির মধ্যে একটা অপ্রত্যাশিত উৎপাত, মানুষের মধ্যে একটা অসাধারণ পাপ আকারে জাগিয়া উঠে। তখন কত সুখ মিলনের জাল লণ্ডভণ্ড, কত হৃদয়ের সম্বন্ধ ছারখার হইয়া যায়। হে রুদ্র, তোমার ললাটের যে ধ্বকধ্বক অগ্নিশিখার স্ফুলিঙ্গমাত্রে অন্ধকারে গৃহের প্রদীপ জ্বলিয়া উঠে, সেই শিখাতেই লোকালয়ে সহস্রের হাহা-

ধ্বনিতে নিশীথরাত্রে গৃহদাহ উপস্থিত হয়। হায় শম্ভু, তোমার নৃত্যে, তোমার দক্ষিণ ও বাম পদক্ষেপে সংসারে মহা পুণ্য ও মহা পাপ উৎক্ষিপ্ত হইয়া উঠে। সংসারের উপরে প্রতিদিনের জড়হস্তক্ষেপে যে-একটা সামান্যতার একটানা আবরণ পড়িয়া যায়, ভালমন্দ দুইয়েরই প্রবল আঘাতে তুমি তাকে ছিন্নবিচ্ছিন্ন করিতে থাক ও প্রাণের প্রবাহকে অপ্রত্যাশিতের উত্তেজনায় ক্রমাগত তরঙ্গিত করিয়া শক্তির নব নব লীলা ও সৃষ্টির নব নব মূর্ত্তি প্রকাশ করিয়া তোল। পাগল, তোমার এই রুদ্র আনন্দে যোগ দিতে আমার ভীত হৃদয় যেন পরাঙ্মুখ না হয়। সংহারের রক্তআকাশের মাঝখানে তোমার রবিকরোদ্দীপ্ত তৃতীয় নেত্র যেন ধ্রুবজ্যোতিতে আমার অন্তরের অন্তরকে উদ্ভাসিত করিয়া তোলে। নৃত্য কর, হে উন্মাদ, নৃত্য কর! সেই নৃত্যের ঘূর্ণবেগে আকাশের লক্ষকোটি-যোজনব্যাপী নীহারিকা যখন ভ্রাম্যমাণ হইতে থাকিবে তখন আমার বক্ষের মধ্যে ভয়ের আক্ষেপে যেন এই রুদ্রসঙ্গীতের তাল কাটিয়া না যায়! হে মৃত্যুঞ্জয়, আমাদের সমস্ত ভাল এবং সমস্ত মন্দের মধ্যে তোমারই জয় হউক!

আমাদের এই ক্ষ্যাপা দেবতার আবির্ভাব যে ক্ষণে ক্ষণে, তাহা নহে—সৃষ্টির মধ্যে ইঁহার পাগলামি অহরহ লাগিয়াই আছে—আমরা ক্ষণে ক্ষণে তার পরিচয় পাই মাত্র। অহরহই জীবনকে মৃত্যু নবীন করিতেছে, ভালকে মন্দ উজ্জ্বল করিতেছে, তুচ্ছকে অনির্ব্বচনীয় মূল্যবান করিতেছে। যখন পরিচয় পাই, তখনি, রূপের মধ্যে অপরূপ, বন্ধনের মধ্যে মুক্তির প্রকাশ আমাদের কাছে জাগিয়া উঠে।"

তার পরে আমার রচনায় বারবার এই ভাবটা প্রকাশ পেয়েচে—জীবনে এই দুঃখ-বিপদ-বিরোধ-মৃত্যুর বেশে অসীমের আবির্ভাব।

কহ, মিলনের এ কি রীতি এই
ওগো মরণ, হে মোর মরণ!
তার সমারোহভার কিছু নেই,
নেই কোনো মঙ্গলাচরণ?
তব পিঙ্গলছবি মহাজট
সে কি চূড়া করি বাঁধা হবে না!
তব বিজয়োদ্ধত ধ্বজপট
সে কি আগে পিছে কেহ ব'বে না?
তব মশাল-আলোকে নদীতট
আঁখি মেলিবেনা রাঙা বরণ?
ত্রাসে কেঁপে উঠিবেনা ধরাতল,
ওগো মরণ, হে মোর মরণ?

যবে বিবাহে চলিলা বিলোচন
ওগো মরণ, হে মোর মরণ,
তাঁর কত মত ছিল আয়োজন
ছিল কত মত উপকরণ।
তাঁর লটপট করে বাঘছাল
তাঁর বৃষ রহি রহি গরজে,
তাঁর বেষ্টন করি জটাজাল
যত ভুজঙ্গদল তরজে।
তাঁর ববম্ববম্ বাজে গাল
দোলে গলায় কপালাভরণ,

তাঁর বিষাণে ফুকারি' উঠে তান
ওগো মরণ, হে মোর মরণ!

* * * *

যদি কাজে থাকি আমি গৃহমাঝ
ওগো মরণ, হে মোর মরণ,
তুমি ভেঙে দিয়ো মোর সব কাজ
কোরো সব লাজ অপহরণ।
যদি স্বপনে মিটায়ে সব সাধ
আমি শুয়ে থাকি সুখ শয়নে,
যদি হৃদয়ে জড়ায়ে অবসাদ
থাকি আধ-জাগরুক নয়নে,
তবে শঙ্খে তোমার তুলো নাদ
করি প্রলয়শ্বাস ভরণ
আমি ছুটিয়া আসিব, ওগো নাথ,
ওগো মরণ, হে মোর মরণ।

"খেয়া"তে "আগমন" বলে যে কবিতা আছে, সে কবিতায় যে-মহারাজ এলেন তিনি কে? তিনি যে অশান্তি। সবাই রাত্রে দুয়ার বন্ধ করে শান্তিতে ঘুমিয়ে ছিল, কেউ মনে করে নি তিনি আসবেন। যদিও থেকে থেকে দ্বারে আঘাত লেগেছিল, যদিও মেঘগর্জ্জনের মত ক্ষণে ক্ষণে তাঁর রথচক্রের ঘর্ঘরধ্বনি স্বপ্নের মধ্যেও শোনা গিয়েছিল তবু কেউ বিশ্বাস করতে চাচ্ছিল না যে, তিনি আসচেন, পাছে তাদের আরামের ব্যাঘাত ঘটে। কিন্তু দ্বার ভেঙে গেল—এলেন রাজা।

মধ্য দিয়ে আপন বাণী পাঠিয়েচে। তারা যদি শাখা আঁকড়ে থাকতে পারত, তাহলে জরাই অমর হত—তাহলে পুরাতন পুঁথির তুলট কাগজে সমস্ত অরণ্য হল্‌দে হয়ে যেত, সেই শুক্‌নো পাতার সর্‌ সর্‌ শব্দে আকাশ শিউরে উঠ্‌ত। কিন্তু পুরাতনই মৃত্যুর মধ্য দিয়ে আপন চির-নবীনতা প্রকাশ করে—এই ত বসন্তের উৎসব। তাই বসন্ত বলে,—যারা মৃত্যুকে ভয় করে, তারা জীবনকে চেনে না; তারা জরাকে বরণ করে' জীবন্মৃত হয়ে থাকে—প্রাণবান বিশ্বের সঙ্গে তাদের বিচ্ছেদ ঘটে।

"চন্দ্রহাস। এ কি! এ যে তুমি! সেই আমাদের সর্দ্দার! বুড়ো কোথায়?

সর্দ্দার। কোথাও ত নেই।

চন্দ্রহাস। কোথাও না? তবে সে কি?

সর্দ্দার। সে স্বপ্ন।

চন্দ্রহাস। তবে তুমিই চিরকালের?

সর্দ্দার। হাঁ।

চন্দ্রহাস। আর আমরাই চিরকালের?

সর্দ্দার। হাঁ।

চন্দ্রহাস। পিছন থেকে যারা তোমাকে দেখ্‌লে, তারা যে তোমাকে কতরকম মনে করলে তার ঠিক নেই। তখন তোমাকে হঠাৎ বুড়ো বলে মনে হল। তার পর গুহার মধ্যে থেকে বেরিয়ে এলে—এখন মনে হচ্চে তুমি বালক,—যেন তোমাকে এই প্রথম দেখলুম! এ ত বড় আশ্চর্য্য, তুমি বারে বারেই প্রথম, তুমি ফিরে ফিরেই প্রথম!"

মানুষ তার জীবনকে সত্য করে, বড় করে, নূতন করে পেতে চাচ্চে।

তাই মানুষের সভ্যতায় তার যে-জীবনটা বিকশিত হয়ে উঠ্‌চে, সে ত কেবলি মৃত্যুকে ভেদ করে। মানুষ বলেচে—

মরতে মরতে মরণটারে
শেষ করে দে বারে বারে,
তারপরে সেই জীবন এসে
আপন আসন আপনি লবে।

মানুষ জেনেচে—

নয় এ মধুর খেলা—
তোমায় আমায় সারা জীবন
সকাল সন্ধ্যাবেলা।
কতবার যে নিব্‌ল বাতি,
গর্জ্জে এল ঝড়ের রাতি,
সংসারের এই দোলায় দিলে
সংশয়েরি ঠেলা।
বারে বারে বাঁধ ভাঙিয়া
বন্যা ছুটেচে,
দারুণ দিনে দিকে দিকে
কান্না উঠেচে।
ওগো রুদ্র, দুঃখে সুখে
এই কথাটি বাজ্‌ল বুকে—
তোমার প্রেমে আঘাত আছে,
নাইক অবহেলা॥

আমার ধর্ম্ম কি, তা যে আজো আমি সম্পূর্ণ এবং সুস্পষ্ট করে জানি, এমন কথা বল্‌তে পারি নে—অনুশাসন আকারে, তত্ত্ব আকারে কোন পুঁথিতে-লেখা ধর্ম্ম সে ত নয়। সেই ধর্ম্মকে জীবনের মর্ম্মকোষ থেকে বিচ্ছিন্ন করে, উদ্‌ঘাটিত করে, স্থির করে দাঁড় করিয়ে দেখা ও জানা আমার পক্ষে অসম্ভব—কিন্তু অলস শান্তি ও সৌন্দর্য্য-রসভোগ যে সেই ধর্ম্মের প্রধান লক্ষ্য বা উপাদান নয়, এ কথা নিশ্চয় জানি। আমি স্বীকার করি,—আনন্দাদ্ধ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে এবং আনন্দং প্রয়ন্তি অভিসংবিশন্তি—কিন্তু সেই আনন্দ দুঃখকে বর্জ্জন-করা আনন্দ নয়, দুঃখকে আত্মসাৎ-করা আনন্দ। সেই আনন্দের যে মঙ্গলরূপ, তা অমঙ্গলকে অতিক্রম করেই,—তাকে ত্যাগ করে নয়; তার যে অখণ্ড অদ্বৈতরূপ, তা সমস্ত বিভাগ ও বিরোধকে পরিপূর্ণ করে তুলে,—তাকে অস্বীকার করে নয়।

অন্ধকারের উৎস হতে উৎসারিত আলো,
সেই ত তোমার আলো।
সকল দ্বন্দ্ব বিরোধ মাঝে জাগ্রত যে ভালো
সেই ত তোমার ভালো।
পথের ধুলায় বক্ষ পেতে রয়েচে যেই গেহ
সেই ত তোমার গেহ।
সমরঘাতে অমর করে রুদ্রনিঠুর স্নেহ
সেই ত তোমার স্নেহ।
সব ফুরালে বাকি রহে অদৃশ্য যেই দান
সেই ত তোমার দান,

মৃত্যু আপন পাত্র ভরি বহিছে যেই প্রাণ
সেই ত তোমার প্রাণ।
বিশ্বজনের পায়ের তলে ধূলিময় যে ভূমি
সেই ত তোমার ভূমি।
সবায় নিয়ে সবার মাঝে লুকিয়ে আছ তুমি
সেই ত আমার তুমি।

সত্যং জ্ঞানং অনন্তং। শান্তং শিবং অদ্বৈতং। য়িহুদী পুরাণে আছে—মানুষ একদিন অমৃতলোকে বাস করত। সে লোক স্বর্গলোক। সেখানে দুঃখ নেই, মৃত্যু নেই। কিন্তু যে স্বর্গকে দুঃখের ভিতর দিয়ে, মন্দের সংঘাত দিয়ে না জয় করতে পেরেচি, সে স্বর্গ ত জ্ঞানের স্বর্গ নয়—তাকে স্বর্গ বলে জানিই নে। মায়ের গর্ভের মধ্যে মাকে পাওয়া যেমন মাকে পাওয়াই নয়—তাঁকে বিচ্ছেদের মধ্যে পাওয়াই পাওয়া।

"গর্ভ ছেড়ে মাটির পরে
যখন পড়ে,
তখন ছেলে দেখে আপন মা'কে।
তোমার আদর যখন ঢাকে,
জড়িয়ে থাকি তারি নাড়ীর পাকে,
তখন তোমায় নাহি জানি।
আঘাত হানি'
তোমারি আচ্ছাদন হতে যেদিন দূরে ফেলাও টানি,
সে বিচ্ছেদে চেতনা দেয় আনি—
দেখি বদন খানি।"

তাই সেই অচেতন স্বর্গলোকে জ্ঞান এল। সেই জ্ঞান আস্‌তেই সত্যের মধ্যে আত্মবিচ্ছেদ ঘট্‌ল। সত্য মিথ্যা, ভাল মন্দ, জীবন মৃত্যুর দ্বন্দ্ব এসে স্বর্গ থেকে মানুষকে লজ্জা দুঃখ বেদনার মধ্যে নির্ব্বাসিত করে দিলে। এই দ্বন্দ্ব অতিক্রম করে যে অখণ্ড সত্যে মানুষ আবার ফিরে আসে, তার থেকে তার আর বিচ্যুতি নেই। কিন্তু এই সমস্ত বিপরীতের বিরোধ মিট্‌তে পারে কোথায়?—অনন্তের মধ্যে। তাই উপনিষদে আছে, সত্যং জ্ঞানং অনন্তং। প্রথমে সত্যের মধ্যে জড় জীব সকলেরই সঙ্গে এক হয়ে মানুষ বাস করে—জ্ঞান এসে বিরোধ ঘটিয়ে মানুষকে সেখান থেকে টেনে স্বতন্ত্র করে—অবশেষে সত্যের পরিপূর্ণ অনন্ত রূপের ক্ষেত্রে আবার তাকে সকলের সঙ্গে মিলিয়ে দেয়। ধর্ম্ম-বোধের প্রথম অবস্থায় শান্তং—মানুষ তখন আপন প্রকৃতির অধীন—তখন সে সুখকেই চায়, সম্পদকেই চায়, তখন শিশুর মত কেবল তার রসভোগের তৃষ্ণা, তখন তার লক্ষ্য প্রেয়। তারপরে মনুষ্যত্বের উদ্বোধনের সঙ্গে তার দ্বিধা আসে; তখন সুখ এবং দুঃখ, ভালো এবং মন্দ, এই দুই বিরোধের সমাধান সে খোঁজে,—তখন দুঃখকে সে এড়ায় না, মৃত্যুকে সে ডরায় না,—সেই অবস্থায় শিবং, তখন তার লক্ষ্য শ্রেয়। কিন্তু এইখানেই শেষ নয়—শেষ হচ্চে প্রেম, আনন্দ। সেখানে সুখ ও দুঃখের, ভোগ ও ত্যাগের, জীবন ও মৃত্যুর গঙ্গাযমুনা সঙ্গম। সেখানে অদ্বৈতং। সেখানে কেবল যে বিচ্ছেদের ও বিরোধের সাগর পার হওয়া, তা নয়—সেখানে তরী থেকে তীরে ওঠা। সেখানে যে-আনন্দ, সে ত দুঃখের ঐকান্তিক নিবৃত্তিতে নয়, দুঃখের ঐকান্তিক চরিতার্থতায়। ধর্ম্মবোধের এই যে যাত্রা,—এর প্রথমে জীবন, তার পরে মৃত্যু, তার পরে অমৃত। মানুষ সেই অমৃতের

অধিকার লাভ করেচে। কেননা জীবের মধ্যে মানুষই শ্রেয়ের ক্ষুরধার-নিশিত দুর্গম পথে দুঃখকে মৃত্যুকে স্বীকার করেচে। সে সাবিত্রীর মত যমের হাত থেকে আপন সত্যকে ফিরিয়ে এনেচে। সে স্বর্গ থেকে মর্ত্ত্যলোকে ভূমিষ্ঠ হয়েচে, তবেই অমৃত-লোককে আপনার করতে পেরেচে। ধর্ম্মই মানুষকে এই দ্বন্দ্বের তুফান পার করিয়ে দিয়ে, এই অদ্বৈতে, অমৃতে, আনন্দে, প্রেমে উত্তীর্ণ করিয়ে দেয়। যারা মনে করে তুফানকে এড়িয়ে পালানোই মুক্তি—তারা পারে যাবে কি করে? সেই জন্যেই ত মানুষ প্রার্থনা করে,—অসতো মা সদ্গময়, তমসো মা জ্যোতির্গময়, মৃত্যোর্মামৃতং গময়। "গময়" এই কথার মানে এই যে, পথ পেরিয়ে যেতে হবে, পথ এড়িয়ে যাবার জো নেই।

আমার রচনার মধ্যে যদি কোনো ধর্ম্মতত্ত্ব থাকে, তবে সে হচ্চে এই যে, পরমাত্মার সঙ্গে জীবাত্মার সেই পরিপূর্ণ প্রেমের সম্বন্ধ উপলব্ধিই ধর্ম্মবোধ, যে-প্রেমের একদিকে দ্বৈত, আরেক দিকে অদ্বৈত; একদিকে বিচ্ছেদ, আরেক দিকে মিলন; একদিকে বন্ধন, আর একদিকে মুক্তি। যার মধ্যে শক্তি এবং সৌন্দর্য্য, রূপ এবং রস, সীমা এবং অসীম এক হয়ে গেছে; যা বিশ্বকে স্বীকার করেই বিশ্বকে সত্যভাবে অতিক্রম করে, এবং বিশ্বের অতীতকে স্বীকার করেই বিশ্বকে সত্যভাবে গ্রহণ করে; যা যুদ্ধের মধ্যেও শান্তকে মানে, মন্দের মধ্যেও কল্যাণকে জানে এবং বিচিত্রের মধ্যেও এককে পূজা করে। আমার ধর্ম্ম যে-আগমনীর গান গায়, সে এই:—

ভেঙেছ দুয়ার, এসেছ জ্যোতির্ম্ময়,
তোমারি হউক জয়।

তিমির-বিদার উদার অভ্যুদয়,
তোমারি হউক জয়!
হে বিজয়ী বীর, নবজীবনের প্রাতে
নবীন আশার খড়গ তোমার হাতে,
জীর্ণ আবেশ কাটো সুকঠোর ঘাতে
বন্ধন হোক্ ক্ষয়!
তোমারি হউক জয়!
এস দুঃসহ, এস এস নির্দ্দয়,
তোমারি হউক জয়!
এস নির্ম্মল, এস এস নির্ভয়,
তোমারি হউক জয়!
প্রভাতসূর্য্য, এসেছ রুদ্রসাজে,
দুঃখের পথে তোমার তূর্য্য বাজে,
অরুণ বহ্নি জ্বালাও চিত্তমাঝে,
মৃত্যুর হোক্ লয়!
তোমারি হউক জয়!

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

বুদ্ধিমানের কর্ম্ম নয়।

—————*—————
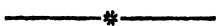
তীরে তীরে নৌকা রেখে ভরানদী পাড়ি দেবার আশা পোষণ করা "ঠিক বুদ্ধিমানের কর্ম্ম" নয়,—বর্ত্তমান সময়ে আমাদের দেশে এই সোজা কথাটা বোঝা কারো কারো পক্ষে ভারী শক্ত ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। আলাচ্য বিষয় যখনই তাঁদের অপ্রীতিকর হয়ে ওটে, তখনই তাঁরা সামাজকে সামনে রেখে স্বচ্ছন্দে শস্ত্র-চালনা সুরু করেন! এতে তাঁদের রণ-কৌশল যথেষ্টই প্রকাশ পায়, কিন্তু পৌরুষ-একটুও না। মতামতের-আসরে সমাজকে শিখণ্ডীর আসনে নামিয়ে নিয়ে এলে তারও গৌরব বিশেষ বর্দ্ধিত হয় বলে' ত' মনে হয় না। কথায় কথায় "মাথার দিব্যি" দিলে অবিলম্বেই সেটা যেমন কথার-কথায় পরিণত হয়—আমাদের দেশে সাহিত্যের আসরে সমাজের দোহাই জিনিসটাও তেম্নি নিরর্থক হয়ে পড়েছে!

সমাজের দোহাইএর আরো একটা দিক আছে। দেশী বাজি-করেরা "ভানুমতী"র খেলা দেখাতে গিয়ে, প্রথমেই ঝুলি খুলে বের করে বসে—"আত্মারাম সরকারের হাড়"। সমবেত দর্শক মণ্ডলীকে "নজরবন্দী" করবার পক্ষে সেইটেই নাকি তাদের ব্রহ্মাস্ত্র! আমাদের সাহিত্যের আসরে সম্প্রতি এম্নিধারা ভানুমতীর খেলার সূত্রপাত দেখা যাচ্ছে। জ্ঞাতসারেই হোক্, আর অজ্ঞাতসারেই হোক হিন্দু-সমাজের মুখবন্ধ দিয়ে আমরা পাঠক-সমাজের "নজর-বন্ধ" করি। এর ফলে পাঠকের নিরপেক্ষ আলোচনার স্পৃহা এবং অভিনিবেশের শক্তি

দেশে অরাজকতা বা যথেচ্ছাচারের প্রবর্ত্তনের সংকল্প মনে না এনেও, স্বরাজের আশা পোষণ করা যদি সম্ভব হয়, তবে সমাজে উচ্ছৃঙ্খলতা বা স্বেচ্ছাচারের অবাধ প্রবাহ ছুটিয়ে দেবার কু-মৎলব না এঁটেও, সামাজিক উন্নতির চেষ্টা কষ্ট-কল্পনা বলে গণ্য হবে কেন? দেশের দুর্দ্দশা সম্বন্ধে দেশবাসীর মনকে অসহিষ্ণু করে তোলবার চেষ্টা যদি দেশভক্তির পরিচয় হয়, তবে সমাজের হীনতা, অসম্পূর্ণতা সম্বন্ধে স্বজাতিকে সজাগ করবার চেষ্টা কোন্ যুক্তিবলে সমাজদ্রোহ বলে বিবেচিত হবে? রাজনৈতিক আলোচনায় নিজের দোষ পরের ঘাড়ে চাপিয়ে, পরের প্রবলতার তলে নিজের দৌর্ব্বল্য চাপা দিয়ে নানান্ রকমের মুখরোচক প্রসঙ্গের অবতারণা করা যায়; আর সামাজিক সমালোচনায় সকল দোষ মাথা পেতে মেনে নিয়ে, পরে কর্ম্মক্ষেত্রে নাম্‌তে হয়। এই কারণেই কি এ বিষয়ে আমাদের এত বিরাগ? রাজনৈতিক আন্দোলনে পরের রাঁধা ভাতে বেগুন-সিদ্ধ দিয়েই, এ পর্য্যন্ত আমরা দেশের প্রতি আমাদের যে কর্ত্তব্য তা শেষ করে আস্‌ছি; কাজেই এখন সামাজিক ব্যাপারে, নিজের চুলিতে নিজে ফুঁ দেবার কথায় যে আমাদের চক্ষু রক্তবর্ণ হবে—তাতে বিশেষ আশ্চর্য্য হবার আর কি আছে?

(৪)

বহু যুক্তি তর্কের আড়ম্বর দিয়ে অনেক সময়ে আমরা আর একটা কথার অবতারণা করে থাকি। কান্ত-কবির তরজমায় সেটা হচ্ছে—"যা কর্‌বে আস্তে ধীরে—ঘা করো কেন খুঁচিয়ে"! এবম্বিধ আপত্তির মূলে রয়েছে আমাদের কর্ম্ম-বিমুখতা। সামাজিক গতি-শীলতা এতদিন

ধরে' বন্ধ থেকে আজ স্বতঃই যে আবার স্বাভাবিক হয়ে উঠ্‌বে—এমন আশা করবার কোনই সঙ্গত কারণ নেই! নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসের মত এমন পরম-অভ্যস্ত প্রক্রিয়া আর মানুষের জীবনে কি আছে? তবু দু'-চার মিনিটের জলে-ডোবা মানুষের প্রাণ বায়ুর চলাচল আবার নিয়মিত কর্‌তে তার হাত-পা ধরে' কতই না সাধাসাধি কর্‌তে হয়।

জাপানে এ বেলা ওবেলা দু'বেলাই প্রায় ভূমিকম্প হয়; কাজেই জাপানীরা সেটাকে নিত্য-নৈমিত্তিক ব্যাপার ধরে' নিয়েই বাড়ী-ঘর তৈরী করে। আর আমাদের এখানে কালে ভদ্রে ভূমিকম্প হয়; আমরা ঘর-বাড়ী বানানোর সময় তা' নিয়ে বড় একটা মাথা ঘামাইনে। এই জন্যেই আমাদের দেশে ভূমিকম্প যখন হয়, তখন বেশ এক হাত দেখিয়েই যায়।—মুক্তপ্রাণ, গতিশীল সমাজের পক্ষে সংস্কার ব্যাপারটা নিত্য-নৈমিত্তিক; আর, আমাদের সমাজের পক্ষে সংস্কার হচ্ছে ভূমিকম্পের মতই স্মরণীয়! আমাদের সমাজের সঙ্গে বাইরের পৃথিবীর যোগাযোগ বহুদিন ধরে বন্ধ ছিল; আর, তাতে করে' আমাদের মনের অবস্থাটাও—"বৃন্দাবনং পরিত্যাজ্য পাদমেকং ন গচ্ছামি" ধরণের হয়ে গিয়েছে। আমাদের সামাজিক মনের নঙ্গর বহুকাল-সঞ্চিত পাঁকের নীচে এম্নি শক্ত হয়েই এঁটে বসেছে যে যথেষ্ট জোরজবরদস্তি ছাড়া এ ওঠ্‌বার নয়। কিন্তু এতে হাত দিলেই আমাদের বুকে বাজে! অভ্যাসের পাঁকটাকে আমরা সমাজের প্রাণবস্তু বলে' ভুল করি; পরগাছেকে আমরা গাছের অপরিহার্য্য অঙ্গ বলে' মনে করি। এই কারণেই আমাদের সমাজের প্রাণ ক্রমেই কোন-ঠাসা হয়ে যাচ্ছে, আর দেহ ক্রমেই রক্তশূন্য হয়ে পড়্‌ছে।

এ অবস্থার প্রতীকার চেষ্টা কি সমাজ দ্রোহ? দেশের সাম্‌নে

সমাজের দূষিত অংশ অনবগুণ্ঠিত করা কি দূষণীয়? দুঃসময়ে গ্রহ-বৈগুণ্যে সমাজে যে সব দোষ ঢুকেছে সে গুলিকে সামাজের অঙ্গীভূত হ'তে প্রশ্রয় না দিয়ে বিদূরিত কর্‌বার চেষ্টা করা কি সামাজিক উচ্ছৃঙ্খলতা? আমার ত' মনে হয়, প্রত্যেক হিন্দুরই এটা কর্ত্তব্য হওয়া উচিত। সমাজের "আসন্ন-বন্ধু"দের মতে এ কাজ যদি উচ্ছৃঙ্খল বলে' বিবেচিত হয়—তাহ'লে আমাদের মনে এ উচ্ছৃঙ্খলতার প্রশ্রয় দেওয়াই বর্ত্তমানে প্রয়োজন হয়েছে। আজ শৃঙ্খলিত অবস্থার প্রতিক্রিয়া হিসাবে, হয়ত, আমাদের মনের সদিচ্ছা কাজে উচ্ছৃঙ্খলতা হয়ে দাঁড়াবে;—কিন্তু পরিণামে শৃঙ্খল যখন টুটে যাবে, তখন স্বভাবতঃই সামাজে আবার শান্তির প্রবাহ চল্‌বে।

ত্রেতায় যুগাবতারের কর্ম্ম-জীবনের সূচনা হয়েছিল পাষাণী উদ্ধারে।—তাঁর পাদস্পর্শে পাষাণী অহল্যা নবজীবন লাভ করেছিল। বর্ত্তমানে আমাদের দেশে যে নবযুগের সূচনা হয়েছে, আমাদের জাতীয় জীবনের অর্দ্ধস্ফুট উষার আকাশে, চক্রবালের কোলে কোলে, মেঘের নীচে যার আলোর রেখা মাঝে মাঝে ফুটে উঠে আমাদের সকলের মনকে নিয়ে এমন করে' খেলা কর্‌ছে তারও প্রথম কাজ হবে—পাষাণ উদ্ধার—অমাদের সামাজিক মনের শাপ—বিমোচন। আমাদের রাজনৈতিক জীবনের আদর্শ, আমাদের কর্ম্ম-জীবনের লক্ষ্য, আমাদের সাহিত্যিক জীবনের সাধনা যে আলোতে মণ্ডিত হয়ে, রঞ্জিত হয়ে, আজ আমাদের "আঁখির আগে" এসে দাঁড়িয়েছে, তারি সাম্‌নে উন্মুক্ত করে' দিতে হবে—আমাদের সামাজিক মনের সকল দুয়ার—সদর খিড়কি দুই-ই।

শ্রীবরদা চরণ গুপ্ত।

আশ্বিন ১৩২৪।

দুখানি ফরাসী চিঠি।

—:*:—

সম্প্রতি এদেশের ইংরেজ খবরের-কাগজওয়ালারা রবীন্দ্রনাথের উপর নানারূপ কটু কথা প্রয়োগ করছেন। সে সব কথার মর্ম্ম এই যে, বিলাতের লোক যখন ভদ্রতা করে রবীন্দ্রনাথের কবিতার প্রশংসা করেছেন, তখন এ দেশের রাজনীতি সম্বন্ধে কোন কথা বলা তাঁর পক্ষে অভদ্রতা।—তারপর তিনি যখন কবি, তখন রাজনীতির চর্চ্চা তাঁর পক্ষে অনধিকারচর্চ্চা।

ইউরোপ যে ভদ্রতার খাতিরে তাঁর কবিতার প্রশংসা করে নি, কিন্তু তা নিজগুণেই যে ইউরোপের শিরোধার্য্য হয়েছে, এবং কবিরও যে রাজনীতির অন্তত নীতি সম্বন্ধে মতামত ব্যক্ত করবার সম্পূর্ণ অধিকার আছে,—তার প্রমাণস্বরূপ আমি দু'খানি ফরাসী পত্র নিম্নে উদ্ধৃত করে দিচ্ছি।

ইউরোপে যে খণ্ডপ্রলয় চলেছে, তার অবসানে মানবসমাজ যেখানে ছিল ঠিক সেইখানেই থাক্‌বে—এ বিশ্বাস শুধু অসাধারণ জড়মতি লোকের থাক্‌তে পারে। অদূর ভবিষ্যতে মানুষের যে নব-সভ্যতার প্রতিষ্ঠা হবে, তার মধ্যে এসিয়ারও যথাযোগ্য স্থান থাক্‌বে, এবং এসিয়ার সঙ্গে ইউরোপের সম্পর্ক অনেকটা ভারতবর্ষের সঙ্গে ইংলণ্ডের সম্পর্কের উপরেই নির্ভর কর্‌বে।—এসিয়া ও ইউরোপের এই ভাবী মিলনের বাণী, আসন্ন নবযুগের নববার্ত্তা ঘোষণা কর্‌তে পার্‌বেন কবি,—

ব্যবসায়ী রাজনৈতিক নয়।—সুতরাং এ ক্ষেত্রে কবি একেবারে নীরব থাক্‌তে পারেন না।

চিঠি দু'খানি শ্রীযুক্ত অমিয়চন্দ্র চক্রবর্ত্তী নামক কোনও বঙ্গযুবককে লিখিত।—একখানির লেখক একজন বেল্‌জিয়ান, অপরখানির একজন ফরাসী। প্রথম ব্যক্তির নাম Maeterlinck, দ্বিতীয়ের—Romain Rolland। এ দুই ব্যক্তির পরিচয় বাঙ্গালী পাঠককে দেওয়ার কোনও আবশ্যক নেই—আর আমার বিশ্বাস ইংরেজ খবরওয়ালারাও এঁদের অন্তত নামের সঙ্গে পরিচিত। শ্রীযুক্ত শিশিরকুমার মৈত্র পত্র দু'খানি অনুবাদ করে দিয়েছেন।

সম্পাদক।

Les Abeilles
Avenue des Beaumettes
Nice.

Nov. 1916.

L'hommage de votre lettre, venu de si loin,—bien que dans toute la sincèrité de ma pensée, il dépasse beaucoup le mérite de mon effort,—m'a très profondement touché. J'ai surtout été heureux et fier d'apprendre que c'est votre grand poète Rabindra Nath Tagore qui a bien voulu me faire connaître parmi vous. Rien ne pouvait m'être plus sensible, car je considère certaines pages du "Gitanjali"—la seule de ses œuvres que je connaisse—comme les plus hautes, les plus profondes, les plus divinement humaines qu' on ait écrites jusqu'à ce jour.

MAETERLINCK.

[TRANSLATION OF M. MAETERLINCK'S LETTER.]

The tribute contained in your letter received from such a great distance, has touched me profoundly, although I sincerely believe it is out of all proportion to the merit of my work. I am, above all, happy and proud to learn that it is your great poet Rabindra Nath Tagore who has tried to make me known to you. Nothing could have affected me more deeply, for I consider certain pages of the "Gitanjali,"—the only one of his works that I know—the highest, the most profound, the most divinely human that have been written to this day.

Dimanche, 18 Mars, 1917.

Ami lointain, je vous remercie de votre sympathie. Je suis heureux que mon *Jean Christophe* ait trouvé dans votre cœur tant d'échos. Ce m'est une preuve de plus de la fraternité universelle des âmes. Cette fraternité, j'y crois, et je travaille a en établir la conscience profonde entre les hommes de tous les peuples, de toutes les races. Tout particulièrement, je sens, depuis quelques années, le besoin urgent de rapprocher l'esprit de l'Europe de celui de l'Asie. Ni l'un ni l'autre ne se suffit, à soi seul. Ce sont les deux hémisphères de la pensée. Il faut les réunir. Que ce soit la grande mission de l'age qui va venir ! Si j'étais plus jeune, je m'y voucrais tout entier. Je me contente de la joie de goûter par avance la plénitude de la civilisation future, qui réalisera l'union des deux moitiés de l'âme humaine. J'admire votre Rabindra Nath Tagore, parceque je sens un peu en lui déjà vibrer cette harmonie.

Puissent mes yeux un jour boire (comme mon esprit) cette lumière de l'Inde, que je vois à travers vos lignes, lorsque vous décrivez la nature qui vous entoure.

Bien cordialement à vous,

ROMAIN ROLLAND.

Hotel Beauséjour, Champel, Genève (Suisse),

(faire suivre).

[TRANSLATION OF M. ROMAIN ROLLAND'S LETTER.]

Sunday, 18th March, 1917.

My far-away friend, I thank you for your sympathy. I am glad that my *John Christopher* has found so many echoes in your heart. It is one more proof to me of the universal fraternity of souls. I believe in this fraternity, and I strive to establish a deep consciousness of it in the minds of people of different countries and different races. I have been feeling especially for some years past, the urgent need of bringing the spirit of Europe into contact with the spirit of Asia. Neither the one nor the other is sufficient unto itself. They are the two hemispheres of thought. It is necessary to unite them. Let this be the grand mission of the age which is to come! If I were younger, I would dedicate myself entirely to this mission. I content myself with the joy of tasting in advance the plenitude of the civilization of the future, which will realise the union of these two halves of the human heart. I admire your Rabindra Nath Tagore, because I feel this harmony to some extent vibrating in him already.

May my eyes (like my spirit) one day drink this light of India, which I see through your lines, when you describe the nature which surrounds you!

Sincerely yours,

ROMAIN ROLLAND.

Hotel Beauséjour, Champel,

Geneva (Switzerland).

আচ্ছন্ন হয়ে পড়ে!—সমালোচনার ক্ষেত্রে এমন ধারা ঐন্দ্রজালিক উপায় কখনো সাধু-সাহিত্য-সম্মত হতে পারে না!

সবারি মনে রাখা উচিত—সমাজ কারো ব্যক্তিগত সম্পত্তি নয়; উত্তরাধিকার সূত্রে সমাজের দেওয়ানী-সনন্দ কারো হাতেই ন্যস্ত হয় নি; সমাজ পেটেণ্টও নয়, লিমিটেড্ কোম্পানীও নয়।

মানুষ অবস্থার উত্তেজনায়, সুবিধার অনুরোধে সমাজ গড়ে। পারিপার্শ্বিক কারণপরম্পরায় ধীরে ধীরে সামাজিক আচার অনুষ্ঠান, বিধি-নিষেধ প্রবর্ত্তিত এবং অনুসৃত হয়। যূথবদ্ধ জানোয়ারের সঙ্গে মানুষের সমাজের পার্থক্যই হয়েছে—তার পরিবর্ত্তনশীলতায়। মানুষের মন ত ইতরপ্রাণীর মনের মত কয়েকটা দানাবাঁধা সহজ বুদ্ধির সমাবেশ মাত্র নয়;—তার যে সম্ভাবনা অশেষ, পরিণতি অনন্তে! সেই জন্যেই'ত' মানুষের সমাজের অভিব্যক্তির কখনো শেষ হয় না। কোনো সমাজের কোনো অনুশাসনই অপরিবর্ত্তনীয় হতে পারে না! যাঁরা সমাজকে মানুষের উপরে বসাবেন—তাঁরা চুলোর আগুনকে প্রশ্রয় দিয়ে চালে ওঠাবেন।—তাঁদের গৃহদাহ অনিবার্য্য। আমাদের দেশে কারো কারো ভাবের ঘরে এম্নি করেই আগুন লেগেছে!

সামাজিক অভিব্যক্তির ধারার উজান বেয়ে গেলে নিশ্চয়ই এমন সব ঘাটের সন্ধান পাওয়া যাবে—যা এখন নিতান্তই অঘাটা! ঘাটকে অঘাটা, অঘাটাকে ঘাট কে করেছে? যুগে যুগে সমাজ-শরীরে যে সব পরিবর্ত্তন-পরম্পরা সংঘঠিত হয়েছে,—সে কার ইঙ্গিতে, কার অনুরোধে? সমাজ কিছু আর সৌর-জগতের অংশবিশেষ নয় যে, সামাজিক-জীবের সনাতন-জড়তা সত্ত্বেও, তার ঋতুপরিবর্ত্তন স্বাভাবিক নিয়ম অনুসারেই সুসম্পন্ন হবে! মানুষের মনই ত' সমাজের পক্ষে

সোনার-কাঠি, রূপার কাঠি!—তার ঘাত-প্রতিঘাতেই ত' সমাজ-প্রকৃতিতে গ্রীষ্মের জ্বালা আর বর্ষার বিরহ, শীতের সন্ন্যাস আর বসন্তের উচ্ছ্বাস ফুটে ওঠে।

যখনই, যে কোনো কারণেই হোক না, কোনো সমাজের মানুষের মানসিক গতি স্থগিত হয়েছে, তখনই শুধু সে সমাজ স্থাবর হয়ে সহসা স্থবিরত্ব প্রাপ্ত হয়েছে। মনের ফোয়ারা জমাট বেঁধে গেলে সমাজের স্রোত স্বভাবতঃই মরে আসে। সে অবস্থা উন্নতির পরিপন্থী!

সমাজকে উন্নতির অনুকূল রাখতে হলে সামাজিক মনের গতি সবদিকে অব্যাহত রাখতে হবে!—মনের প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে সমাজকেও প্রসারিত কর্‌তে হবে;—এতে সমাজের প্রতিপত্তি কমে যাবে—এমন ভয় কর্‌লে চলবে না। বাছুর দুধ খেতে খেতে, গাভীর পদ-আস্ফালন আর শৃঙ্গ-তাড়না উপেক্ষা করেও, পরম আগ্রহভরে মাতৃস্তনে আঘাত দিয়ে নবাগত স্তন্য স্রোতের সদ্ব্যবহার করে থাকে। তাতে তার মাতৃভক্তি ক্ষুণ্ণ হয় কিনা বলা যায় না, তবে মায়ের অপত্য-স্নেহ যে কমে না সেটা ত' প্রত্যক্ষ সত্য! আমার বিশ্বাস সমাজ সম্বন্ধেও এ কথা খাটবে। আমাদের সমাজের পরিণতির সম্ভাবনা বহুবিধ এবং বহু বিস্তৃত। কিন্তু সে সবই যে আঘাতের অপেক্ষা রাখে। সময়োচিত আঘাতেই ত সমাজের প্রকৃত উদ্বোধন! এ কাজে যাঁরা বাধা দেবেন সমাজদ্রোহী—তাঁরা!

(২)

ভক্তির আতিশয্যে আমরা আমাদের সমাজকে যে ক্ষীণ আর ক্ষণভঙ্গুর মনে করি,—সেটা আমাদের কল্পনার দৈন্য অথবা অপবাদ

ছাড়া আর কিছুই নয়। আমাদের মনের সামাজিকতা যতদিন থাকবে সমাজও ততদিন কোনো না কোনো আকারে থাকবেই!—এ জিনিস ভাঙ্গে না—কেবলি গড়ে, কেবলি বাড়ে! সমাজের কোনো একটা বিশেষ মূর্ত্তির পরে অহৈতুকী ভক্তি, কোনো এক বিশিষ্ট ধরণের রীতি নীতি, আচার ব্যবহারের পরে অন্ধ পক্ষপাত কখনো মনের স্বাভাবিক অবস্থার লক্ষণ নয়! বর্ত্তমানের পরে অসন্তোষ অতৃপ্তির ভিতরেই ত ভবিষ্যৎ সৃষ্টির বীজ নিহিত রয়েছে!

জগতের সমস্ত উন্নত কর্ম্ম-প্রচেষ্টার মূলে যে "হারামনি"র অনুসন্ধিৎসা রয়েছে তা থেকে কেন আমরা আমাদের সমাজকে একঘরে করে রাখতে চাইব? আর, চাইলেই সে চেষ্টা কি সফল হবে? চোখ মেলে আমাদের সমাজের পানে চাইলেই ত সে ব্যর্থ চেষ্টার শত সহস্র নিদর্শন সর্ব্বত্র দেখতে পাবো! এ ব্যাপার এত স্পষ্ট—আর এর দৃষ্টান্ত এত প্রচুর যে চোখে আঙ্গুল দিয়ে সে সব দেখাতে যাওয়ার মানে—পাঠকের দৃষ্টিশক্তির প্রতি অবিচার করা। হাতের কঙ্কন আরসিতে দেখে আর লাভ কি? শিক্ষিত পাঠক সরল ভাবে নিজের নিজের মন অনুসন্ধান করলেই দেখতে পাবেন—তার ঘাটে ঘাটে পুরাতন সমাজের কত "সনাতন" বিধি-নিষেধের শব অন্ত্যেষ্টি সংকারের অপেক্ষায় পড়ে রয়েছে! তথাকথিত সমাজের মোহে আচ্ছন্ন হয়ে তাদের প্রতি আমাদের যে সামাজিক কর্ত্তব্য তা আমরা বরাবর উপেক্ষা করেই আস্‌ছি! ফলে আমাদের মনে যা মরে রয়েছে, কাজে তাই ভূত হয়ে নেমে আসে। বর্ত্তমান কালে, শিক্ষিত লোকের "সামাজিক নিষ্ঠা" মানে সুনিপুণ আত্মপ্রবঞ্চনা ছাড়া আর কিছুই নয়। ব্যাপারটাতে আমরা এতই অভ্যস্ত হয়ে পড়েছি যে

সব সময়ে শাদা-চোখে এটা ধরা পড়ে না। কিন্তু একটু ভেবে দেখলেই এর সত্যতা সম্বন্ধে আর কোনো সন্দেহ থাকবে না। আমরা প্রত্যেকেই বানান করছি "বিড়াল", আর সকলে মিলে উচ্চারণ করে আস্‌ছি—"মেকুর"। আমাদের সমাজের এ সদর-মফস্বল-রহস্য আর কতদিন চল্‌বে?

বিজ্ঞ এবং বিশেষজ্ঞদের মতে এই বৈষম্য নাকি অতীত যুগের নানা বিজাতীয় সংঘাত এবং অপঘাতের মাঝে আমাদের সমাজ আর সভ্যতার পক্ষে রক্ষা-কবচের কাজ করেছিল। (এই প্রসঙ্গে তাঁরা পাশ্চাত্য সংঘর্ষে নিগ্রো আর Red Indian-দের শোচনীয় পরিণামের উল্লেখ করতেও ছাড়েন না।—যেন তারা আমাদের, আর আমরা তাদের মাসতুত ভাই!) আমি সে কথা মানি নে। আমার মনে হয়, তাঁরা কার্য্যটাকে কারণ বলে' ভুল করেছেন। আমাদের সমাজে সদর-মফস্বলের বৈষম্য ছিল বলে' হিন্দু-সভ্যতা যে আজ জানে-প্রাণে বেঁচে আছে—সে কথা ঠিক নয়! হিন্দু-সভ্যতা বিজাতীয় সভ্যতার সংঘর্ষে একেবারে অভিভূত হয় নি বলেই—প্রাণে মরে নি বলেই—আমাদের সমাজে সদর মফস্বলের সৃষ্টি হয়েছে।—এটা একটা দৈব দুর্ঘটনা! হিন্দু-সভ্যতা চালাকী করে বাঁচে নি, বেঁচেছে গায়ের জোরে। তার মূলে যে অমৃত সঞ্চিত রয়েছে, তার রন্ধ্রে রন্ধ্রে আর্য্য-সভ্যতার যে মহিয়সী বাণীর অনুরণন রয়েছে তারি সঞ্জীবনী শক্তির প্রভাবেই সে জর্জ্জরিত হয়েও জীবন হারায় নি।

একটা উপমা দিলেই বোধ হয় কথাটা পরিষ্কার হবে। আমি যদি হঠাৎ দোতালার ছাদ থেকে একেবারে মাটীতে পড়ে যাই—তাতে যদি আমার পুঁটি-ম'ছের প্রাণ বেরিয়েই যায়,—তাহলে ত সব দেনা-পাওনাই

ঢুকে গেল ;—কিন্তু যদি আমার জীবনীশক্তি যথেষ্ট প্রাণবন্ত থাকে ; সোজা কথায়, যদি আমার আরো কিছুদিন পরমায়ু লেখা থাকে—এবং পড়ে গিয়ে না মরে' আমি যদি হাত পা ভেঙ্গে নিতান্তই অকর্ম্মণ্য হয়ে যাই ; তাহলে বন্ধু-বান্ধবেরা নিশ্চয়ই খুব খুসী হবেন না। আর, এমন কথা মনে করাও সঙ্গত হবে না যে, হাত পা ভেঙ্গে গেছে বলেই প্রাণটা বেঁচেছে। দুর্ঘটনার লক্ষ্য ছিল প্রাণ, কিন্তু ও বস্তু আমাতে খুব সুপ্রতিষ্ঠিত এবং সুরক্ষিত ছিল বলে দুর্ঘটনার ফল সে পর্য্যন্ত পৌঁছাতে পারে নি ; হাত পায়ের পরে ঝাল মিটিয়েই ক্ষান্ত হয়েছে। হাত পা যে ভেঙ্গেছে তাতেও আমার বিশেষ হাত নেই ; আর প্রাণটা যদি যেত তাতেও আমার কিছুই বলবার ছিল না। তবে ও বস্তু যে যায় নি সেটা হচ্ছে "আমার পিতৃ-পুরুষের বহু পুণ্যের জোর"! প্রাণটাই যদি যেত, তাহলে, হাত পা ভাঙ্গ্‌তো কার? প্রাণটা যায় নি বলেই ত হাত পা ভাঙ্গা অবস্থার দুর্গতি ভোগ করবার জন্যে রয়েছি—আমি!

আমরা যে আমাদের দেশকে, আমাদের সমাজকে, আমাদের মনকে বিদেশী, বিজাতি এবং বিধর্ম্মীর প্রভুত্ব থেকে মুক্ত রাখতে পারি নি—আমাদের সামাজিক কপটতা হচ্ছে তারি দণ্ড। প্রায়শ্চিত্তকে পৌরুষ বলে গরব করার চেয়ে হীনতা আর কি হতে পারে?—আমরা তাই করছি! এতে আমাদের প্রায়শ্চিত্তের সার্থকতা, তার উদযাপন অযথা বিলম্বিত হচ্ছে!

(৩)

মতামতের ঘনঘটার ভিতরে আর একটা জিনিসের বেশ প্রচুর এবং পর্য্যাপ্ত বর্ষণ আজকাল দেখা যাচ্ছে।—"শান্তির বারি" নয়,

সেটা হচ্ছে সংযমের বক্তৃতা। সবুজ-দমনে সঙ্গীন-হস্ত সম্প্রদায়ের মুখে সংযমের বক্তৃতা সাজে ভালো, ছোটে খুব! বোধ হয় এই জন্যেই তাঁদের মুখের সংযমের বক্তৃতার কার্য্যকারিতা "শান্তির বারি"র চাইতে শিলাবৃষ্টির সঙ্গেই মেলে বেশী! তবু, এ কথার আলোচনা আমাদের করতেই হবে।

হতে পারে, সবুজের বিরুদ্ধে সংযমের অভিযোগ একেবারে মিথ্যা নয়। কিন্তু প্রবীণের পক্ষে জলে না নেমে সাঁতার কাটবার কল্পনা মনে স্থান দেওয়া যে নিতান্তই "মিথ্যাচার"—সে সম্বন্ধে আর দুই মত হতে পারে না।

যে কাজ করে, ভুল করবার সম্ভাবনা তার চিরদিনই থাকে। যে চলেছে মাঝে মাঝে পথভ্রষ্ট সে হয়েও থাকে। তাই বলে কি হাত পা গুটিয়ে বসে থাকাই বুদ্ধিমানের কর্ম্ম? জাতীয়-জীবনে কর্ম্মের উদ্দীপনা এলে অধিকারের সীমা মাঝে মাঝে অনধিকারের রাজ্যে গিয়ে পড়বেই। তাই বলে বর্গীর ভয় দেখিয়ে, দেশের সব নবীন প্রাণকে ঘুম পাড়িয়ে রাখাই কি বুদ্ধিমানের উপদেশ? পাটোয়ারী হিসেবে লাভ লোকসান খতিয়ে দেখে, সংযম আর সংকল্পের পাইকারী দর যাচাই করে, উদ্দীপনার আমদানী রপ্তানী ভাবের হাটে কোনো দিনই সম্ভবপর হয় না। এ কাজ করতে যাঁরা বিশেষ ভাবেই ব্যগ্র, কাজেই তাঁদের সম্বন্ধে স্বভাবতঃই সন্দেহ আসে—তাঁরা বুঝি কাজ না করবার ছুতো খুঁজতেই ব্যস্ত! উচ্ছ্বাস যেখানে নেই, সংযম সেখানে নিরর্থক। উপার্জ্জনের উন্মাদনা যেখানে কোনো কালেই ছিল না,—সঞ্চয়ের সংযম সেখানে কোন্ কাজে লাগবে? গ্রীষ্মের বিশ্বগ্রাসী রৌদ্রলীলাই ত পরবর্ত্তী বর্ষার মেঘ-মেদুর স্তব্ধতাকে সার্থক করে দেয়।

আমাদের সামাজিক প্রকৃতিতে শীতের শিশির শুকাতে না শুকাতেই যাঁরা বর্ষার জলের জন্যে ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন, সামাজিক প্রকৃতি থেকে যাঁরা বসন্তের উচ্ছ্বাস আর গ্রীষ্মের উদ্দীপনাকে নির্ব্বাসিত করবার জন্যে উঠে-পড়ে লেগেছেন;—আমার বিশ্বাস তাঁদের সেই অস্বাভাবিক প্রচেষ্টা আর অসঙ্গত আশা কখনো সফল হবে না। কারণ শাস্ত্রে আছে,—কর্ম্ম থেকে যজ্ঞ, আর যজ্ঞ থেকেই পর্জ্জন্যের উৎপত্তি।

সামাজিক সংযমের সমালোচনা ব্যপদেশে আমরা প্রায়ই বলে থাকি---ব্যক্তিগত চিন্তা-স্রোতের স্বাধীন প্রবাহ অব্যাহত ভাবে চলতে থাকলে, আমাদের সামাজিক ঐক্য, পারিবারিক বন্ধন শ্লথ এবং শিথিল হয়ে, অচিরেই স্খলিত এবং বিধ্বস্ত হবে। এ সব শোচনীয় পরিণামের মর্ম্মভেদী বর্ণনা আমাদের লেখনী মুখে এমন জাজ্বল্যমান হয়ে ফুটে ওঠে,—পড়লে মনে হয় যেন এইমাত্রই লেখক তেমন একটা দেশ থেকে ফিরে আসছেন—যেখানে ভাই ভাইকে সম্মান করে না; বিদ্বান্ বুদ্ধিমানের ছেলে, স্বাধীন চিন্তার উত্তেজনায়, অবলীলাক্রমে বাপের গলায় ছুরি বসায়; মা স্বাধীনতার মোহে আচ্ছন্ন হয়ে নবজাত শিশুকে দেখে ঘৃণায় মুখ ফিরিয়ে নেয়; হয়ত বা নবজাত শিশুও উত্তরাধিকার সূত্রে "ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য" লাভ করে পূতনা বধের পুনরভিনয় করে থাকে। ব্যাপার গুরুতর বটে। কিন্তু ততোধিক গুরুতর আমাদের এই সর্ব্বজ্ঞতা। "সর্ব্বজ্ঞ" উপাধিটী লাভ করতে হলে, যে বিশেষ গুণটী আয়ত্ত করা দরকার, গত কয়েক শতাব্দী ধরে বিশেষ রকমেই তার চর্চ্চা হয়েছে—আমাদের দেশে। তারি ফলে উন্নতিশীল সভ্য-সমাজসমূহের সুধীসম্প্রদায় আজ যে সব

সামাজিক সমস্যার সম্মুখীন,—আমাদের নখদর্পনেই আমরা তার সমাধান দেখতে পাচ্ছি। সেটী হচ্ছে আমাদের সনাতন শাস্ত্রীয় সালসা, আর তার সাথে দেশাচারের সহস্র অনুপান।

এ যেন শিশুর কান্নাকাটি থামাতে গিয়ে দুধের সাথে আফিমের প্রয়োগ। আমরা যাকে শান্তি বলি, প্রকৃত পক্ষে সেটা হচ্ছে সামাজিক সুষুপ্তি! এই যদি সামাজিক জীবনের চরম লক্ষ্য হতো,—তাহলে অবিশ্যি ও ব্যবস্থা খুবই সমীচিন এবং বিজ্ঞানসম্মত হতো! কিন্তু তা ত নয়। অন্নচিন্তা যার নেই এমন লোকের পক্ষেও পক্ষাঘাত খুব লোভনীয় হতে পারে না। সমস্যা-পরিশূন্য অবস্থাই ত সামাজিক জীবনের পক্ষে পক্ষাঘাত! এমন কোনো শাস্ত্রানুশাসন সূত্রের সমাহার কল্পনাতেই আনা যায় না, যাতে করে মানুষের ক্রমবিকাশশীল মনের সকল রকমের সমস্যারই সমাধান সম্ভবপর হয়।

এই অসম্পূর্ণতার ফাঁক দিয়েই ত যুগে যুগে মানুষের চিন্তা এবং সাধনা সমাজ-শরীরে প্রবেশ লাভ করেছে। যে দিন আমরা এ প্রবেশিকা বন্ধ করেছি—সেই দিন থেকেই আমাদের সমাজে সামাজিক উচ্চ-চিন্তার স্রোতও মরে এসেছে। আজ যে আমাদের সমাজজোড়া এত অশান্তি—এই যে নমঃশূদ্র তার জল চালাতে চায়, কৈবর্ত্ত আর ভাড়া খাটতে চায় না, বারুই যজ্ঞসূত্র ধারণের অধিকারের জন্যে ব্যগ্র—এ সবই ত সেই বদ্ধ-দুয়ারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ। এই যে "সবুজ" মনের উচ্ছৃঙ্খলতা, যার দমনে বঙ্গ-সাহিত্য আজ মুখর—তাও ত সেই বদ্ধ-দুয়ারে তাদের বিরুদ্ধ মনের ঘাত প্রতিঘাত। এ চাঞ্চল্যের ভিতরে সমাজ-বিদ্বেষ নেই, আছে সমাজকে গতিশীল করবার আগ্রহ!

দেওয়া যে দেশের ধনবৃদ্ধির ও ধনরক্ষার জন্য একটা 'টারিফের' প্রাচীর মাত্র, 'পলিটিকাল ইকনমি' নামক বিজ্ঞান শাস্ত্রের যুক্তি-তর্ক এবং মহাজনের খাতার হিসাব-নিকাশেরই বিষয়, তা এরা কিছুতেই বুঝতে চায় না, এবং বুঝলেও তাতে কোনও ফল হয় না। এরা চায় গান আর কবিতা যার বিষয় হচ্ছে দেশের উত্তরের হিমালয়ের মাথার বরফের মুকুট, দক্ষিণের নীল সমুদ্রের তরঙ্গভঙ্গ, এবং যখন সমস্ত পৃথিবী মূক ছিল তখন আমাদের পূর্ব্বপুরুষেরা যে সামগানে সিন্ধু স্বরস্বতীর তীর ধ্বনিত করেছিলেন, সেই কাহিনী। অথচ এরা যে হাতে কলমে কাজে লাগতে পারে না বা কাজ উদ্ধার করতে পারে না, এমন নয়। এরা অর্দ্ধোদয়-যোগে দেশের দীনতমকেও নারায়ণের পূজায় সেবা করে এবং শৃঙ্খলার সঙ্গেই করে; বন্যার জলে চালের বস্তা পিঠে নিয়ে সাঁতার দেয়, এবং কোনও 'ডিপার্টমেণ্টের,' বিনা চালনায় অনুষ্ঠানটী যেমন করে' নির্ব্বাহ করে, তাতে কাজের চেয়ে কাজের শৃঙ্খলাই যাদের গর্ব্বের প্রধান বিষয়, সেই 'ডিপার্টমেণ্টের' কর্ত্তাদেরও কতক বিস্ময় কতক সন্দেহের উদ্রেক হয়; জাতির একটা দুর্ণাম ঘোচাবার জন্য এরা তুর্কীর গুলিতে টাইগ্রিসের পারে প্রাণ দিতে রাজী হয়, এবং তার শিক্ষানবীশিতে পূব-পশ্চিমের কোনও জাতির চেয়ে কম পটুতা দেখায় না। কিন্তু এ ত অতি স্পষ্ট যে এ সকলি কেবল ভাবের খেলা, এর মধ্যে বস্তুতন্ত্রতা কিছুই নেই। প্রকৃত কাজের বেলায় এদের চরিত্রে কোনও গুণই দেখা যায় না। এরা কিছুতেই উপলব্ধি করে না যে খুব দৃঢ়প্রতিজ্ঞা ও একনিষ্ঠার সঙ্গে আরম্ভ করে, সংসারযুদ্ধে জয়ী হ'য়ে দশের এক হওয়াই সব চেয়ে বড় কাজ, চরিত্রের সব চেয়ে বড় পরীক্ষা। সেইজন্য যদিও

বাল্যকালে বিদ্যাশিক্ষার পুঁথিতে এদের সেই সব মহাপুরুষদের জীবনী পড়ান হয় যাঁরা খুব হীন অবস্থা থেকে পরিশ্রম, অধ্যবসায় প্রভৃতি বহু সৎগুণের সদ্ব্যবহারে নিজেদের অবস্থা খুব বেশীরকম ভাল করেছিলেন; এবং ইংরেজী হাতের লেখা লিখ্‌তে আরম্ভ করেই সময় আর টাকা যে একই জিনিষ 'কপিবুক' থেকেই এরা সে অদ্বৈত-জ্ঞান লাভ করে, তবুও কিছু বড় হ'লেই এই পুস্তকস্থা-বিদ্যার ফল এদের স্বভাবে কিছু দেখা যায় না। তখন বাল্যশিক্ষার পুঁথির মহাজনদের অনুরূপ যে সব কৃতকর্ম্মা পুরুষ, সমাজে সশরীরেই বর্ত্তমান এরা তাঁদের কোনও খবরই রাখে না, এমন কি তাঁরা দেশের রাজার কাছে খুব উঁচু সম্মান পেলেও নয়। যারা কেবল কথার সঙ্গে কথা গাঁথ্‌তে পারে, বা লজ্জাবতীর পাতায় তামার তার জড়ায়, এরা তাদের নিয়েই অসঙ্গত রকম হৈ চৈ করে। অন্নচিন্তায় যে এরা কাতর নয়, কি অন্নচেষ্টা যে এদের উদ্বেজিত করে না তা নয়। সে চিন্তায় এরা যথেষ্টই ক্লিষ্ট; সে চেষ্টায় এরা অনেক দুঃখ অনেক অপমানই সহ্য করে। কিন্তু সে সব সত্বেও ঐ চিন্তা আর ঐ চেষ্টাকেই পরমোৎসাহে সমস্ত মন দিয়ে বরণ করে' নিতে কিছুতেই এদের মন সরে না। এদের ভাব কতকটা এইরকম যে রোগ যখন হয় তখন ডাক্তারও ডাক্‌তে হয়, ঔষধও গিলতে হয় এবং হাঙ্গামও কিছু কম হয় না। এবং যে চিররোগী, সমস্ত জীবনই বাধ্য হ'য়ে তাকে এই হাঙ্গাম সইতে হয়। কিন্তু তাই বলে রোগের চিকিৎসাকেই সব চেয়ে বড় উৎসাহের ব্যাপার করে তোলা সম্ভবপর নয়।

আমরা বাঙ্গালা দেশের ছেলে বুড়ো অন্নচিন্তার ব্যাপারে সবাই যে এই সব আশ্চর্য্য ও অস্বাভাবিক কাণ্ড করি, পূর্ব্বেই বলেছি এতে

আমাদের দোষ, কিছু নেই। দোষ পূর্ব্বপুরুষদের যাঁরা ও-সম্বন্ধে সুচিন্তা ও মনের কোন স্বাভাবিক ঝোঁক রক্ত-মাংসের সঙ্গে আমাদের দিয়ে যেতে পারেন নি। এই দায়িত্বহীনতার সাহসেই এই প্রবন্ধও সুরু করেছি। কেননা জানি বেফাঁস কথা যা কিছু ব'লবো তাতে আমার নিজের দায়িত্ব কিছুই নেই। দায়ী সেই পিতৃপুরুষেরা যাঁরা পিণ্ডের আশা করেন কিন্তু পিণ্ডের অন্ন সম্বন্ধে একনিষ্ঠ হ'য়ে চিন্তা করবার মতন মনের বা মগজের অবস্থা নিজেদের না থাকায় আমাদেরও দিয়ে যেতে পারেন নি।

(২)

দেশের প্রাচীন আচার্য্যেরা যখন অন্ন সম্বন্ধে চিন্তাই করেন নি, তখন সে চিন্তায় কিছু সাহায্য পেতে হ'লে পশ্চিমের আধুনিক যবনাচার্য্যদের কাছেই যেতে হয়। এঁদের মধ্যে একদল আছেন যাঁরা অন্ন-জিজ্ঞাসারই একটা স্বতন্ত্র শাস্ত্র গড়ে তুলেছেন। কিন্তু অন্ন সম্বন্ধে যিনি সব চেয়ে ব্যাপক অথচ গভীর ভাবে চিন্তা করেছেন তিনি এই অন্ন-শাস্ত্রের শাস্ত্রী নন তিনি একজন প্রাণতত্ত্ববিদ্ আচার্য্য, নাম চার্লস্ ডারুইন। ভৃগু-বরুণ-প্রসঙ্গের আলোচনায় আমরা দেখেছি যে অন্ন-তত্ত্বের এক ধাপ উপরে উঠলে পাই প্রাণতত্ত্ব। সুতরাং প্রাণতত্ত্বজ্ঞ ডারুইন যে তাঁর উপরের ধাপ থেকে অন্নের লীলা ব্যাপকতর ও স্পষ্টতর ভাবে প্রত্যক্ষ করবেন তাতে বিস্ময়ের কিছু নেই।

ডারুইন পূর্ব্বাচার্য্যদের কাছে থেকেই অন্নপ্রাণ-বিদ্যার এই বীজ মন্ত্রটী পেয়েছিলেন যে পৃথিবীতে যত প্রাণী জন্মে তাদের সকলের প্রাণ

রক্ষার উপযোগী পর্য্যাপ্ত অন্ন বসুমতি যোগাতে পারেন না। কিন্তু এই প্রাচীন মন্ত্রই বহু বৎসর ধরে একান্ত নিষ্ঠা ও কঠোর সংযমের সঙ্গে জপ কর্তে কর্তে পূর্ব্বে যা কারও ভাগ্যে ঘটে নি তাঁর সেই সিদ্ধি লাভ হ'ল। অন্ন তাঁর অদৃষ্টপূর্ব্ব বিশ্বরূপ ডারুইনকে দেখালেন। তিনি দেখলেন স্থলে, জলে, আকাশে—অরণ্যের ছায়ায়, মরুভূমির প্রান্তে, গাছের শাখায়, পর্ব্বতের গহ্বরে, সমুদ্রের তলে, হ্রদের বুকে—অন্নের জন্য প্রাণের এক অবিশ্রাম দ্বন্দ্ব চলেছে। অন্ন পরিমিত, তার আকাঙ্ক্ষী জীব সংখ্যাহীন। এই পরিমিত অন্নকে আয়ত্ত করার জন্য প্রাণীতে প্রাণীতে, উদ্ভিদে উদ্ভিদে, উদ্ভিদে প্রাণীতে যে দ্বন্দ্ব, তা যেমন বিরামহীন তেমনি মমতাহীন। এ দ্বন্দ্বে কেহ কারও সহায় নয়। এ হ'ল সকলের সঙ্গে প্রত্যেকের দ্বন্দ্ব। এই দ্বন্দ্ব কখনও প্রকাশ হচ্চে প্রকাশ্য যুদ্ধের রক্তোচ্ছ্বাসে, কখনও নিঃশব্দে চলেছে নীরব প্রতিযোগিতার আকারে। কোনটা বেশী ভয়ানক বলা কঠিন। অন্ন তাঁর মোহিনী মূর্ত্তিতে প্রাণকে আকর্ষণ করেছেন, আর আকৃষ্ট প্রাণীকে মহাকালের মূর্ত্তিতে সংহার করছেন। শেষ পর্য্যন্তও যাদের উপর প্রসন্ন দৃষ্টি রাখছেন সেই ভাগ্যবানদের সংখ্যা অতি সামান্য। মৃত্যুর মরুভূমির উপর দিয়ে অন্ন তাঁর সম্মোহন শঙ্খ বাজিয়ে চলেছেন। প্রতি মুহূর্ত্তে প্রাণের জোয়ারে দুকূল ছাপিয়ে উঠছে, কিন্তু সে উচ্ছ্বাস দু'পাশের তপ্ত-বালুতেই শুষে নিচ্ছে। প্রাণের একটা অতি ক্ষীণ ধারা কোনও রকমে শেষ পর্য্যন্ত অন্নের পিছনে পিছনে চলেছে।

অন্নের এই মোহিনীমহাকালের যুগলমূর্ত্তি দর্শন করে ডারুইন কাল জয় করে অমর হয়েছেন। কিন্তু প্রাণের সঙ্গে অন্নের লীলার এখানেই শেষ নয়। প্রাণের ধারা চল্‌তে চল্‌তে একদিন মানুষে এসে

ঠেক্‌ল। পৃথিবীতে প্রাণের ক্রমবিকাশ হ'তে হ'তে একদিন তা মানুষের মূর্ত্তি নিয়ে প্রকাশ হ'ল। কেমন ক'রে হ'ল সে কথা পণ্ডিত-দের তর্ককোলাহলে অপণ্ডিতসাধারণের কানে আসা দুঃসাধ্য; তাতে আমাদের প্রয়োজন নেই। কিন্তু এবার যে বিগ্রহে প্রাণের প্রতিষ্ঠা হল, সে বিগ্রহ অতি মনোরম, অতি বিস্ময়কর। তার সুঠাম, সরল, উন্নত দেহ, তার বন্ধনহীন মুক্ত বাহু, তার সতেজ ইন্দ্রিয়, তার সবল, অনাড়ষ্ট মাংসপেশী সবই যেন স্পষ্ট করে বলে দিল যে এ বিগ্রহ অরণ্যে পড়ে থাকবার নয়, এর জন্য একদিন সোণার দেউল গড়া হবেই হবে। তবুও প্রাণের এই প্রকাশের সব চেয়ে আশ্চর্য্য ব্যাপার তার এই মূর্ত্তি নয়। তার চেয়েও লক্ষগুণে আশ্চর্য্য এক ব্যাপার সংঘটিত হল। যে মন বোধ হয় পৃথিবীতে প্রাণের যাত্রারম্ভের সঙ্গেই তার সাথে ছিল, অতি ক্ষীণ অদৃশ্যপ্রায় অবস্থা থেকে নানা মূর্ত্তির মধ্য দিয়ে অতি ধীরে ধীরে ক্রমে উজ্জ্বল হয়ে উঠছিল, মানুষের মূর্ত্তিতে পৌঁছে সে একবারে দীপ্ত সূর্য্যের মতন জ্বলে উঠল। তার উজ্জ্বল দীপ্তিতে মানুষ পৃথিবার দিকে চেয়ে দেখ্‌ল যে এ বিপুল ধরিত্রী তারি রাজত্ব।

অন্ন তাঁর নিজের শক্তি সেইদিন পূর্ণরূপে উপলব্ধি করলেন যেদিন এই মানুষও রাজটীকা ললাটে নিয়ে কাঙালের মত তাঁর পিছু পিছু পৃথিবীময় ছুটে বেড়াতে লাগল। একটা ফলের জন্য দশটা গাছের তলায়, একটা শিকারের খোঁজে এক অরণ্য হতে আর এক অরণ্যে ঘুরে ঘুরে পরে অন্নকে কিছু সুলভ করে একটু সুস্থির হওয়ার চেষ্টায় গোটাকয়েক প্রাণীকে যদি পোষ মানাল, তবে সেই প্রাণীরূপ অন্নের অন্ন খুঁজতে এক দেশ হতে আর এক দেশে চল্‌তে চল্‌তে তার পায়ে ব্যথা ধরে উঠল।

এই অজ্ঞাতবাসের দুঃসহ দৈন্যে মানুষের বহু যুগ কেটে গেল। শেষে একদিন পরম শুভক্ষণে ক্লান্তদেহ, ক্ষুব্ধচিত্ত মানুষ বলে উঠল আর অন্নের আশায় তার পিছু পিছু ঘুরে বেড়াব না,—অন্নকে সৃষ্টি করব, স্বল্প অন্নকে বহু করব। সেদিন নিশ্চয়ই স্বর্গের তোরণে মঙ্গলশঙ্খ বেজে উঠেছিল; দিব্যাঙ্গনারা মর্ত্ত্যচক্ষুর অদৃশ্য হেমঘটে অভিষেক-বারি এনে মানুষের মাথায় ঢেলেছিলেন; ইন্দ্রদেব এসে সোণার রাজমুকুট তার মাথায় পরিয়েছিলেন; আর সমস্ত আকাশ ঘিরে দেবতারা প্রসন্ন নেত্রে দীর্ঘ বনবাসের পরে মানুষের নিজ রাজ্যে অভিষেক চেয়ে দেখেছিলেন।

কৃষি আরম্ভ হল। প্রাণের ধাপ থেকে মনের ধাপে উঠে মানুষ দেখল যে এখানে দাঁড়ালে অন্ন এসে আপনিই হাতে ধরা দেয়, তাকে পৃথিবীময় খুঁজে বেড়াতে হয় না। এখানে বসে তপস্যা করলে কালো মাটীর বুক চিরে সোণার ফসল বাইরে এসে পৃথিবী ঢেকে ফেলে; দিনের অন্ন দিন খুঁজে প্রাণান্ত হতে হয় না। মানুষ জানল, 'পৃথিবী বা অন্নম্', পৃথিবীই অন্ন। মাটীর তলে জলের অফুরন্ত ধারার মত মাটীর মধ্যে অন্নেরও অফুরন্ত ভাণ্ডার লুকান আছে; লাঙ্গলের ফালে তাকে তুলে আনতে জানলে অন্নের দৈন্য দূর হয়; যে মন্ত্র ডারুইন জলে, স্থলে, অন্তরীক্ষে প্রত্যক্ষ করেছিলেন তার শক্তিকে ব্যর্থ করা যায়। মাটীর সঙ্গে মানুষের হৃদয়ের সম্বন্ধ স্থাপন হল। মাটীর টানে উদ্ভ্রান্ত বনচারী গৃহী হল। সেইদিন মানুষের স্বদেশ, সমাজের প্রতিষ্ঠা হল, মানুষের গ্রাম নগর গড়ে উঠল, শিল্প বাণিজ্যের সুরু হল। পৃথিবীর আদিম অরণ্য কেটে সভ্যতার সোনার মন্দিরে মানুষের প্রতিষ্ঠা হল।

কিন্তু প্রাণের ভূমি থেকে আরম্ভ করে' মানুষের এই যে যাত্রা এখানেই তার শেষ হয় নাই। মন যখন সৃষ্টির ক্ষমতায় পরিমিত অন্নকে বহু করে' অন্নের দাসত্বের লোহার বেড়ি মানুষের পা থেকে খুলে নিল, বিরামহীন অন্নচেষ্টা থেকে তাকে মুক্তি দিল, তখনই মানুষের স্বভাবের যেটি পরমাশ্চর্য্য অংশ, সেটির বিকাশ হ'ল। মানুষ দেখ্‌ল যে কেবল অন্নে তার তৃপ্তি নাই,—তার পরিমাণ যতই অপর্য্যাপ্ত হ'ক, তার প্রকার যতই বিবিধ হ'ক। প্রাণের তাড়নায় অন্নের খোঁজে আকাশ, বাতাস, পৃথিবীকে জান্‌তে আরম্ভ করে' মানুষ বুঝ্‌ল যে তার স্বভাবে একটা কি আছে যেটা কেবল জানার দিকে তাকে ঠেলে দেয়। অন্নের সৃষ্টি আরম্ভ করে' সে জান্‌ল যে তার প্রকৃতির যেটা অন্তরতম অংশ সেটা কেবল সৃষ্টির আনন্দেই সৃষ্টি করে' যেতে চায়। মানুষ যেন প্রাণিরাজ্যের রাজা হলেও অপ্রাণ লোকেরই অধিবাসী। সে যেন বিদেশী রাজপুত্র পরদেশে এসে রাজত্ব পেয়েছে, কিন্তু তার অন্তরাত্মার নাড়ীর টান স্বদেশের দিকেই। প্রাণের জগতে মানুষের এই যে উদ্দেশ্যহীন জানা আর অনাবশ্যক সৃষ্টি তাই হ'ল তার বিজ্ঞান, দর্শন, ধর্ম্ম, কাব্য, কলা, শিল্প। মানুষের প্রাণ বলে এদের মূল্য এক কানা কড়িও নয়; তার অন্তর জানে এরাই তার যথা সর্ব্বস্ব, অন্নের চেয়েও কাম্য, প্রাণের চেয়েও প্রিয়।

এই হ'ল মানুষের সভ্যতার অন্ন আর প্রাণের ভূমি থেকে মনের সিড়ি দিয়ে বিজ্ঞান আর আনন্দলোকে যাত্রার ভ্রমণ-কাহিনী। এই লোকে পৌঁছিলেই অন্নের দাসত্ব থেকে মানুষের যথার্থ মুক্তি। মানুষ যদি কেবল অন্নকে আয়ত্ত করেই নিশ্চিন্ত থাক্‌তে পারত তা হ'লে অন্ন দাস হলেও মানুষের জীবনে তার সর্ব্বব্যাপী প্রভুত্বের কোনও

অপচয় হ'ত না। সোনার শিকলে অন্নকে বাঁধলেও শিকলের অন্য দিকটা মানুষের গলাতেই পরান থাক্‌ত, অন্নের টানে পৃথিবীময় না ঘুরতে হলেও সারাক্ষণ অন্নকে টেনেই পৃথিবীতে চল্‌তে হ'ত। এই বিজ্ঞান আর আনন্দলোকে পৌঁছিতে জানলেই মানুষের গলা থেকে এই অন্নের শিকল খোলার উপায় হয়। আমাদের ঋষিরা সংসারচক্র থেকে জীবের মুক্তির কথা বলেছেন। এই হ'ল মানুষের সভ্যতার অন্নচক্র থেকে মুক্তির পথ।

(৩)

যদি কারু মনে হয় যে মনের বলে মানুষের আয়ত্ত হয়ে, তাকে বিজ্ঞান আর আনন্দের পথের যাত্রী দেখে, মানব-জীবনের সঙ্গে যুদ্ধে পরাজয় স্বীকার করে', অন্ন চিরদিনের জন্য নিশ্চেষ্ট হয়ে গেছে তবে তিনি অন্নের প্রভাব এবং মাহাত্ম্যের কথা কিছুই জানেন না। মানুষের সভ্যতার যে মুক্তির কথা বলেছি সে হ'ল শাস্ত্রে যাকে বলে জীবন্মুক্তি, অর্থাৎ দেহও আছে, মুক্তিও হয়েছে। সুতরাং মানুষের দেহ আর প্রাণ যতদিন আছে তখন তার অন্নের উপর একান্ত নির্ভর আছেই আছে। এই ছিদ্র ধরে অন্ন অতি নিপুণ সেনাপতির মত এক নূতন পথ দিয়ে তার বল চালনা করে' মানুষকে বন্দী করবার চেষ্টা করেছে। প্রাচীন দ্বন্দ্বটা চলেছে, কেবল অবস্থার পরিবর্ত্তনে 'ট্রাজেডির' প্রভেদ ঘটেছে মাত্র।

যতদিন মানুষ কেবল প্রাণী ছিল, তার মনের পূর্ণ বিকাশ হয় নি, বিজ্ঞান ও আনন্দলোকের বার্ত্তা তার অজ্ঞাত ছিল, ততদিন অন্নের দৃষ্টি ছিল মানুষের প্রাণের উপর। যেমন ইতর প্রাণীকে তেমনি

মানুষকেও নিজের রথের চাকায় বেঁধে, অন্ন তার জীবন-মৃত্যুর উপর কর্তৃত্ব করত। এই যুদ্ধে অন্ন জয়ী হয়েছিল নিজেকে বিরল করে, আপনাকে দুর্লভ করে। মানুষের মন যখন অন্নকে বহু ও সুলভ করে এই উপায়টা ব্যর্থ করল সেইদিন থেকে অন্নের দৃষ্টি পড়েছে মানুষের বিজ্ঞান ও আনন্দলোকের দিকে। অন্ন জানে যে ওরাই তার প্রকৃত প্রতিদ্বন্দ্বী। মানুষের জীবনে যদি ওদের আবির্ভাব না হত, তাহলে নামে প্রভু হলেও রোমের শেষ সম্রাটদের মত মানুষ দাস-অন্নের দাসত্বই করত। কাজেই অন্নের এখন চেষ্টার বিষয় হয়েছে মানুষের সভ্যতার ঐ বিজ্ঞান আর আনন্দের লোকটা ধ্বংশ করা। আর প্রাণকে আয়ত্ত করার প্রাচীন চেষ্টার ব্যর্থতার মধ্যেই অন্ন এই নূতন যুদ্ধের অস্ত্র খুঁজে পেয়েছে। দুর্লভ অন্নকে বহু করে মানুষ সভ্যতা গড়েছে। এই বহু অন্ন অসংখ্য মোহিনী মূর্ত্তিতে মানুষকে ঘিরে তার বিজ্ঞান আর আনন্দলোকের পথরোধের চেষ্টা করছে। বিরলতার ক্ষয়রোগে মানুষের সভ্যতাকে ধ্বংশ করতে না পেরে বাহুল্যের মেদরোগে তার হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়াটা বন্ধ করবার চেষ্টা দেখছে। অন্ন এখন মহাকালের মূর্ত্তি ছেড়ে কুবেরের মূর্ত্তি ধরেছে। মানুষের কত সভ্যতা মহাকালের করাল দংষ্ট্রা হতে উদ্ধার পেয়ে স্থূলোদর ভোগপ্রসন্নমুখ কুবেরের মেদপুষ্ট বাহুর আলিঙ্গনের মধ্যে নিশ্বাসরুদ্ধ হয়ে মরেছে!

মানুষের সভ্যতার সঙ্গে অন্নের এই দ্বন্দ্ব নূতন নয়, এ দ্বন্দ্ব অতি প্রাচীন। সভ্যতার সৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গেই এ দ্বন্দ্বেরও আরম্ভ হয়েছে এবং বোধ হয় শেষ পর্য্যন্তই চলবে। কখনও সভ্যতা জয়ী হয়েছে, কখনও বা অন্নেরই জয় হয়েছে। মানুষে মানুষে শেষ যুদ্ধের বর্ত্তমান

কল্পনার মত এ যুদ্ধের শেষ কল্পনাও হয়ত কেবল স্বপ্ন। হয়ত মানুষের সভ্যতাকে চিরদিনই এই দ্বন্দ্বের মধ্য দিয়ে উঠে পড়ে চলতে হবে।

এই চিরন্তন দ্বন্দ্বের মধ্যে মানুষের সভ্যতা রক্ষা পেয়েছে কেননা যুগে যুগে এমন সব জাতি উঠেছে যারা অন্নের মায়াকে অতিক্রম করে আনন্দের পথে চলতে পেরেছে। ভুল হতে পারে, কিন্তু আমার বিশ্বাস আধুনিক বাঙ্গালী সেই সব জাতির অন্যতম। সভ্যতার এই প্রাচীন যুদ্ধে নবীন সেনাপতি হবার যোগ্যতা এদের মধ্যে আছে। অন্নের মহাকাল-মূর্ত্তিতে ভয় পেয়ে যাঁরা এই জাতিকে কুবেরের কোলে তুলে দিয়ে নিশ্চিন্ত হতে চান, তাঁদের মাথায় বুদ্ধি থাকতে পারে, কিন্তু চোখে দৃষ্টির অভাব। আনন্দলোকের সূর্য্যরশ্মি বিজয়-মাল্যের মত এদের মাথায় এসে পড়েছে; হিতৈষিদের শত চেষ্টাতেও সে বরণকে উপেক্ষা করে কেবল অন্নকে বহু করার চেষ্টাতেই এ জাতি কখনও জীবন উৎসর্গ করতে পারবে না।

"অন্নং ন নিন্দ্যাৎ"; অন্নের নিন্দা করি নে। "অন্নং বহুকুর্বীত"; অন্নকে বহু করার যে কত প্রয়োজন তাও জানি। সেই ভিত্তির উপরেই মানুষের সভ্যতা দাঁড়িয়ে আছে। সমস্যা এই, কেমন করে অন্নকেও বহু করা যায় আবার তার বাহুল্যকেও বর্জ্জন করা যায়। মহাকালের দংশনেও ছিন্ন হতে না হয়, কুবেরের গদাও চূর্ণ না করে।

এস নূতন যুগের নবীন বাদরায়ণ! 'অথাতোঽন্ন জিজ্ঞাসা' বলে তোমার অন্নসূত্র আরম্ভ করে এই সংশয়ের সমাধান কর। কোন মধ্যযান পথের পথিক হলে মানুষের সভ্যতাকে আর আনন্দের ব্রহ্ম-লোক হতে ফিরে আস্‌তে না হয় তার নির্দ্ধারণ কর।

শ্রীঅতুল চন্দ্র গুপ্ত।

সাহিত্য-বিচার।

—*—

যে দু'দিক হতে বাংলা সাহিত্য বিচার করা হয়ে থাকে, তা হচ্চে ভাষা ও নীতি; আর, যে দু'দিক সাধারণত উপেক্ষিত হয়ে থাকে, তা হচ্ছে ভাব ও শিল্প।

ভাষা সম্বন্ধে উভয় দলের বক্তব্য একপ্রকার নিঃশেষিত হয়েছে বলে মনে হয়;—এখন যা চলেছে তা হচ্ছে নিছক গালি। আর গালিটা যে কোনদিক হতে বর্ষিত হচ্ছে তা বলা আমার পক্ষে শোভন নয়, কারণ নিশ্চিত-অপরাধীকে দেখিয়ে দিলেও অনিরপেক্ষতা দোষে দোষী হতে হয়। সাহিত্যবিচার যখন ব্যক্তিগত নিন্দায় পর্য্যবসিত হয়, তখন শুধু সাহিত্যের নয়, সমাজেরও দুঃসময়, কারণ সমাজ ও সাহিত্যের ঘনিষ্ঠতাসম্বন্ধে কিছু বলা অনাবশ্যক।

ভাষা নিয়ে এই যে বিতণ্ডাটা হচ্ছে, এর ভিতর যে বিষয়টি আমাকে সবচেয়ে বিস্ময়াবিষ্ট করে, তা হচ্ছে ভাষার সীমালঙ্ঘন নিয়ে তর্ক। পুথির ভাষার প্রকৃতি কিপ্রকার হওয়া উচিত—তা নিয়ে তর্ক সম্ভব হলেও, শব্দসংখ্যা নির্দ্দেশ করতে যাওয়া যার-পর-নাই বিস্ময়কর ব্যাপার। বাংলা ভাষা প্রাকৃত হলেও, প্রকৃত হওয়া সম্বন্ধে আপত্তি থাকতে পারে না। সংস্কৃতের রাজ্য হতে সে যদি শব্দ এনে বেমালুম হজম করতে পারে, তবে সেটা তার প্রকৃতিগত, এবং প্রাণধারণের অবশ্যাম্ভাবী ফল। ভাষাকে দুর্ব্বচনীয় করতে নব্যপন্থীদের আপত্তি

থাকলেও, উহাকে অনির্ব্বচনীয় করতে তাঁদের কোনো আপত্তি পরিলক্ষিত হয় না। তাঁদের তর্কের বিষয় হচ্ছে ভাষার সচলতা, তাকে মন্থরতা থেকে মুক্তি দিয়ে ক্ষিপ্র, সতেজ, চতুর করা। ইংরাজী যদি Anglo-Saxon ভাষা হত, তবে তা কখনই এত সম্পদশালী হতে পারত না। Norman Conquest-এর ফলে যখন অজস্র Norman শব্দ তাদের নানা অর্থ-বৈচিত্র্য নিয়ে তার ভিতরে প্রবেশ করলে, তখন তার ঐশ্বর্য্যের সীমা রইল না, এবং সে ভাষা Anglo-Saxon ও রইল না, Norman ও হল না—হল বর্ত্তমান ইংরাজী ভাষা। বাংলা তেমনি প্রাকৃতও নয়, সংস্কৃতও নয়—তা বাংলা।

তারপর নব্যসাহিত্যে দুর্নীতি দেখে যাঁরা এতটা মনঃক্ষুণ্ণ হয়েছেন যে, লেখকদের কশাঘাত করা আবশ্যক মনে করেন তাঁদের শাসনে যে দেশের কল্যাণকামনা অন্তর্নিহিত রয়েছে তা নিঃসন্দেহ; কিন্তু অনেক ক্ষেত্রেই ঐ দুর্নীতি যে কাল্পনিক, তা প্রমাণ করতে চেষ্টা করবার ধৃষ্টতা আশা করি মার্জ্জনীয়।

নীতির ক্ষেত্রে ইভলুসনের নিয়ম কার্য্য করে কিনা, বা কোনও বিশেষ নীতিশাস্ত্র চিরধ্রুব থাকতে পারে কি না, সে সম্বন্ধে প্রথমে কিছু না বলে,—নব্যসাহিত্যে বর্ত্তমান নীতির সীমা কোথায় লঙ্ঘিত হয়েছে, তা দেখা যাক। "ঘরে বাইরে" দৃষ্টান্তস্বরূপ নেওয়া যেতে পারে। "ঘরে বাইরের" ভিতর কেহ কেহ বর্ত্তমান সমাজভিত্তির ভাবী টলটলায়-মান অবস্থা দেখে সচকিত হয়ে পড়েছেন, এবং লেখনীর সাহায্যে সম্ভব না হলে, লগুড়ের সাহায্যে এ "কালাপাহাড়কে" সাহিত্য হতে বহিষ্কৃত করতে কৃতসংকল্প হয়েছেন। উদ্দেশ্য তাঁদের সাধু। কিন্তু বঙ্গনারীর সম্মুখে কবি কি বিমলাকে আদর্শস্বরূপ দাঁড় করিয়েছেন, না বঙ্গযুবকের

কাছে সন্দীপকে আদর্শ নায়করূপে স্থাপন করেছেন? সন্দীপ ও বিমলার বন্ধনহীনতা—যাকে উচ্ছৃঙ্খলতা বলা হয়েছে—কি নিখিলেশের উদারতা, ত্যাগ, প্রেম ও সংযমকে সমধিক মহিমান্বিত করছে না? "ঘরে বাইরে" পড়ে একজন সরল পাঠক বলেছেন, "সন্দীপকে ঘর থেকে বের করে দিলেই তো এ সব হিজিবিজির সৃষ্টি হত না"! নিজের স্নিগ্ধজ্যোতিতে জ্যোতিষ্মান্ হয়ে কে আদর্শরূপে আমাদের কাছে দাঁড়াচ্ছে?—নিখিলেশ। বিরাগী না হয়ে ত্যাগদ্বারা ভোগকে কে মহিমান্বিত করছে?—নিখিলেশ। মৃত্যু অপেক্ষাও দারুণ বিপদের সম্মুখে কে স্থির, সমাহিত?—নিখিলেশ। আদর্শ কে?—নিখিলেশ।

সমাজে স্ত্রীপুরুষের যথার্থ সম্বন্ধ নিয়ে আলোচনা পৃথিবীব্যাপী, এবং সত্য সম্বন্ধ এখনো নির্ণীত হয় নি। তবে স্ত্রীর ব্যবহার সম্বন্ধে দায়িত্বের ভারটা স্ত্রীর স্কন্ধে চাপানোটাই যে স্বাভাবিক, এ সহজ কথাটি তাঁদের বুঝতে কষ্ট হয় নি, কারণ তা নাহলে স্ত্রীজাতির মনুষ্যত্বকে একেবারেই খর্ব্ব করা হয়। বার্ণার্ডশ তাঁর "Irrational Knot"-এ এ সত্যটি সুন্দররূপে পরিস্ফুট করেছেন। সুতরাং দায়িত্ববোধ জাগ্রত রাখতে হলে, কার্য্যক্ষেত্রে মুক্তিপ্রদানও আবশ্যক। স্ত্রীজাতি বাঙালীর কাছে কাঁচাকলাজাতীয়। রৌদ্র-বাতাসের সংস্পর্শে পরিণতি প্রাপ্ত হয়ে বিশ্বের ভিতর তার যথার্থ স্থান নেবার পূর্ব্বেই তাকে লঘুপথ্যরূপে হজমের চেষ্টা করা হয়ে থাকে, কারণ এবম্বিধ করাই hygienic। ব্যাধিগ্রস্ত বাঙালীর পক্ষে ও-বস্তুর পরিণত ও স্বাভাবিক অবস্থায় তাকে হজম করা দুঃসাধ্য বলে, অপরিপক্ব অবস্থায় রন্ধনের সাহায্যে উহাকে মুখরোচক করার চেষ্টা করতে হয়। এও একটা আর্ট বটে।

কিন্তু তাতে করে যা পাওয়া যায় তা মানুষ নয়—তা পুতুল, এবং সেই পরিবারকেই Ibsen "Doll's House" বলেছেন, যেখানে চালকের ইঙ্গিতে পুতুল নৃত্য করতে থাকে। তাঁর "The Wild Duck" ও "The Lady of the Sea"-তে ও এই বক্তব্য পরিস্ফুট করেছেন। শেষোক্ত পুস্তকে তিনি দেখিয়েছেন যে, স্বামীকে সাগরের মতো অসীম, উদার, গভীর ও বাধামুক্ত হতে হবে।

স্বাতন্ত্র্যের সহিত মিলনের সামঞ্জস্য কিরূপে সংঘটিত হতে পারে, এটা সম্ভবতঃ বুঝে ওঠা কঠিন; কিন্তু উভয়ের মিলন তো আর একের বিনাশ নয়;—স্বাতন্ত্র্যকে স্বীকার করেই মিলন। সুরের মাধুর্য্য ছন্দের মিলকে অনাবশ্যক করে। প্রেমের গভীরতায় ব্যবহারিক বিরোধ লুপ্ত হয়ে যায়, এবং মুক্তির ক্ষেত্রই প্রেমের লীলাভূমি। সম্ভবতঃ নিখিলেশের অসাধারণ ক্ষমাশীলতা কোনো কোনো পাঠকের নিকট পীড়াদায়ক হয়েছে। ক্ষমার রাজ্যে নারীজাতির একচ্ছত্র আধিপত্যে আমরা অভ্যস্ত। এ ক্ষেত্রে সর্ব্বসম্মতিক্রমে তাঁরা রাজ্ঞী হয়েছেন। পুরুষের উচ্ছৃঙ্খলতা বা নিষ্ঠুরতা তাঁরা যখন নম্র হয়ে মার্জ্জনা করেন তখন তার ভিতর কোনো অসাধারণতাই আমরা দেখতে পাই নে, কেননা সেটা পুরুষের প্রাপ্য বলে গণ্য করা হয়ে থাকে। সুতরাং স্ত্রীসম্বন্ধে স্বামীর অভ্যস্ত ব্যবহারের ব্যতিক্রম আমাদিগকে এতই রুষ্ট করে তোলে যে, আমরা যষ্ঠী উত্তোলন করতে বাধ্য হই। বিমলা সম্বন্ধে নিখিলেশ সীতানির্ব্বাসনের পালা যে অভিনয় করেন নি—এ আমাদের বিস্ময়ে অভিভূত করে ফেলে।

এরূপ রুষ্ট হওয়ার মূলে একটা গুরুতর কারণ রয়েছে, তা হচ্ছে অতীতনামক শব্দটির তাৎপর্য্য ঠিক বুঝতে না পারা। জগতে কিছুই

চিরকালের মতো হয়ে যায় না, অর্থাৎ কোনোকিছুরই সমাপ্তি নেই। কথাটি "Being" ও "Becoming" সম্বন্ধে মামুলী কুটতর্ক নয়—ইহা একটি সত্য; এবং এটি বর্ত্তমান যুগের একটি বিশেষ-সুর, যার প্রধান গায়ক Maurice Maeterlinck ও Rudolf Eucken।

Eucken বলেছেন—"If all depends on the slender thread of the fleeting moment of the present, which illumines and endures merely for a twinkling of an eye, but to sink into the abyss of nothingness, then all life would mean a mere exit into death......Without connexion there is no content of life"। বর্ত্তমান ও ভবিষ্যতের ভিতর দিয়ে অতীত যে নিয়ত আপনাকে গড়ে তুলচে, তা ভুললে অতীতের সমগ্র চেহারা দেখা হবেনা, সুতরাং খণ্ডভাবে দেখলে তাকে ভুল দেখা হবে! অতীত অপরিবর্ত্তনীয় শাশ্বত পদার্থ নয়,—বর্ত্তমান ও ভবিষ্যতের সংঘাতে সে রূপান্তর প্রাপ্ত হতে থাকে। Thomas Hardy তাঁর "Tess of the Durbervilles"-এ Tess-এর চরিত্রে এ সত্যটি চমৎকার ফুটিয়েছেন। নিখিলেশ সেই সমগ্রতার জন্য নীরবে অপেক্ষা করে ছিল। সে সত্য চেয়েছিল, মোহ চায়নি। সকল বিরোধের ভিতরেও নিখিলেশ প্রেমের শাশ্বতরূপ হারায়নি। তার মানসী, অপরিচ্ছন্ন দর্পনের ভিতর দিয়ে প্রতিফলিত হওয়ার দরুণ, বিকৃত হয়েছিল মাত্র। তাই নিখিলেশ বল্‌ছে—

"এই বিশ্ববস্তুর পর্দ্দার আড়ালে আমার অনন্তকালের প্রেয়সী স্থির হয়ে বসে আছে। কত জন্মে কত আয়নায় ক্ষণে ক্ষণে তার ছবি দেখ্‌লুম—কত ভাঙা আয়না, বাঁকা আয়না, ধুলোয় অস্পষ্ট আয়না। যখন

বলি আয়নাটাই আমার করে নিই, বাক্সর ভিতর ভরে রাখি, তখন ছবি সরে যায়। থাক্‌না, আমার আয়নাতেই বা কি, আর ছবিতেই বা কি। প্রেয়সী, তোমার বিশ্বাস অটুট রইল, তোমার হাসি ম্লান হবে না, তুমি আমার জন্যে সীমন্তে যে সিঁদুরের রেখা এঁকেছ, প্রতিদিনের অরুণোদয় তাকে উজ্জ্বল করে ফুটিয়ে রাখ্‌চে।"

সাহিত্যে যে পদে পদে টীকার আবশ্যক হয়ে পড়ে, এটা মানব-জাতির দুর্ভাগ্য। শুধু টীকার আবশ্যক হলেও এতটা গলদ্‌ঘর্ম্ম হতে হত না,—বিশদ টিপ্পনির আবশ্যকতা আরো বেশী। বাংলা নব্যসাহিত্যে টিপ্পনি মানে ভ্রান্তির সঙ্গে লড়াই ;—comment নয়,—vindication। নব্যপন্থীরা শুধু ভাললাগার কৈফিয়ৎ দিচ্ছেন। নজির না দেখিয়ে, কারো বিশেষ লেখা ভাল লাগচে, এ কথা প্রকাশ করা বিপদ-সঙ্কুল।

সর্ব্বদেশীয় সাহিত্যেই সমালোচনা আছে। ম্যাথু আর্নল্ড সমালোচনা দ্বারা সাহিত্যে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছেন, কারণ তাঁর সমালোচনায় সৃষ্টির পরিচয় পাওয়া যায়। তাঁর "Poetry is a criticism of life" এখনো বহু সাহিত্যিকের চিন্তাকে প্রবুদ্ধ করছে। এঁদের সমালোচনায় সত্যানুসন্ধানের চেষ্টা পরিষ্কার বুঝতে পারা যায়। মনটাকে যতদূর সম্ভব সংস্কার বর্জ্জিত করে এঁরা সত্যলাভের চেষ্টা করেছেন। সাহিত্য-প্রাসাদে এঁরা যেন আমাদিগকে হাত ধরে নিয়ে যাচ্ছেন, এবং অবরুদ্ধ দ্বার-গুলিকে উদ্‌ঘাটিত করে ভিতরের ঐশ্বর্য্য দেখিয়ে চমৎকৃত করছেন। অপরপক্ষে বিদেশীয় সাহিত্যে বিরুদ্ধ সমালোচকও রয়েছেন। Ibsenকে দেশ ছেড়ে পালাতে হয়েছিল। Cardinal Newmanকে

বিস্তর লাঞ্ছনা পেতে হয়েছিল। Dante বানপ্রস্থ অবলম্বন করেছিলেন। কিন্তু এঁদের দুর্ভাগ্য কাব্যকলাঘটিত নয়;—এঁদের বাণীর অপূর্ব্বতার জন্য; রসভাগের জন্য নয়;—বস্তুভাগের জন্য।

ইদানীং সমালোচনার মাপকাঠি আবিষ্কার করতে অনেকেই লেগে গেছেন। প্রথম আবিষ্কারের গৌরব যাঁর ভাগ্যেই পড়ুক, মাপকাঠিটি ব্যবহার করতে হলে যে ক্ষমতাটির একান্ত প্রয়োজন তা এখনি বলে রাখা যেতে পারে;—সেটি হচ্ছে সহানুভূতি। লেখকের সঙ্গে অনুভব করবার যাঁর ক্ষমতা নেই, তিনি সমালোচনার আসরে নামলে সাহিত্যের কোনো উন্নতি তো হতেই পারে না, বরং অশেষ অকল্যাণ হবার সম্ভাবনা। নব্যসাহিত্যের ভাবের দৈন্য ও ভাষার দৈন্যের প্রতি সম্প্রতিঅঙ্গুলি নির্দ্দেশ করা হয়েছে। "ভাষার দৈন্য" বাক্যটি কি অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে, তা এখনো সমঝে উঠতে পাচ্ছি নে। সবুজ পত্রীয় ভাষাকে "বীরবলী" বা "বিদ্‌ঘুটে" যা-ই বলা চলুক, দীন বললে শুধু "দীন" শব্দটির অর্থ সম্বন্ধে অজ্ঞতা বা অসাবধানতা ভিন্ন আর কিছুই প্রকাশ পায় না। ভাষার phonetics-এর সঙ্গে তার দীনতার কোনোই সম্বন্ধ নেই।

নব্য সাহিত্যের আর একটি দুর্নাম এই যে, তা সোজা কথাকে সোজা করে বলতে জানে না বা বলে না,—বাক্যের ব্যূহ ভেদ করে যে জিনিসটুকু পাওয়া যায়, তা এতই সামান্য যে মজুরী পোষায় না।

ঠিক একই ভাবকে পুনঃপুনঃ নানা কথায় প্রকাশ করলে, অর্থাৎ একই কথা একশো বার বললে তার জন্য একটা জবাবদিহি নিশ্চয়ই রয়েছে, কিন্তু প্রকাশের বিভিন্নতা দ্বারা Shades of meaning সূচিত হচ্ছে কিনা, তা খুঁজে দেখা উচিত। তা ছাড়া শব্দরাজ্যেও শিল্প

আছে, এবং সাহিত্যিকেরও শব্দশিল্পী হতে বাধা নেই। গদ্যসাহিত্যেও সঙ্গীতের আবশ্যক। নব্য সাহিত্যে ভাব-দৈন্য যে বিলক্ষণ রয়েছে তাতে কোনো সন্দেহ নেই, কেননা এ সাহিত্যের ভাবে দেশের অভাব মোচন হচ্ছে না। কূপ খনন, প্রাইমারি বিদ্যালয় সংস্থাপন, ম্যালেরিয়া দমন প্রভৃতি অত্যাবশ্যকীয় বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি না দিয়ে, নব্য সাহিত্যিকগণ চিত্তের স্বাধীনতা ওরফে উচ্ছৃঙ্খলতাকে প্রশ্রয় দান করছেন, নয় তো ব্যর্থজীবনের সার্থকতা প্রমাণ করছেন, বা আলস্যের নিগূঢ় মহিমা কূটতর্কের সাহায্যে প্রতিপাদন করছেন—এক কথায় হেলাফেলায় জীবনটাকে কাটিয়ে দিচ্ছেন। এমন কি লজ্জিত হওয়া দূরে থাকুক—ওরূপ করার ভিতরে যে রমণীয়তা আছে—তা পর্য্যন্ত প্রমাণ করতে চেষ্টা করছেন। এই ত হচ্ছে সমালোচকদের মত।

এককালে ইংলণ্ডেও কোনো কোনো লেখক "Art for art's sake" বাক্যটি সইতে পারেন নি! কিন্তু এখন সেদিন ঘুচে গেছে। Blackmore-এর "Lorna Doone" নিছক romance, কিন্তু রসসৌন্দর্য্যে epic-এর সৌভাগ্য লাভ করেছে। Hawthorne-এর "Scarlet Letter", Poe-এর "Tales of Mystery & Imagmation" শুধু রসিকের জন্য লিখিত। "Quo Vadis"-এ Cæsar-এর চরিত্র ওরূপ ভাবে বর্ণনা না করলে ইতিহাস কিঞ্চিন্মাত্রও ক্ষতিগ্রস্ত হত না। এরূপ বহু দৃষ্টান্ত দেওয়া যেতে পারে।

সাহিত্যের সঙ্গে ম্যালেরিয়ার সম্পর্ক সবুজ পত্র-সম্পাদক মহাশয় বিচার করেছেন, এবং তাতে তিনি দেখিয়েছেন যে উক্ত ব্যাধি দমনের

চেষ্টা না করেও সাহিত্য চলতে পারে, এমন কি ওরূপেই সাহিত্যের চলা উচিত।

ফুলে ফলে বিচিত্র এই সৃষ্টিকাব্য ভগবানের অহেতুকী-আনন্দ হতে জন্মলাভ করেছে, এবং সেজন্য তাঁকে কোনো কৈফিয়ৎ দিতে হয় না, কেননা শাস্ত্রেই রয়েছে "আনন্দানি খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে,"—অতএব তাঁর সাতখুন মাপ। কিন্তু মাটির কবি এ বিপুল সৃষ্টি-কাব্যের ভিতর আনন্দ আবিষ্কার করতে গেলেই তাঁর দূর্ভাগ্যের অন্ত থাকে না। লোক চক্ষুর অন্তরালে লক্ষফুল বিনা লক্ষ্যে ঝরে পড়চে; লক্ষগ্রহ বিনালক্ষ্যে নৃত্য করচে; লক্ষজীব বিনালক্ষ্যে দুদিনের জন্য পৃথিবীতে আসচে, যেন শুধু ফিরে যেতে; লক্ষহাসি হাওয়ায় মিশে যাচ্ছে; লক্ষকান্না বৃথাই বক্ষবিদীর্ণ করচে। এ সকল বিচিত্র ব্যাপারের সংমিশ্রনে যে মহাকাব্য রচিত হচ্ছে; তা যে ভগবানের শুধু লীলাখেলা—তা মানতে তো কারো আপত্তি দেখছি নে!

জীবনের সকল ক্ষেত্রেই—সুতরাং সাহিত্যেও—সত্যকে জানতে হলে প্রথমতম এবং প্রধানতম আবশ্যকীয় জিনিস হচ্ছে চিত্তের স্বাধীনতা। মানুষের বিশেষত্ব হচ্ছে বিচার-ক্ষমতা, অন্ততঃ বিচার-প্রবৃত্তি। যেখানে সে প্রবৃত্তি নেই, সেখানে তর্ক করে বোঝাবার চেষ্টা শুধু অরণ্যে রোদন।

শ্রীশিশিরকুমার সেন।

পুষা

আচার ও বিচার।

—————*—————
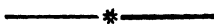
আচার ও বিচারের মধ্যে বিবাদটা সম্প্রতি যেন একটু বেশী মাত্রায় পাকিয়া উঠিয়াছে। উভয়ের এই গরমিলটা যে নিতান্ত একেলে—সেকালে যে ইহার নামগন্ধ ছিল না, এমন একটা আক্ষেপের কারণ নিশ্চিতই নাই। মানুষ যে দিন হইতে এই ধরাধামে সমাজ বাঁধিয়া বাস করিতে শিখিয়াছে, সেই দিনেই এই বিবাদের সূত্রপাত। তবে অবশ্যই ইহা ভাদ্রের ভরা নদীর মত চিরক্ষণই খর একটানা বয় না, ইহাতে হ্রাস বৃদ্ধি, উজান ভাটি সবই আছে।

আচার যে প্রথম দেখা দেয়, সে তো বিচারেরই হুকুমে। দুয়ের মধ্যে সদ্ভাব থাকাই ত সামাজিক সুস্থতার অবস্থা। সমাজের দেহে যখন ব্যাধির প্রকোপ ঘটে, তখনই না এই বিরোধের সূচনা। সমাজ যে কখনই সুস্থ থাকে না এমন নয়, তাই বিচার ও আচারের মিলও অনেক সময় অনেক স্থলে টিঁকিয়া থাকে। কিন্তু যখন বিবাদ বাধে, তখন আর সহজে মিটে না। গালাগালি থেকে হাতাহাতি, এমন কি রক্তারক্তিতেও দাঁড়াইতে পারে।

তবে সুখের বিষয় জ্ঞানের ক্ষেত্রে মানুষ এখন অনেকটা মাথা ঠাণ্ডা রাখিতে পারে। অবশ্য বৈষয়িক স্বার্থের ব্যাপারে ইহার ঠিক উল্টা। যে দিন ঠাণ্ডা মাথায় মানুষ উভয় ক্ষেত্রে বিচরণ করিতে সমর্থ হইবে, সে দিন জগতে মহা মঙ্গলের যুগ দেখা দিবে। বর্ত্তমানে বিচার ও

আচারপক্ষের বিরোধে ততটা হলাহল না থাকুক, ইহা যে শুক ও শারীর দাম্পত্য কলহের মত সহজে মিটিবার নয়, এটা ঠিক। এখন সভ্য সমাজে বিচার ও আচার পূর্ব্বের ন্যায় আর রক্তচক্ষে পরস্পরে তাল ঠুকিয়া দাঁড়ায় না বটে, তাহা বলিয়া রেষারেষি দ্বেষাদ্বেষি এখনও বড় কম নাই। এখন এক পক্ষ অপর পক্ষকে আগুনে পোড়ায় না, বা জলে ডুবায় না বলিয়াই যে একেবারে প্রেমে বিগলিত হইয়া কেবলই সুধাবচনে বুঝাইতে থাকে, সমগ্র মানবসমাজ আজও এতটা সমুন্নত নয়। যাই হক, এখন এই বিরোধের বিষয়ে কিছু বলিবার আগে ইহার প্রকৃতিটা একটু বুঝিতে চেষ্টা করা যাক।

একটা প্রথা যখন দেখা দেয়, তাহার মূলে একটা বিচার ও যুক্তি অবশ্যই থাকে। ভাষান্তরে প্রথাটাকে বিচারের একটা সম্পত্তিবিশেষ বলা যাইতে পারে। নিজের জিনিস হইলেও বিচার, প্রথার রক্ষার ভার চিরদিন নিজের হাতে রাখে না। কালে সেটা আচারেরই কুক্ষিগত হইয়া পড়ে। প্রথাটাকে যখন কাজের পর কাজে লাগান হয়, বিচার আর তাহাকে লইয়া প্রতিপদে নাড়া-চাড়া করে না। সেটাকে আচারের হাতে ছাড়িয়া দিয়া সে কতক নিশ্চিন্ত থাকে। অনেক সময় বহুদিন ধরিয়া বিচার তাহার খোঁজ-খবরও বড় রাখে না। আচার কিছুদিন সেটাকে চালায়ও বেশ। কিন্তু সে ক্রমে সেটাকে নিজেরই একটা শক্তির বিকাশ বলিয়া মনে করে, সেটার সঙ্গে বিচারের যে কিছু সম্পর্ক আছে, তাহা সে যেন এক রকম ভুলিয়াই যায়। এইরূপে প্রথাটা ক্রমে আচারের হাতে একটা উৎপীড়ন ও উপদ্রবের কারণ হইয়া দাঁড়ায়। বিচার হইতে বিচ্যুত হইলে, আচার একটা অন্ধ শক্তি মাত্র। অনেক সময় এই মোহান্ধ আচার নিজের প্রভাব ও জেদ বজায়

রাখিতেই বেশী সমুৎসুক, সমাজের হিতের দিকে সে ফিরিয়াও তাকায় না। তাই যে প্রথাটা প্রথমে মঙ্গলের মূর্ত্তিতে দেখা দিয়াছিল আচারের জোর ও জবরদস্তিতে সেটা ক্রমে মহা অনর্থের হেতু হইয়া উঠে।

একটা বিশেষ উদাহরণ লইয়াই ব্যাপার দেখা যাক্। বাঙ্গালায় কৌলীন্য-প্রথা অবশ্যই প্রথমে সৎ বিচারবুদ্ধি হইতেই দেখা দিয়াছিল। গুণের আদর করা সমাজের পক্ষে অবশ্যই হিতকর। কৌলীন্য-প্রথা মূলতঃ এই গুণের আদর ভিন্ন আর কিছুই নয়। কিন্তু প্রথাটা যখন অন্ধ আচারের কবলে পড়িয়া গেল, তখন কোথায় তাহার সেই প্রাথমিক মঙ্গল মূর্ত্তি! সূর্য্য-বংশের একজন গুণসম্পন্ন রাজা যখন মুনি-পুত্রের শাপে রাক্ষস হইয়া পড়িলেন, তখন তাহার উপদ্রবে দেশময় ত্রাহি ত্রাহি রব উঠিয়াছিল। কৌলীন্য-প্রথায় কাহার অভিশাপ লাগিল জানি না, কিন্তু তাহার উপদ্রবে বড় কম রাক্ষসী শক্তির লীলা দেখা যায় নাই। ঐ যে নৈকষ্য কুলীনপ্রবরের চিতাগ্নির সঙ্গে কাহন দুই চার বাঙ্গালী রমণী—তাহাদের বয়সের ভিন্নতা শুধু পাঁচ হইতে পঞ্চাশের মধ্যেই নয়, মানুষের আয়ুষ্কাল ঐ উভয় সংখ্যার অপর পার্শ্বেও যতটা যাইতে পারে, তাহাও বাদ পড়ে না—অম্লান বদনে শাঁখা ভাঙ্গিতেছে ও সিঁদুর মুছিতেছে, কৌলীন্য-প্রথার এই বিকট লীলাটা রাক্ষস দেহধারী সৌদাসের উপদ্রবকেও কি হার মানায় নাই? আশার কথা, অভিশপ্ত সৌদাস যেমন শেষে শাপমুক্ত হইয়াছিল, এই বাঙ্গালা দেশটাও ক্রমে এই নাগপাশটাকে ছিঁড়িয়া ফেলিতেছে। বিচার আবার আচারের কবল হইতে এই প্রথাটাকে কাড়িয়া লইতেছে।

তবে পৃথিবীর সকল আচারেই কি শেষে এতটা কালো রংয়ের পোঁচ পড়ে? নিশ্চয়ই নয়। কৌলীন্য-প্রথা এতটা বিকট মূর্ত্তি

ধরিয়াছে বলিয়া যে প্রথামাত্রেই শেষে উহার মত হইয়া দাঁড়ায়, অবশ্যই এ কথা বলা চলে না। কিন্তু বিচার ও যুক্তির সংস্পর্শ ছাড়িয়া বহুদিন একা থাকিলে, প্রথা যে ক্রমে বিগড়াইতে থাকে, এটা সত্য কথা।

(২)

কৌলীন্য-প্রথার মত সকল প্রথার এতটা অপব্যবহার না ঘটুক, কিন্তু অনেক প্রথারই শেষে সুযোগ্য ব্যবহার থাকে না। বিচার তাই আচারের হাত থেকে সেগুলো লইয়া একটু মাজা ঘষা করিতে চায়। দেশের যে অবস্থার মধ্যে একটা প্রথা দেখা দেয়, সে অবস্থা কি চিরদিন একই থাকে? চুরি ও ডাকাতির সময় শ্যামচাঁদের অর্থ রূপচাঁদের পেটরায় থাকুক, ভালই। কিন্তু তাহা বলিয়া যখন উপদ্রব চলিয়া যায়, তখন শ্যামচাঁদ তাহা নিজের হাতে লইয়া কেন নিজের কোন কাজে না লাগাইবে? রূপচাঁদের তাহা এমন করিয়া আটকাইয়া রাখা কেন?

আচ্ছা, এবার ধরা যাক বাঙ্গালার অবরোধ-প্রথা। ইহা নিশ্চিতই হিন্দুত্বের একটা বিশেষ বা সনাতন অঙ্গ নয়। যদি তাহা হইত, তবে সমগ্র হিন্দুর মধ্যেই ইহার প্রভাব দেখা যাইত। হিন্দুমান্দ্রাজ বা হিন্দুবোম্বায়ে এই প্রথার নিদর্শন খুব কমই মিলে। বাঙ্গালাতেই ইহার বিশেষ আঁটাআঁটি। মুসলমান-যুগের পূর্ব্বে এখানেও ইহার আধিপত্য এতটা ছিল না। ঠিক কোন সময়ে বা কোন কারণে ইহা প্রথমে দেখা দিয়াছিল, তাহার আলোচনা এখন নাই করিলাম। কিন্তু এই প্রথাটা যে বিশেষ প্রয়োজন হইতেই উদ্ভূত হইয়াছিল, ইহা যে অকারণে বাঙ্গালী রমণীকে ঘরের কোণে আটক করিয়া রাখে নাই, এটা বোধ

হয় সকলেই মানিবেন। একটা প্রবল অত্যাচারের হাত থেকে দুর্ব্বলের রক্ষার জন্যই ইহার সৃষ্টি, অনেকে এইরূপ বুঝেন। ফল কথা একটা সাময়িক অবস্থার বিচার হইতেই এই আচারের আবির্ভাব। কিন্তু এখন আবার সেই অবস্থার পরিবর্ত্তন ঘটায়, বিচার এই আচারটাকে একটু বদলাতেই চায়। আচার বিচারের এই কাজে বাধা দিতে ছাড়ে নাই, কিন্তু দুই এক পা করিয়া হঠিয়াছে। যাঁহারা এই প্রথাটাকে একটু বেশী মাত্রায় লঙ্ঘন করিয়াছেন, তাঁহাদের উপর রাগিয়াই উঠি, আর ঠাট্টাই করি কেহই আর এই প্রথাটিকে পূর্ব্বের মত কড়া করিয়া রাখিতে পারিতেছি না।

বিচারের তাড়নায় আচারের বাঁধন ক্রমে শ্লথ হইতেছে। অসূর্য্যম্পশ্যরূপারা ক্রমে দ্বিপ্রহরের রৌদ্রস্নাত রেলওয়ে-মঞ্চে গিয়া দেখা দিতেছেন। লোকের ভিড়ের মধ্যে দেড় হাত ঘোমটা দিয়া কি আর দোড়ধাপ করা চলে, কাজেই সেটারও বহর ক্রমে কমিয়া আসিল। অসূর্য্যম্পশ্যরূপার যুগটাকে এখন আর বাঁধিয়া রাখা অসম্ভব হইয়া উঠিতেছে। যেরূপ ব্যাপার, কালে এ শব্দটা দেখিতেছি শুধু বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সীতার বনবাসেই থাকিয়া যাইবে, বাঙ্গালীর গৃহবাসে উহা বড় আর লক্ষিত হইবে না।

তবেই দেখা যাইতেছে প্রধানতঃ দুই প্রকার স্থলে বিচার আচারকে লইয়া একটু বোঝা পড়া করিতে চায়। এক, যখন প্রথা-বিশেষের অপব্যবহার ঘটে, দ্বিতীয়, যখন দেশ-কাল-পাত্রের পরিবর্ত্তিত অবস্থার সঙ্গে সেটা খাপ্ খায় না। এই দুই রকমের দুইটি মাত্র প্রথার এখানে উল্লেখ করা গিয়াছে। সমগ্র মানব-সমাজ ও তাহার ইতিবৃত্ত খুঁজিলে বহু দৃষ্টান্ত মিলিবে। তবে এইরূপ প্রথাগুলি ঐ

দুইটা ভাগের ঠিক একটা ভাগে পড়িবেই, ইহা বলা চলে না। কারণ এই রকম একটা প্রথার দুই রকম বিশেষত্বই থাকিতে পারে, অশুভ ব্যবহার ও অযথা ব্যবহার একেরই এই দুইটী দিক থাকিতে পারে। সাধারণত এই প্রকারের সকল প্রথাতেই কিছু না কিছু এই দুইটী লক্ষণই দেখা যায়। তবে অনেক স্থলে একটী লক্ষণকে আর একটীর চেয়ে বড়ই প্রবল মনে হয়। এই লক্ষণের প্রাবল্য অনুসারেই এই প্রকার একটী মোটামুটি ভাগ করা চলে। ফল কথা, প্রথাবিশেষের অযোগ্য বা বেখাপ্পা ব্যবহারের মধ্যে কিছু না কিছু অশুভ ঘটে, আবার অশুভ ব্যবহারটা তো অযোগ্য বা বেখাপ্পা বটেই।

(৩)

যাক, এ সম্বন্ধে বিভাগটা সূক্ষ্ম না হউক, এইরূপ লক্ষণাক্রান্ত প্রথাগুলা লইয়াই যে বিচার ও আচারে লড়াই বাধে এবং সে লড়াই যে সহজে মিটে না, এটা ঠিক। সমগ্র মানব-সমাজ ধরিলে পৃথিবীর বক্ষে এই লড়াই যে বারমাসই চলিতেছে, এরূপ বলাটা নিতান্ত অত্যুক্তি নয়। কারণ আচারের অন্ত নাই, বিচারের বিরাম নাই। একটী বিশেষ দেশের একটা বিশেষ আচার লইয়া অবশ্যই অনেক সময় কোন রকম গোলযোগ নাও থাকিতে পারে। কারণ পূর্ব্বেই বলিয়াছি আচার ও বিচারের সম্পর্কটা একেবারে অহি-নকুলের সম্পর্কের মত নয়। প্রথমে দুয়ের মধ্যে একটী বিশেষ মাখামাখি থাকিবারই কথা—আর এইটীই হইল সামাজিক সুস্থতা বা আরামের অবস্থা। কিন্তু ছোট খাটো দেশসম্বন্ধে যাহাই হউক, সমগ্র পৃথিবীময় এই আরামটা কখন লক্ষিত হয় বলিয়া মনে হয় না।

যে ব্যাপারেই হউক আরামের অবস্থাটা যে বেশ সুখকর, এ সম্বন্ধে বড় দ্বিমত নাই। কিন্তু বিসম্বাদকে বর্জ্জন করিয়া কেবল আরামে কাল কাটানো বুঝি প্রকৃতির অভিপ্রায় নয়। বিশ্বপ্রকৃতিরও নয় মানবপ্রকৃতিরও নয়। অন্ততঃ দুয়ের ভাগ্যে একটানা আরামের ভোগ বিধাতা যেন লিখেন নাই। তাই বিশ্বের মাঝে একটা না একটা সংঘর্ষ লাগিয়াই আছে, মানব-সমাজেও এই সংঘর্ষের কখন অনাটন হয় না। বিশ্বের তুলনায় মানব-সমাজ অবশ্যই অতি ক্ষুদ্র। এই সঙ্কীর্ণ গণ্ডীর মধ্যে অনেক সময়েই আমরা একটা আরামের আশা করিতে পারি। কিন্তু তাহা বড় ঘটে না কেন? এখানে হিসাবে যে একটু ভুল হইতেছে। বিশ্বের কাছে মানব-সমাজ নিশ্চয় খুবই ছোট সমুদ্রের কাছে জলবিন্দু, কিন্তু তাহা হইলে কি হয়, এ কথাটা যে শুধু বাহিরের আয়তনেই খাটে। মানবের যে বাহির ছাড়া একটা অন্তর-আয়তন আছে। বিশ্বের সেটা আছে কিনা জানি না, অন্ততঃ তাহার খোঁজ আমরা বড় পাই নাই। মানবের বাহিরের চেয়ে এই অন্তরের আয়তনটা এত বেশী যে আমরা তাহার মাপজোখ কোন দিন করিতে পারিব কিনা সন্দেহ। আচার ও বিচারের সংঘর্ষটা মানবের এই অন্তর-রাজ্যের অন্তর্গত। তাই এই বিপুল মানসক্ষেত্রে ইহার বিরতির আশাটাও যেন সুদূরপরাহত।

এখন দ্রষ্টব্য বিচার বলিয়া এই জিনিসটা দেখা দেয় কোথায়? অবশ্যই এটা একটা দৈব বিড়ম্বনা নয়। বিচার ও আচারের ভাঙ্গা-গড়ায় দেবতারা কোন হাত লাগান না। আচার মানুষেই গড়ে, ভাঙ্গেও তাহা মানুষে। অনেক সময় পাঁচজনে পরামর্শ করিয়া গড়ে, আবার অনেক সময় একজনের মাথাতেই আসে, শেষে পাঁচজন

আসিয়া তাহার সহিত যোগ দেয়। গড়ার বেলা যেমন, ভাঙ্গার বেলায়ও তেমন। হয় একজন, নয় পাঁচজনে মিলিয়াই বিচারের হাতুড়ী তোলে। যাহারা হাতুড়ী তোলে, তাহারা বাস্তবিক হাতুড়ে লোক নয়। বুদ্ধ, খৃষ্ট, চৈতন্য, মহম্মদ ইহাঁদেরও হাতুড়ী ধরিতে হইয়াছে। নিজেদের হাপরে দেশের অনেক আচারকে ইহাঁরা ভাঙ্গিয়া পিটিয়া অন্য রকম করিয়া গড়িয়াছেন। ইহাঁদের অপেক্ষা কম নামজাদা লোকেরাও এ কাজে হাত দিয়াছেন। ক্ষমতার তুলনায় তাঁহারও তাঁহাদের সময়ের বড় কম গণ্য ব্যক্তি নহেন। নানক, কবীর, লুথার, নক্স—ইহাদেরও নাম পৃথিবীর ইতিহাসে গৌরবের স্থান পাইয়াছে। ধরণীর বক্ষে বর্ত্তমানেও এইরূপ লোকের অসদ্ভাব নাই। ইহাঁদেরও ললাটে প্রতিভার জ্যোতি দেদীপ্যমান। চারি পাশের আবরণ সেটাকে যতই ঠেলিয়া রাখিতে চেষ্টা করুক, তাহার প্রসার ক্রমেই বাড়িতেছে বৈ কমিতেছে না।

(৪)

আচার জিনিসটা কি নিতান্তই ভূতের বোঝা, ওটাকে যে কোন রকমে সমাজের ঘাড় হইতে নামনই কি উন্নতির একমাত্র নিদর্শন? উহা কি কেবলই জগদ্দল-পাথরের মত মানুষকে নীচের দিকে টানিয়া রাখে, উাহার হাত হইতে নিষ্কৃতি পাইলেই কি মানুষ অমনি হাউয়ের মত উপরের দিকে ছুটিয়া যায়? এমন একটা অসম্ভব ধারণা কাহারও আছে কি না জানি না, আচারকে এতটা অমঙ্গল মনে করিবার কোন কারণই নাই। আচার আষাঢ়ে গল্পের ভুঁইফোড় রাক্ষসের মত আকাশ

পাতাল হাঁ করিয়া সহসা নিজের বিকট মূর্ত্তি বাহির করে না, উহা বাস্তবিকই বিচারের পবিত্র যজ্ঞকুণ্ড হইতেই উদ্ভূত হয়। এমন পবিত্র আকারে যাহার জন্ম তাহাতে মানুষের কোন হিত সাধিত হয় না, এ কথা বলিলে মানিবে কে?

বাস্তবিক যজ্ঞকুণ্ড হইতে উদ্ভূত মহাবীরের মতই আচারের কর্ম্মশক্তি অপরাজেয়। লক্ষ্যে বা অলক্ষ্যে বিচার যতদিন এই সত্যকে নিয়মিত রাখে, ততদিন তাহা দ্বারা মানুষের কি পরিমাণ মঙ্গল সাধিত হয় তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। আচারকে বাদ দিয়া যদি শুধু বিচারের দ্বারাই সমাজের কাজগুলা চালান হইত, তবে কার্য্যের ক্ষেত্র কখন তেমন ব্যাপক হইত না, কাজও তেমন জোরে চলিত না। সেক্সপীয়রের হ্যামলেটের মত বিচার প্রতি পদে এতটা যুক্তি ও তর্কের ওলট-পালট করিত যে তাহার কাজের অবসর কমই মিলিত। তাহা ছাড়া বুদ্ধি-বৃত্তির উপর সকল মানুষের তো সমান দখল নাই। তাই মনে হয় শুধু বিচারের হাতে কাজের ভার থাকিলে, কাজটা বড়ই ঢিমে চলে, এমন কি অনেক স্থলে একেবারে হয়তো চলেই না।

পৃথিবীর কোন জায়গায়ই আজও এমনটা ঘটে নাই। আচার ও বিচার চিরদিন সর্ব্বত্র পাশাপাশি আছে। কখন দুইয়ে মিলিয়া একসঙ্গে মানবের উন্নতির পথ সাফ করে, আবার কখন বা দুজনে হাতাহাতি ধাক্কাধাক্কি করিতে করিতেই মানবসমাজকে ঠেলিয়া ক্রমে উচ্চের দিকে লইয়া যায় যদি বা কখন এই ঠেলাঠেলির মধ্যে সমাজটা একটু হাঁটু পাড়িয়া বসিয়া পড়ে, সে অধঃপতন, সাময়িক। তাহাকে আবার উঠিতেই হয় এবং যতদিন না একটু সাম্যের অবস্থা আসে, ততদিন ধাক্কা খাইতে খাইতেই চলিতে হয়। এইরূপ বিপরীত ধাক্কার মধ্যে উন্নতির

গতি কখনই দ্রুত হইতে পারে না, কিন্তু তাহা বলিয়া নিয়তি যে মানব-সমাজের ললাটে কখনো একটা দুরপনেয় চিরস্থবিরত্বের রেখা টানিয়া বসে, এ বিশ্বাস করা চলে না।

তবেই বুঝিতেছি, মানব-সমাজে বিচার ও আচার দুয়েরই প্রয়োজন। একটা অথবা অন্যটাকে ধরিলেই আমাদের চলে না। যাঁহারা আচারের বিরুদ্ধে দাঁড়াইয়াছেন, তাঁহারা আচারের পাট একেবারে লোপাট করিয়া কেবলমাত্র বিচারকেই প্রতিষ্ঠিত করিতে পারেন নাই। সমাজের পরিচালনায় বিচার রাজা, আচার তাহার কার্যাধ্যক্ষ। যেখানে আচার বিচারকে সিংহাসন হইতে বিচ্যুত করিয়া নিজেই সর্ব্বেসর্ব্বা হইয়া উঠিয়াছে কিংবা ঐরূপ হইতে চেষ্টা পাইয়াছে বিচারপক্ষীয়েরা সে স্থলে বিচারকে আবার রাজপদে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন মাত্র, কার্য্যাধ্যক্ষের পদটাকে একেবারে উঠাইয়া দেন নাই। তাঁহারা কখনও বা বিদ্রোহী কার্য্যাধ্যক্ষের স্থানে অনুরক্ত কার্য্যাধ্যক্ষ নিয়োগ করিয়া, আবার কখন বা পূর্ব্বের কার্য্যাধ্যক্ষটিকে শাসনে ও সদুপদেশে প্রকৃতিস্থ করিয়া সমাজের পরিচালনায় সুশৃঙ্খলার ব্যবস্থা করিয়াছেন। আচারের কার্য্য-শক্তির বিলোপ করা কাহারও অভিপ্রেত নয়, সেই শক্তিকে বিচারের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত রাখাই বিচারপক্ষীয়ের উদ্দেশ্য। যখন কোন আচার সর্ব্বগ্রাসী হইয়া দাঁড়ায়, তখন এ উদ্দেশ্য সাধন করা বড় সহজ নয়। একটা বিষম সংঘর্ষের সম্ভাবনা তখন আছেই।

বর্ত্তমানে ঐ সম্ভাবনাটা সত্যে দাঁড়াইয়াছে। পৃথিবী ব্যাপিয়া বলিলেই হয়, এখন এই বিচার ও আচারের একটা মহা সংঘর্ষ চলিতেছে। আমাদের দেশটা পৃথিবী ছাড়া নহে, এখানেও যে সেই সংঘর্ষ দেখা দিয়াছে, ইহা স্বাভাবিক। পরিণামে ন্যায়েরই জয়, এ আশা

মানুষ চিরকালই করে, দেবতাও সে আশা ভঙ্গ করেন না। সংঘর্ষ যদি অনিবার্য্যই হয়, তবে তাহা চলুক, কিন্তু ইহাতে বিদ্বেষটা যেন বেশী জাগিয়া না উঠে, উভয়পক্ষ এ বিষয়ে একটু দৃষ্টি রাখিলে সমাজের মঙ্গল বৈ অমঙ্গল নাই।

শ্রীদয়াল চন্দ্র ঘোষ।

শরৎ।

---*---

মেঘেরা গিয়েছে ভেসে দূর দ্বীপান্তর
অবাধে পড়িছে ঝরে আলোক রবির।
আকাশ জুড়িয়া ওড়ে সোণার আবির
ধরেছে সোণালি রঙ সবুজ প্রান্তর॥

ক্ষীণপ্রাণ সুকুমার সলজ্জ মন্থর
বাতাস বহিয়া আনে স্পর্শ করবীর।
সোণার স্বপন আজ প্রকৃতি কবির
এসেছে বাহিরে তার ত্যজিয়া অন্তর॥

শরতের এ দিনের সুবর্ণের মায়া।
না ঘুচায় অন্তরের চিরস্থির ছায়া॥

আলোর সোণার পাতে মোড়া নভদেশ
ফুটিয়ে দেখায় তার অনন্ত নীলিমা।
এ বিশ্বের রহস্যের নিবিড় কালিমা;
রঞ্জিয়াছে প্রকৃতির ওই ঘন কেশ॥

শ্রীপ্রমথ চৌধুরী।

কংগ্রেসের দলাদলি।

—————*—————

সম্প্রতি বাংলায় কংগ্রেসের দল যে দু'টুকরো হয়ে পড়েছে, তাতে আশ্চর্য্য হবার কিছু নেই। আমাদের দেশে যাত্রার দল বেশী দিন গোটা থাকে না, একদিন-না-একদিন তার ভিতর থেকে একটা-না-একটা ভাঙ্গা দল বেরিয়ে পড়েই পড়ে।

——————

আমি যখন ছোট ছেলে, তখন বাংলাদেশে একটি জবর যাত্রার দল ছিল, তার নাম বৌ-মাষ্টারের দল। সেই দল ভেঙ্গে যখন দু'দল হল, তখন উভয় দলই নিজেদের বৌ-মাষ্টারের দল বলে পরিচয় দিতে আরম্ভ করলেন। দেশের লোক,—কোন পক্ষের দাবী ঠিক, তা ঠিক করতে না পেরে,—এই নামের মামলার একটা দু-পক্ষের-মনরাখা-গোছের মীমাংসা করে দিলে। যে দলে জুড়ি বেশী আর ছোকরা কম, তার নাম দিলে বৌ-মাষ্টারের দল,—আর যে দলে ছোকরা বেশী আর জুড়ি কম, সে দলের নাম রাখলে বৌ-মাষ্টারের ভাঙ্গা দল

——————

আজকের দিনে, কলিকাতা সহরে, যখন কংগ্রেসের উভয় দলই নিজেদের অভ্যর্থনা-সমিতি বলে পরিচয় দিতে আরম্ভ করেছেন, তখন আমার মতে এ দুয়ের ভিতর যে দলে জুড়ি বেশী ছোকরা কম, সে

গীতি-কবিতা।

——ঃ*ঃ——

যখন রেলওয়ে হয়নি, টেলিগ্রাফ হয়নি, খাওয়া পরার সংগ্রাম আজকার মতো এমন কঠিন হয়ে ওঠে নি, তখন মানুষের দিনটে আর মনটা ভরে থাকত অনেকখানি অবসর দিয়ে—আর সেইটে ছিল মহা-কাব্যের যুগ। কোন গোলমাল নেই—দিব্যি নির্ব্বিঘ্নে নিশ্চিন্ত হয়ে লিখে যাও—সর্গের পর সর্গ, পর্ব্বের পর পর্ব্ব—ছাপাখানার তাগিদ্ নেই, পাঠকের "দেহি দেহি" রব নেই—শুধু লিখে যাও, যতদিন খুসি—দশ বছর, বিশ বছর পঁচিশ বছর ধরে লিখে যাও—শুধু লিখবারই আনন্দে রে। কিন্তু আজকাল যখন আমাদের খাওয়া পরা জোগাড় করতেই চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে কুড়ি ঘণ্টা কেটে যায়—যখন জগতটা এমনি বেগে চলেছে যে, সেই চলার মাঝে কারও এমন সাধ্য নেই যে দু' দণ্ড স্থির হয়ে বসে থাকে—তা ছাড়া যখন ছাপাখানার উদর পূরণ কর্‌তে হবে—পাঠকদের মাসিক বরাদ্দটা মিটিয়ে দিতে হবে—তখন গীতি-কবিতাই হচ্ছে প্রশস্ত। কঠোর জীবন-সংগ্রামের মাঝে কোন রকমে একটু সময় করে নিয়ে গোটাকয় লাইনে ছন্দ তাল মান লাগিয়ে একটা কিছু লিখে ফেল—নইলে উপায় নেই—পরমুহূর্ত্তে কিসের ধাক্কায় যে কোথায় গিয়ে পড়বে তার ঠিক নেই। রাস্তায় চল্‌তে চল্‌তেই হয়ত গুন্ গুন্ করে একটা কিছু রচনা করে ফেল্‌লে—নইলে উপায় নেই—এমনিই কাল। তাই এইটে হচ্ছে গীতি-কবিতার যুগ।

কিন্তু তাই বলে যে মহাকাব্যের যুগে কেউ গীতি-কবিতা লিখলে সৃষ্টিটা ধ্বংস হয়ে যাবে কিম্বা গীতি-কবিতার যুগে মহাকাব্য লিখলে তাকে পিনাল কোডের ধারায় পড়তে হবে এমন কোনো কথা নেই।

কিন্তু ওটা গেল বাহিরের কথা। আর এটা বোধ হয় সবাই মানবেন যে মানুষের বাহিরটা দিয়ে তার ভিতরটা গড়ে ওঠে না—তার ভিতরটা দিয়েই তার বাহিরটা নিয়ন্ত্রিত হয়। তাই এর একটা ভিতরের কারণও আছে—যে কারণটাই হচ্ছে আসল কারণ। সে কারণটা হচ্ছে এই যে, মহাকাব্য লিখতে হলে লেখকের যে মানস-জগত চাই—যে mentality দরকার, মানুষ সেই মানস-জগত থেকে সরে পড়েছে—সেই mentality-টা সে হারিয়ে ফেলেছে।

মহাকাব্য লিখতে হলে যে-সব উপাদান দরকার সে-সব উপাদান আর মানুষের মনে প্রাণে অন্তরে মিল্‌ছে না। সেই বীরত্ব শূরত্ব শৌর্য্য বীর্য্য সেই classical heroism আর মানুষের প্রাণে নেই। বল্‌ছি না যে আজকার মানুষ ভীরু বা কাপুরুষ কিম্বা মরতে ভয় পায়। না, তবে যখন যুদ্ধটা চলে বুদ্ধি আর বিজ্ঞান দিয়ে—যেখানে দু' মাইল দূর থেকে একটা বোতাম টিপে দিলেম আর কামানটা ফায়ার হয়ে গেল, সেখানে সিংহবিক্রমের ততটা প্রয়োজন নেই যতটা আছে ঠাণ্ডা মাথার। আজকার মানুষও যে সাহসী সে সম্বন্ধে কোন ভুল নেই। কিন্তু তার সাহসটা কল-কব্জা দিয়ে এমনি করে নিয়মিত যে, সে-সাহস বুদ্ধির কোঠায় পড়ে একেবারে বেকার বসে আছে, তার প্রাণ অধিকার করে আর তার বীরমূর্ত্তি ফুটিয়ে তুলতে পারছে না। আর যেটা প্রাণ দিয়ে অনুভব করা না যায় সেটা কলমের আগা দিয়েও বেরোয় না। যদি বা বেরোয় তবে সেটা মুখের কথা হয়েই

বেরোয়। আর মুখের কথার স্থান কাব্যে ত নেইই—আর যেখানেই থাক। মুখের কথায় চিড়ে যদি বা ভেজে—মানুষের মন ভেজে না কিছুতেই। আর ঐ শূরত্ব বীরত্ব heroism ছাড়া মহাকাব্য ভাল জমে না—এটা বোধ হয় সর্ব্ববাদীসম্মত। তাই মহাকাব্যের যুগ আর নেই।

এই ডেমোক্রেসির যুগে মানুষের মনের মধ্যে আর আভিজাত্যের পরিচয় পাওয়া যাচ্ছে না। যখন মেটারলিঙ্ক পড়ি তখন দেখি সেখানে রাজার কথায় আর রাজ-ভৃত্যের কথায় বড় বিশেষ তফাৎ নেই। ডেমোক্রেসির আবহাওয়াতে রাজাও আর রাজা নেই, রাজভৃত্যও আর রাজভৃত্য নেই। সেই আবহাওয়াতে বাস করে' লেখকের মন থেকেও রাজা আর রাজভৃত্যের ভেদ প্রায় অদৃশ্য হয়ে গেছে। লেখকের মনেপ্রাণে যেটা নেই তার লেখায় সেটা জীবন্ত হয়ে বেরিয়ে আসতে পারে না কিছুতেই—কারণ মানুষ মুখে যে কথাই বলুক না কেন তার আসল তাৎপর্য্য হচ্ছে তার অনুভবের ভিতরে। আর মহাকাব্য হচ্ছে প্রধানত হয় দেবরাজ্যের নয় আভিজাত্যের গান। শৌর্য্য বীর্য্য বীরত্ব ধীরত্ব গম্ভীরত্ব—সব বিষয়ে, ফরাসীতে যাকে বলে grandeur তাই সেখানে জীবন্ত করে ফুটিয়ে তোলা চাই। নইলে মহাকাব্যের মহাকাব্যত্বই নষ্ট। তাই দায়ে পড়েই মহাকাব্যের যুগ চলে গেছে।

কিন্তু ওটা গেল অভাবের দিক—যে জন্যে মহাকাব্য আর লেখা হচ্ছে না তার negative side। উপরন্তু মানুষের একটা ভাবের দিক —positive side আছে যার গুণে গীতি-কবিতা লেখা চলছে। সেটা হচ্ছে এই যে মানুষ বুঝেছে যে তার ভিতরটা তার বাহিরটা থেকে বড়। সে আজ বাহিরের ঘটনাবলীকে দেখতে ততটা ভাল-

বাসে না যতটা ভালবাসে তার অন্তরের লীলা দেখতে। তাই আজকার কবির আর ভার্জিনের মতো Arma virumque cano—I sing of arms and heroes বলে সন্তোষ নেই—সে আজ চায়—

যে গান কানে যায় না শোনা
সে গান যেথায় নিত্য বাজে
প্রাণের বীণা নিয়ে যাব
সেই অতলের সভামাঝে—

সে আজ চায় অন্তরের এক একটী সুর ধরে, এক একটী অনুভব ধরে তারি মূর্ত্তি ছন্দে অর্থে তালে ফুটিয়ে তুল্‌তে। আর সে জন্যে গীতি-কবিতাই প্রশস্ত। তাই এটা হচ্ছে গীতি-কবিতার যুগ।

(২)

গীতি-কবিতা বলি সেইটেকে যেটার স্বরূপ হচ্ছে কিছুটা কবিতা আর বাকিটা গীত। গীতি-কবিতার উৎকৃষ্টতা নির্ভর করবে এর ওপরে যে সে কবিতার অর্থ কতখানি তার কথা গুলোকে ছাড়িয়ে ছাপিয়ে উঠেছে—ঠিক গানের মত। কারণ গীতি-কবিতার প্রাণ যেটা সেটা তার কথার অর্থের মধ্যে ততটা নেই যতটা আছে তার ভাবের সঙ্গীতের মধ্যে। ভাবের সঙ্গীত বলছি এই জন্যে যে, সঙ্গীত জিনিসটার মধ্যে কি শেষে কোন দাঁড়ি টানা নেই—অর্থাৎ গান জিনিসটার আরম্ভ থাক্‌লেও এর শেষের দিকটায় একটা dash একেবারে ad infinitum পর্য্যন্ত টানা। আর এই জন্যেই বোধ হয় উঁচুদরের গীতি-কবিতা অনেকের কাছে অস্পষ্ট বলে' মনে হয় এবং অনেকে

তা বস্তুতন্ত্রহীন মনে করেন কারণ ও জিনিসটাই এম্‌নি যে ওর মানে কোন খানেই শেষ হয় না। যে গীতি-কবিতাটা তার কথার সঙ্গে সঙ্গে ভাবেরও দাঁড়ি টেনে বসেছে সেটা অর্থ হিসেবে যতই স্পষ্ট হোক্ না কেন গীতি-কবিতা হিসেবে তার মান খর্ব্বই হবে। কারণ গীতি-কাবতার প্রাণই হচ্ছে ভাবের সঙ্গীত। আর সঙ্গীত জিনিসটার শেষের দিকে দাঁড়ি টানা নেই। এই কথাটা আরও একটু বিশদ করে' বলবার চেষ্টা করব।

যখন বইটা খুলে' চোখ দুটো বুলিয়ে যাই
তোরা শুনিস্ নি কি শুনিস্ নি তার পায়ের ধ্বনি
ঐ যে আসে আসে আসে!
যুগে যুগে পলে পলে দিন রজনী
সে যে আসে আসে আসে।

তখন বেশ বুঝ্‌তে পারি যে ঐ চার লাইনের মধ্যে সব চাইতে যা উপভোগ করছি সেটা হচ্ছে তার না—আসাটা। "সে যে আসে আসে আসে"র সঙ্গে সঙ্গে তার আসাটা বাস্তবিক শেষ হ'য়ে যায় নি এই হচ্ছে পাঠকের সবার চাইতে আরামের খবর। ঐ যে "আসে আসে আসে"র পরে ছাপায় দাঁড়ি থাক্‌লেও তাতে মনের পাতায় কোন দাঁড়ি পরে না সেইটেই হচ্ছে পাঠকের সবার চাইতে বড় লাভ—আর সেইটে হচ্ছে এর প্রাণ। "যুগে যুগে পলে পলে দিন রজনী সে যে আসে আসে আসে"; কত দীর্ঘ যে সে রাস্তা—সে যে কতদূরে—কোন দিগন্তের কোন পার থেকে যে সে আস্‌ছে—কোন্ অনন্তের ভিতর দিয়ে যে সে হেঁটে চলেছে—যে তাতে মনটাও একেবারে অনন্তের পথে উধাও হয়ে যায়—আর এইটেই হচ্ছে পাঠকের সবার চাইতে বড় লাভ।

কিন্তু "যুগে যুগে পলে পলে দিন রজনী" যে চলে' আস্‌ছে সে যদি হঠাৎ একদিন গোঁফে চাঁড়া দিয়ে এসে কবির সম্মুখে দাঁড়িয়ে যেত তবে সেটা আর গীতি-কবিতা থাক্‌ত না, সেটা হ'য়ে পড়্‌ত রয়টারের তারের খবর—একেবারে চাক্ষুষ, জাজ্জ্বল্যমান, নিরেট অর্থযুক্ত,—আর তারপর যদি সে পকেট থেকে একটা চুরুট বের করে' সেটা খেতে খেতে চাষ আবাদের খবর জিজ্ঞেস কর্‌ত তবে ত কথাই নেই—সেটা যে হ'ত ভীষণ ভাবে বস্তুতান্ত্রিক তাতে সন্দেহ নেই—কিন্তু গীতি-কবিতার তাতে লাভের চাইতে ক্ষতি হ'ত অনেক বেশী ; কিন্তু তার চাইতেও বেশী ক্ষতি হ'ত পাঠকদের। কেন ?—সেটা বল্‌ছি।

মানুষের অন্তরে দুটো সুরের তার রয়েছে। তার একটাতে বাজে সান্তের সুর আর একটাতে গুপ্ত হয়ে রয়েছে অনন্তের সুর। আমরা কিন্তু আমাদের দৈনন্দিন জীবনে এর মধ্যে ঐ সান্ত সুরটাই নিশিদিন বাজিয়ে চলেছি। কিন্তু তবুও মাঝে মাঝে কারণে অকারণে সময়ে অসময়ে ঐ অনন্তের সুরটাও কারও কারও অন্তরে এক একবার করে' ঝঙ্কার দিয়ে ওঠে। আর ঐ অনন্তের সুরটা মানুষের অন্তরে মাঝে মাঝে ঝঙ্কার দিয়ে এসেছে বলে' মানুষ আজকার যা তাই। নইলে সেই আদিম কালের অন্ধকার যুগে তীর ধনুক দিয়ে বন্য পশু শীকার কর্‌তে কর্‌তে তার হাতে কড়া পড়ে' যেত কিন্তু তার মনের গায়ে কোন দাগ প'ড়বারই অবসর পেত না।

কেবল তাই নয়। এই অনন্তের সুর মাঝে মাঝে আমাদের মধ্যে ঝঙ্কার দিয়ে ওঠে বলে আমরা সাহস করে ভাবতে পারি যে বাস্তবিক আমরা তেমন বদ্ধজীব নই—আমাদের একটা মুক্তির দিকও আছে। এই যে রক্তমাংসের শরীর তা যতই নিরেট হোক না কেন, যতই

চাক্ষুষ, যতই জাজ্বল্যমান, যতই শক্ত হোক না কেন, আমরা তার মধ্যেই শেষ হয়ে যাই নি। আমাদেরও একটা দিক আছে যে দিকটায় দিগন্তের বাতাস বয়ে যায়—অনন্তের আলো ছেয়ে যায়। এই দিকটা মানুষের অনন্ত আশার অফুরন্ত আকাঙ্ক্ষার দিক। আর তার এই অফুরন্ত আশা আকাঙ্ক্ষার দিকটা আছে বলে হাজার হাজার যুগ কাটিয়ে এসেও মানুষের বাঁচা, আজও শেষ হয়ে যায় নি—অর্থশূন্য হয়ে যায় নি। আজও তার কত ভাববার কত করবার আছে। যেদিন মানুষ তার এই অনন্তের দিকের গোড়ায় এসে পৌঁছিবে—সেদিন থেকে তার বাঁচাটা হবে ঝক্‌মারি পূর্ব্ব-জীবনের জাবর কাটা—সেদিন আসবে মহাপ্রলয়—সেদিন সব মুছে ফেলে আবার মানুষকে সেই গোড়া থেকে সুরু কর্‌তে হবে।

এই যে অনন্তের দিক, মুক্তির দিক—এইটে হচ্ছে মানুষের বৃহত্তর আনন্দের দিক। এই বৃহত্তর আনন্দের দিকটা যার জীবনে যত বেশী প্রকাশ পেয়েছে মানবজন্ম তার তত বেশী সার্থক হয়েছে। কারণ "মানব" নামক যে সম্পাদ্য প্রতিজ্ঞাটী তার সাধারণ সূত্র হচ্ছে—

সীমার মাঝে অসীম তুমি
বাজাও আপন সুর।

আর তার স্বীকার্য্য (postulate) হচ্ছে—"রূপ-সাগরে ডুব দিয়েছি অরূপ-রতন আশা করি।"

বলেছি আমাদের দৈনন্দিন জীবনে আমরা সান্ত সুরটাই বাজিয়ে ত চলেছি। কিন্তু আমাদের মধ্যে এমন অনেকে আছেন—যাঁদের মধ্যে —পূর্ব্বজন্মের সুকৃতির জন্যেই হোক বা অন্য যে কোন কারণেই হোক্—ঐ অনন্তের সুরটা অকারণেই বেজে ওঠে। আর এই সব লোকই

মানব সমাজে অন্যান্য লোক থেকে অসাধারণ হ'য়ে ওঠে! কেউ বা কবি, কেউ বা চিত্রকর, কেউ বা গায়ক কেউ বা আর একটা কিছু। কিন্তু আমরাও আমাদের অন্তরে মাঝে মাঝে ঐ অনন্তের ঝঙ্কার না শুন্‌লে প্রাণে বাঁচি নে। ঐ বৃহত্তর আনন্দের দিকটার মাঝে মাঝে গন্ধ না পেলে আমাদের অস্তিত্বটাকে সম্পূর্ণ করে' পাই নে—ঐ বৃহত্তর আনন্দের দিকটার হাওয়া মাঝে মাঝে প্রাণে না লাগ্‌লে আমাদের জীবনটা হয়ে ওঠে একঘেয়ে—দুর্ব্বিসহ। তাই কবিকে ডেকে বলি—হে কবি এমন কিছু লেখো যার ছন্দে অর্থে ঝঙ্কারে আমারও অন্তরে অনন্তের তারটি ঝঙ্কার দিয়ে উঠ্‌বে। চিত্রকরকে ডেকে বলি—হে চিত্রকর এমন কিছু আঁকো যার রেখায় বর্ণে সৌন্দর্য্যে আমার অন্তরে যে অনন্তের ছবিখানি আছে তা মূর্ত্তি পাবে। গায়ককে বলি—হে গায়ক এমন কিছু গাও যার সুরে সুরে আমার হৃদয়ের অনন্তের সুরটাও পরতে পরতে খুলে যাবে। এই যে কবি চিত্রকর গায়ক প্রভৃতি—এঁরা মানুষকে তাদের এই সবার চাইতে অনির্ব্বচনীয় জিনিসটি পাইয়ে দেন বলে' লোকের কাছে তাঁদের এত সম্মান—সমাজ তাঁদের এমন ভক্তি শ্রদ্ধা করে। আমরা গীতি-কবিতার কাছথেকে ঐ অনির্ব্বচনীয় জিনিসটাই পাবার আকাঙ্খা করে' বসে' থাকি। যেন তার ছন্দ অর্থ সুর আমাদের কানের ভিতর দিয়ে মরমে পশে' সেখানে এমন একটা জগতের সৃষ্টি করে যে—জগতে আমি আমাকে পাই বৃহত্তর করে' মুক্ততর করে'—যেখান থেকে ভূমার দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করতে কোন রকম লজ্জা পাই নে। আর সেই জন্যেই বলছি যে গীতি-কবিতা যদি তার পাঠককে ঐ জিনিসটি পাইয়ে না দেয় তবে গীতি-কবিতার যত ক্ষতি হোক্ না হোক্ তার চাইতে বেশী ক্ষতি পাঠকদের। আর

গীতি-কবিতা পাঠককে ঐ জিনিসটী পাইয়ে দিতে পারে না—যদি না তার অর্থ তার কথাগুলোকে ছাড়িয়ে ছাপিয়ে যায়—যদি না তার শেষের দিকে একটা ভাবের dash একেবারে ad infinitum পর্য্যন্ত টানা থাকে।

অন্ততপক্ষে গীতি-কবিতার যে ক্ষুদ্র দেহ—সেই ক্ষুদ্র দেহের মধ্যে একটা বৃহৎ হৃদয়ের—একটা গভীর হৃদয়ের পরিচয় থাকা চাই—যে হৃদয়ের সংস্পর্শে এসে পাঠক তার আপনার হৃদয়টারও বৃহত্ব গভীরত্ব টের পেয়ে যায়—নইলে গীতি-কবিতার অনেকখানিই ব্যর্থ।

ঠিক হোক্ বেঠিক হোক্ গীতি-কবিতা সম্বন্ধে এই কথাগুলোই মনে আস্‌ছে।

শ্রীসুরেশ চন্দ্র চক্রবর্ত্তী।

———

সনেট্।
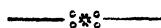
কি ভাবিছ বসি পান্থ জীবন বেলায়
মুখে হাসি চোখে জল দৃষ্টি কত দূরে ?
সম্মুখে বিস্তৃত সিন্ধু, আশা নিরাশায়
সহস্র ঊর্ম্মির খেলা ; আহ্বানের সুরে

কে সদা ইঙ্গিত করে নামিতে খেলায়
মথিয়া লহরীমালা দিতে সন্তরণ,—
কোথায় দেখেছ কারে ? কিসের আশায়
সংহত করেছ তব হৃদয় স্পন্দন ?

যাও যাও নামি যাও অজানার পানে
জীবন কৃতার্থ হবে উদ্যমে প্রয়াসে
ব্যর্থতাও তৃপ্ত হবে জীবনের গানে
শ্রান্ত হিয়া শান্তি পাবে নিবৃত্তি-নিবাসে ;—
আজি যদি রুদ্ধ কর অমৃতেরে ধরি'
জীবন উঠিবে শুধু হাহাকারে ভরি'।

শ্রীসুরেশ চন্দ্র চক্রবর্ত্তী।

অগ্রহায়ণ, ১৩২৪

সবুজ পত্র

সম্পাদক

শ্রীপ্রমথ চৌধুরী

বার্ষিক মূল্য দুই টাকা ছয় আনা।
সবুজ পত্র কার্য্যালয়, ৩ নং হেষ্টিংস্ ষ্ট্রীট,
কলিকাতা।

৫৮

কলিকাতা।
৩ নং হেষ্টিংস্ ষ্ট্রীট।
শ্রীপ্রমথ চৌধুরী এম্, এ, বার-য়্যাট্-ল কর্ত্তৃক
প্রকাশিত।

কলিকাতা।
উইক্লী নোট্স প্রিন্টিং ওয়ার্কস্,
৩ নং হেষ্টিংস্ ষ্ট্রীট।
শ্রীসারদা প্রসাদ দাস দ্বারা মুদ্রিত।

বাংলার ভবিষ্যৎ।

(মির্জ্জাপুর ফিনিক্স ইউনিয়ন লাইব্রেরিতে পঠিত)

বঙ্কিমচন্দ্র যখন প্রথম বঙ্গদর্শন প্রকাশ করেন, তখন তিনি বাঙ্গালীর পক্ষে বাংলা লেখার ঔচিত্য এবং সার্থকতা সম্বন্ধে একটি দীর্ঘ বক্তৃতা করতে বাধ্য হন। বঙ্গদর্শনের "পত্রসূচনা" বঙ্গসরস্বতীর তরফ থেকে একাধারে আরজি, জবাব ও সওয়াল-জবাব। বাংলা লেখার জন্য, বাঙ্গালীর পক্ষে স্বদেশীশিক্ষিত সমাজের নিকট কোন-রূপ কৈফিয়ৎ দেওয়ার প্রয়োজন যে একদিন ছিল, এ ব্যাপার আজকের দিনে আমাদের কাছে বড়ই অদ্ভুত ঠেকে।
—"যতদিন না শিক্ষিত জ্ঞানবন্ত বাঙ্গালীরা বাংলা ভাষায় আপন উক্তিসকল বিন্যস্ত করিবেন, ততদিন বাঙ্গালীর উন্নতির কোনও সম্ভাবনা নাই"—

বঙ্কিমের এ উক্তির সত্যতা যে যুক্তিতর্কের অপেক্ষা রাখে, এ আমাদের ধারণার বহির্ভূত, কেননা এ সত্য আমাদের কাছে স্বতঃসিদ্ধ হয়ে না উঠলেও স্বীকার্য্য হয়েছে; কিন্তু বঙ্কিম যে সময়ে লেখনী ধারণ করেন, সে সময়ে এ সত্যকে মেনে নেওয়া দূরে থাক, কেউ ধরে নিতেও প্রস্তুত ছিলেন না। সে যুগে ছিল ইংরাজির রেওয়াজ এবং ইংরাজিরই প্রতিপত্তি। সেকালের শিক্ষিত সম্প্রদায়—অর্থাৎ ইংরাজি-শিক্ষিত সম্প্রদায়, ইংরাজি পড়তেন, ইংরাজি লিখতেন, ইংরাজি ছাড়া আর কিছু লিখতেনও না পড়তেনও না, এবং সম্ভবত কথাবার্ত্তাও

কইতেন ঐ রাজভাষাতেই। নতুবা বঙ্কিমের এ কথা বলবার কোনও আবশ্যকতা ছিল না যে,—

"ইংরাজি-লেখক, ইংরাজি-বাচক সম্প্রদায় হইতে নকল ইংরাজ ভিন্ন কখন খাঁটি বাঙ্গালীর সমুদ্ভাবের সম্ভাবনা নাই।"

(২)

এ খুব বেশী দিনের কথা নয়। বঙ্কিমচন্দ্রের এ লেখার তারিখ হচ্ছে পয়লা বৈশাখ, ১২৭৯ সাল। জাতীয় জীবনের হিসাবে, পঁয়তাল্লিশ বৎসর অতি স্বল্পকাল, কিন্তু এই স্বল্পকালের মধ্যেই বাংলার শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মনে মাতৃভাষা সম্বন্ধে একটা বিশেষ ভাবান্তর ঘটেছে, বাংলা ভাষার প্রতি অভক্তি স্পষ্টত অতিভক্তিতে পরিণত হয়েছে। আমাদের মধ্যে বাংলা লেখার প্রবৃত্তি বর্তমানে যে কতটা অদম্য হয়ে উঠেছে, তার পরিচয় আমাদের মাসিক সাহিত্যেই পাওয়া যায়। যে দেশে পঁয়তাল্লিশ বৎসর পূর্ব্বে, একখানি মাসিক পত্র বার করতে হলে বঙ্কিমচন্দ্রের ন্যায় অসাধারণ লেখকেরও জবাবদিহি ছিল, সেই দেশে আজকের দিনে নিত্য নূতন মাসিক পত্রের জন্ম ও মৃত্যু হচ্ছে, অথচ তার জন্য আমাদের সাধারণ লেখকদেরও কারও কাছে কোনরূপ কৈফিয়ৎ দিতে হয় না। এই কলিকাতা সহর থেকে মাসে মাসে কত কাগজের যে আবির্ভাব ও তিরোভাব হয়, তারই সংখ্যা নির্ণয় করা অসাধ্য, কেননা এ ক্ষেত্রে জন্মমৃত্যুর কোনও সঠিক রেজিষ্টারি রাখা হয় না। যদিচ এখন কাগজের আকাল পড়েছে—তথাপি বাজারে নূতন কাগজের কোনও

অভাব নেই। তারপর বাংলার পূর্ব্ব পশ্চিম উত্তর দক্ষিণের নানা নগরী ও উপনগরী থেকে, নানা আকারের নানা বর্ণের নানা পত্র পরস্পর রেষারেষি করে' শূন্যমার্গে উড্ডীন হয়ে সাহিত্য-গগনের শোভা বৃদ্ধি করছে। বঙ্গসরস্বতীকে ঢাকা দান করেছে "প্রতিভা", মৈমনসিং "সৌরভ", বহরমপুর "উপাসনা", এবং কুচবেহার "পরিচারিকা"। এক কথায়, এ বিষয়ে অনুষ্ঠানের ত্রুটি বাংলা-দেশের কোন অঞ্চলেই দেখা যায় না। শুধু তাই নয়, নব-বঙ্গসাহিত্য বঙ্গদেশের সীমা অতিক্রম করে অঙ্গ ও কলিঙ্গ দেশেও স্বীয় প্রসার লাভ ও প্রভাব বিস্তার করছে। তা ছাড়া এমন কথাও শুনতে পাই যে, গুজরাটী মারাঠী হিন্দী প্রভৃতি হাল সাহিত্যের প্রধান সম্বল হচ্ছে বাংলা বইয়ের অনুবাদ।

(৩

এক হিসেবে এটি একটি আশ্চর্য্য ঘটনা, কেননা এ যুগে এদেশে ইংরাজির চর্চ্চা কমা দূরে থাক্, এতটা বেড়ে গিয়েছে যে, ইংরাজি-ভাষাকে এখন বাঙ্গালীর দ্বি-মাতৃভাষা বলা যেতে পারে, যদি না বৈয়াকরণিকেরা মাতৃ-শব্দের ঐরূপ দ্বিত্বে আপত্তি করেন। বঙ্কিম-চন্দ্রের যুগে, ইংরাজি-শিক্ষিত বাঙ্গালী হাতে গোণা যেত, আর আজকের দিনে তাঁদের সংখ্যার সন্ধান নিতে হলে, সরকার বাহাদুরের আদমসুমারির খাতার অনেক পাতা ওল্টাতে হয়। সেকালের শিক্ষিত সম্প্রদায় বঙ্কিমচন্দ্রের ভাষায় যাকে বলে "ইংরাজি-বাচক", তাই ছিলেন কিনা জানি নে, কিন্তু এ কথা আমরা সবাই জানি যে,

উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে এদেশে এক নব সম্প্রদায়ের আবির্ভাব হয়, যে সম্প্রদায় বাংলা কথা ভুলেও মুখে আনতেন না,—এমন কি ঘরেও নয়। সেই ইঙ্গবঙ্গ সম্প্রদায়ের লোকেরাও যে আজ বাংলা বলেন, বাংলা লেখেন, এমন কি প্রকাশ্য সভাসমিতিতে খাঁটি বাংলায় বক্তৃতা পর্য্যন্ত করতে পিছ-পাও হন না, তার পরিচয় লাভ করবার জন্য আপনাদের অন্যত্র যেতে হবে না। আমার এ কথার সত্যতা সম্বন্ধে উপস্থিত শ্রোতৃমণ্ডলীর চক্ষুকর্ণের বিবাদ ঘটবার কোনই সম্ভাবনা নেই।

বঙ্গ-সাহিত্যের পক্ষে এ সব অবশ্য খুবই শ্লাঘার বিষয়। কিন্তু আমাদের সাহিত্যের দেহপুষ্টির এই সব প্রত্যক্ষ লক্ষণ দেখে যদি কেউ মনে করেন যে, "বাংলা বনাম ইংরাজি" এই ভাষার মামলায় বাদীর পক্ষে পুরোপূরি জয়লাভ হয়েছে—তাহলে তিনি নিশ্চয়ই ভুল করবেন; যা হয়েছে তা হচ্ছে তরমিম্ ডিক্রী। ওদিকে একটু দৃষ্টিপাত করলে সকলেই দেখতে পাবেন যে, আমাদের আইন আদালত, স্কুল কলেজ, রাজদরবার রাজনীতি, জ্ঞান বিজ্ঞান, সবই অদ্যাবধি ইংরাজির পুরো দখলে রয়েছে; শুধু তাই নয়, শিক্ষিত সম্প্রদায়ের বেশীর ভাগ গণ্যমান্য লোকেরা এ সকল ক্ষেত্রে ইংরাজির দখল বজায় রাখাই সঙ্গত ও কর্ত্তব্য মনে করেন। বাংলা ইংরাজির হাত থেকে সেইটুকু মাত্র ছাড়া পেয়েছে, যেটুকু তার পক্ষে কেঁদে বাঁচবার জন্য দরকার।

এইই যথেষ্ট প্রমাণ যে, বঙ্গ-সাহিত্যের যে বড়দিন এসেছে, সে দিনে বাংলা ভাষা শিক্ষিত সমাজে অবজ্ঞার পাত্র না হলেও, শ্রদ্ধাভাজন হয়ে ওঠে নি। পূর্ব্বে মাতৃভাষাকে শিক্ষিত সম্প্রদায় যে যথেষ্ট

অবজ্ঞা করতেন তার প্রমাণ, তাঁরা অনেকেই বাংলা লিখতেন না; আর আজ যে সেই সম্প্রদায় সে ভাষাকে যথেষ্ট শ্রদ্ধা করেন না তার প্রমাণ, তাঁরা প্রায় সকলেই বাংলা লেখেন। "প্রবৃত্তিরেষা নরানাং নিবৃত্তিস্তু মহাফলা।"—এ শাস্ত্র-বচন যে লেখা সম্বন্ধেও খাটে, এ জ্ঞান সকলের থাকলে, অনেকে বঙ্গ-সাহিত্য রচনা করতে প্রবৃত্ত হতেন না। আমি দুঃখের সঙ্গে স্বীকার করতে বাধ্য হচ্ছি যে, এঁদের অনেকের গান ও গল্প পড়ে আমার মনে হয়, বাংলা লেখাটা এঁদের পক্ষে একটা সখ মাত্র, অবসরবিনোদনের একটি বিশিষ্ট উপায়—ভাষায় যাকে বলে বিশুদ্ধ আমোদ। কিন্তু সকলেরি মনে রাখা উচিত যে, যা অবকাশরঞ্জনী, তা কাব্য নয়—এবং যা অবসরচিন্তা, তা দর্শন নয়। ঐ ধ্যান ঐ জ্ঞান না করলে সাহিত্যের যথার্থ চর্চ্চা করা হয় না। লক্ষ্মীর সেবার অবসরে সরস্বতীর সেবা করা যে কর্ত্তব্য, সে বিষয়ে কোনই সন্দেহ নেই,—তবে প্রশ্ন হচ্ছে তার প্রকৃষ্ট পদ্ধতিটি কি? আমার মতে বেশীর ভাগ কাজের লোকেরা নিজে না লিখে, পরের লেখা পড়েই ছুটির যথেষ্ট সদ্ব্যবহার করতে পারেন। জ্ঞানকর্ম্মের বিভাগটা উপেক্ষা করলে, কি জ্ঞান কি কর্ম্ম কিছুরই গুণবৃদ্ধি হয় না। মানুষে সাহিত্যে যে ভাবের ঘর বাঁধে, সে খেলার ঘর নয়, মনের বাসগৃহ। তাসের ঘর কিণ্ডার-গার্টেনেই শোভা পায়, সাবালক সমাজে নয়। সুতরাং যাঁরা মাতৃভাষার যথার্থ ভক্ত, তাঁদের পক্ষে সে ভাষাকে সাহিত্যের রাজপাটে বসাবার জন্য এখনও বহুদিন ধরে বহু চিন্তা বহুচেষ্টা করতে হবে। বঙ্গ-সরস্বতীর চরণে পুষ্পাঞ্জলি দেওয়াই আমাদের একমাত্র কাজ নয়; তাতে ভক্তির পরিচয় দেওয়া হতে পারে, কিন্তু জ্ঞানকর্ম্মের নয়। অতএব জীবনের সকল ক্ষেত্রে

বাংলা-ভাষার স্বত্বস্বামিত্ব সাব্যস্ত করবার জন্য, প্রতিপক্ষের সঙ্গে আমাদের পদে পদে তর্ক করতে হবে, বিচার করতে হবে, এবং প্রয়োজন হলে বিবাদ বিসম্বাদ করতেও প্রস্তুত হতে হবে। এক কথায় বঙ্গ-সরস্বতীর সেবককে তাঁর সৈনিকও হতে হবে।

(৪)

বিদেশী সাহিত্যের ঐশ্বর্য্যের তুলনায় আমাদের স্বদেশী সাহিত্যের দারিদ্র্যের পরিচয় লাভ করে হতাশ হবার অবশ্য কোনই কারণ নেই। লোকভাষা যে, কোন দেশেই রাতারাতি স্বরাট্ হয়ে ওঠে নি, তার প্রমাণ বর্ত্তমান ইউরোপের সকল সাহিত্যের ইতিহাসেই পাওয়া যায়। অপর ভাষা অপর সাহিত্যের অধীনতাপাশ থেকে, ইউরোপের কোন নব ভাষাই একদিনে মুক্তিলাভ করতে পারে নি। সাহিত্যে সম্পূর্ণ আত্মপ্রতিষ্ঠ হবার পূর্ব্বে ইউরোপের অনেক দেশেই দেশী ভাষাকে পর পর তিনটি বাধাকে অতিক্রম করতে হয়েছে। মোটামুটি ধরতে গেলে, লোকভাষার ক্রমোন্নতির ইতিহাস হচ্ছে এই :—প্রথমত কোনও মৃতভাষার, দ্বিতীয়ত কোনও বিদেশী ভাষার, এবং তৃতীয়ত কোনও কৃত্রিম ভাষার চাপ থেকে বেরিয়ে যাওয়া।

প্রায় হাজার বৎসর কাল ল্যাটিন যে ইউরোপের সাহিত্যের ভাষা ছিল, এ সত্য অবশ্য আপনাদের সকলের নিকটই সুবিদিত। এই দীর্ঘকাল ধরে বিজ্ঞান, দর্শন, ধর্ম্মশাস্ত্র, ব্যবহারশাস্ত্র, ইতিহাস, ভূগোল প্রভৃতি বিষয়সকল একমাত্র ল্যাটিন ভাষাতেই লিখিত হত। অপণ্ডিত লোকে অবশ্য ইউরোপের এই মধ্যযুগেও কথা ও কাহিনী, ছড়া ও

পাঁচালি প্রভৃতি নিজ নিজ ভাষাতেই রচনা করত, কিন্তু সেই লোক-সাহিত্য শিক্ষিত সমাজে সেকালে সাহিত্য বলে গণ্য হয় নি—সুতরাং সে সাহিত্য সেকালে যে কোনরূপ পদমর্য্যাদা লাভ করে নি, সে কথা বলাই বাহুল্য। এই ল্যাটিনের হাত থেকে ইউরোপীয় সাহিত্য বেশী দিন মুক্তিলাভ করে নি—তার প্রমাণ, Bacon তাঁর Novum Organum, Spinoza তাঁর Ethics, এমন কি Newtonও তাঁর Principia ল্যাটিন ভাষাতেই রচনা করেন। ইউরোপের কোনও কোনও দেশের বিশ্ববিদ্যালয়ে ল্যাটিন ভাষায় Thesis লেখবার পদ্ধতি আজও প্রচলিত আছে। আপনারা শুনে আশ্চর্য্য হবেন যে, বর্ত্তমান যুগের দিগ্বিজয়ী দার্শনিক Bergson, তাঁর যুগপ্রবর্ত্তক Time and Freewill নামক গ্রন্থ, আদিতে ল্যাটিন ভাষাতেই রচনা করেন। এ ব্যাপারে যথার্থই বিস্ময়কর, কেননা ইউরোপের দার্শনিক সমাজে লিপি-চাতুর্য্যে বার্গ্‌সঁর সমকক্ষ দ্বিতীয় ব্যক্তি নেই;—তাঁর হাতের কলম যথার্থই সোণার কাঠি, যার স্পর্শে মনোজগতের শুষ্কতরুও পত্রে পুষ্পে মুঞ্জরিত হয়ে ওঠে—দর্শনও কাব্য হয়ে ওঠে। লোকভাষার উপর মৃত-ভাষার প্রভাবও প্রভুত্ব যে কতটা দুরপণেয়, তারই প্রমাণস্বরূপ এ ব্যাপারের উল্লেখ করলুম। জর্ম্মান দেশে আজও এমন সব পণ্ডিত আছেন, যাঁদের পাণ্ডিত্য ল্যাটিন ভাষাতেই লিপিবদ্ধ হয়,—কিন্তু তার কারণ স্বতন্ত্র। শুনতে পাই সে জাতির কোনও কোনও পণ্ডিত স্বভাষায় লিখ্‌লে, সে লেখা এত জড়ানো হয় যে, তাঁরা নিজের লেখা নিজেই পড়্‌তে পারেন না,—অন্যে পরে কা কথা। কাজেই তাঁদের ল্যাটিনের শরণাপন্ন হতে হয়, কেননা সেই ভাষার প্রসাদে তাঁদের মনের ময়লা কেটে যায়। সে যাই হোক, আসল ঘটনা এই যে, ইউরোপের লোকভাষাসকল যেদিন

ল্যাটিন ভাষার প্রভুত্ব হতে মুক্তিলাভ করে' নিজের পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়াতে শিখলে, সেই দিন ইউরোপের মধ্যযুগের অবসান হয়ে নবযুগের সূত্রপাত হল ;—এক কথায়, ইউরোপীয়দের মতে সেই শুভ দিনে ইউরোপের মনের রাত কেটে গিয়ে সেখানে দিনের আলো দেখা দিলে।

(৫)

মৃতভাষার অধীনতা হতে মুক্তিলাভ করবামাত্র দেশী ভাষা সব সময়ে একেবারে আত্মবশ হয়ে উঠতে পারে না ; অনেক ক্ষেত্রে তা আবার একটি বিদেশী ভাষার শাসনাধীন হয়ে পড়ে। কোনও দেশের উপর বিদেশীর রাষ্ট্রীয় প্রভুত্ব, সেই দেশীয় ভাষার উপর বিদেশীয় ভাষার প্রভুত্বের একটি স্পষ্ট ও প্রধান কারণ। কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় যে, একটি বিদেশী ভাষা সরকারি ভাষা হওয়া সত্ত্বেও বিজিত জাতির ভাষা ও সাহিত্যের উপর জয়লাভ করতে পারে না। গ্রীস, রোমের অধীন হয়েও পুরাকালে ভাষায় ও সাহিত্যে তার স্বরাজ্য সম্পূর্ণ রক্ষা করেছিল। ফারসিও এদেশে বহুকাল সরকারি ভাষা ছিল—কিন্তু আমাদের ভাষার উপর ফারসি ভাষার এবং আমাদের সাহিত্যের উপর ফারসি সাহিত্যের প্রভাব একরকম নেই বল্‌লেও অত্যুক্তি হয় না। অপরপক্ষে এমনও দেখা যায় যে, একটি বিদেশী ভাষা রাজভাষা না হয়েও অপর ভাষার উপর একাধিপত্য করেছে। বিজিত গ্রীসের সাহিত্যের হাতের নীচেই রোমের ল্যাটিন সাহিত্য গড়ে ওঠে। এ কালের ইউরোপেও এ সত্যের যথেষ্ট নিদর্শন আছে।

কিছুদিনের জন্য ফরাসি ভাষা ইউরোপে দিগ্বিজয়ী ভাষা হয়ে উঠেছিল—ইউরোপের প্রায় সকল প্রদেশের সাহিত্যই একযুগে না একযুগে ফরাসি সাহিত্যের প্রতাপে অভিভূত হয়ে পড়েছিল।

কিন্তু ইউরোপের সাহিত্যের ইভলিউসানে, ইতালির reversion যথার্থই একটী অত্যাশ্চর্য্য ব্যাপার। যাঁরা জীবজগতের ইভলিউসান-তত্ত্ব অবগত আছেন তাঁরাই জানেন যে, জীবের ক্রমোন্নতির ধারা এক-রোখাও নয়, একটানাও নয়। ইভলিউসানের সঙ্গে সঙ্গে reversion, উন্নতির পিঠ পিঠ অবনতিও দেখা দেয়। কিছুদুর এগিয়ে তারপর পিছুহটা বোধহয় মানব সভ্যতারও নৈসর্গিক ধর্ম্ম, নচেৎ যে ভাষায় দান্তে, পেট্রার্কা, বোক্কাচ্চিয়ো, মাকিয়াভেল্লি প্রভৃতি জগদ্বিখ্যাত লেখকেরা কাব্যে ও ইতিহাসে সাহিত্যের অক্ষয়কীর্ত্তিসকল রেখে গিয়েছেন, সেই ভাষা অষ্টাদশ শতাব্দীতে ফরাসি ভাষার আনুগত্য স্বেচ্ছায় বরণ করে নিত না। ইতালির নবযুগের আদি কবি Alfieri তাঁর আত্মকথায় লিখেছেন যে, তিনি তাঁর স্বকালের সাধুপদ্ধতি অনুসারে প্রথমে ফরাসি ভাষাতেই নাটক রচনা করতেন, কিন্তু সৌভাগ্যবশত ক্রমে তাঁর এই জ্ঞান জন্মাল যে, সে-সকল নাটক কাব্য নয়—শ্রীহীন শক্তিহীন প্রাণহীন কাঠের পুতুল মাত্র। এ কথা শুনে মাইকেল মধুসূদন দত্তের কথা মনে পড়ে। এর পরেই ইতালীয় ভাষা আবার তার স্বরাজ্য লাভ করেছে। ইতালির সাহিত্যের খবর আমরা বড় একটা রাখিনে; তার কারণ, ইতালি আল্‌প্‌স্‌ পর্ব্বতের এ পারের দেশ, অর্থাৎ আমাদের এদিকের দেশ। আমাদের বিশ্বাস একালের ইতালীয়েরা পারে শুধু রাস্তায় রাস্তায় অর্গান বাজাতে, আর রঙ-বেরঙের মিষ্টান্ন তৈরি করতে। কিন্তু সেই সঙ্গে তাদের হাতে কাব্যের অর্গানও

যে চমৎকার বাজে, এবং দর্শনের মিষ্টান্নও যে সুন্দর তৈরি হয়, তার প্রমাণ D'Annunzio এবং Benedetto Croce-র দক্ষিণ হস্তের কীর্ত্তি।

যে মার্টিন লুথারের প্রচণ্ড আক্রমণে রোমান চর্চ্চ ও ল্যাটিন ভাষার সর্ব্বজনীন প্রভুত্ব চিরদিনের জন্য ক্ষুণ্ণ হয়ে পড়ল, সেই মার্টিন লুথারের স্বদেশ জর্ম্মাণীর সাহিত্যও আবার পাল্‌টে ফরাসি সাহিত্যের মায়ায় আবদ্ধ হয়ে পড়েছিল। সপ্তদশ শতাব্দী ছিল ফরাসি সাহিত্যের একটি স্বর্ণযুগ। এই সাহিত্যের প্রভাব জর্ম্মাণীর শিক্ষিত মনকে প্রায় একশ' বৎসরের জন্য একেবারে অভিভূত ও মায়ামুগ্ধ করে রেখেছিল। ফলে সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ থেকে আরম্ভ করে অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্য্যন্ত, ফরাসি সাহিত্যের অনুকরণে জর্ম্মাণীতে যে সাহিত্য রচিত হয়, তার কোনরূপ মূল্য কিম্বা মর্য্যাদা নেই। এই ফরাসি সাহিত্যের গুণে ফরাসি ভাষাও জর্ম্মাণদের কাছে একটি নব Classic হয়ে ওঠে। নব জর্ম্মাণীর আদিকর্ত্তা Frederick the Great নিজের রসনা ও লেখনীকে সক্লেশে ফরাসি ভাষাতেই বল্‌তে ও লিখ্‌তে শিখিয়েছিলেন,—অর্থাৎ যিনি ইউরোপে জর্ম্মাণ জাতির রাষ্ট্রীয় শক্তি সুপ্রতিষ্ঠিত করবার জন্য বদ্ধপরিকর হয়েছিলেন, স্বয়ং তিনিই বাহোসে বাহাল-তবিয়তে এবং খোসমেজাজে ফরাসি সাহিত্য ও ফরাসি ভাষার সার্ব্বভৌমিক আধিপত্য শিরোধার্য্য করে নিয়েছিলেন। কিমাশ্চর্য্যমতঃপরং!

কিন্তু এর চাইতেও আশ্চর্য্যের বিষয় আছে। জগদ্বিখ্যাত জর্ম্মাণ দার্শনিক Leibnitz এই যুগে তাঁর দার্শনিক গ্রন্থসকল ফরাসি ভাষাতেই রচনা করেন—সম্ভবত এই বিশ্বাসে যে, তাঁর মাতৃভাষা দর্শন

রচনার পক্ষে উপযোগী নয়। এ বিশ্বাস যে কতদূর অমূলক তার প্রমাণ, তাঁর পরবর্ত্তী এবং ইউরোপের নবযুগের অদ্বিতীয় দার্শনিক কাণ্টের গ্রন্থসকল। সে-সকল গ্রন্থ যে এ যুগের দর্শনশাস্ত্রের Classic হয়ে উঠেছে, শুধু তাই নয়,—কাণ্টের রচনার প্রসাদে ইউরোপের মনে এমন একটি ধারণা জন্মে গেছে যে, জর্ম্মাণ ভাষাই হচ্ছে দর্শন রচনা কর্‌বার পক্ষে সর্ব্বাপেক্ষা উপযোগী ভাষা। অতএব দেখা গেল, মার্টিন লুথার যেমন প্রথমে ল্যাটিনের হাত থেকে উদ্ধার করে জর্ম্মাণ ভাষাকে পায়ের উপর দাঁড় করান, কাণ্ট তেমনি পরে স্বভাষাকে ফরাসির অধীনতা থেকে নিষ্কৃতি দিয়ে সে ভাষাকে নিজের পায়ে চল্‌তে শেখান। স্বভাষায় আত্মপ্রকাশ করবার স্বাধীনতা লাভ করে জর্ম্মাণ সাহিত্য যে কতদূর ঐশ্বর্য্য লাভ করেছে, সে কথা বলা নিস্প্রয়োজন। অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ থেকে আরম্ভ করে ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্য্যন্ত—এই একশত বৎসর হচ্ছে জর্ম্মাণ সাহিত্যের স্বর্ণযুগ। এ যুগের সাহিত্যরথীদের নামের ফর্দ্দ দিতে হ'লে পুঁথি অসম্ভবরকম বেড়ে যায়, এবং সে ফর্দ্দ দেবারও কোন দরকার নেই। কাব্য দর্শন ইতিহাস বিজ্ঞান প্রভৃতি সাহিত্যের সকল ক্ষেত্রে জর্ম্মাণ মহারথীদের নাম শিক্ষিত সমাজে কার নিকট অবিদিত? জর্ম্মাণ প্রতিভার এই আকস্মিক এবং অভূতপূর্ব্ব বিকাশের প্রত্যক্ষ কারণ এই যে, জর্ম্মাণ ভাষা এবং সেই সঙ্গে জর্ম্মাণ আত্মা তার স্বরাজ্য লাভ করেছে।

(৬)

অপরপক্ষে, যে গুণে ফরাসি ভাষা রুষীয় জর্ম্মাণ প্রভৃতি ভাষার উপর প্রভুত্ব করেছে, সেই গুণেই তা এ যাবৎ স্বীয় সুনীতি ও সুরুচি

রক্ষা করে এসেছে। ফরাসি হচ্ছে বড় ঘরের সন্তান, প্রাচীন ল্যাটিনের বংশধর; সুতরাং এ ভাষা তার আত্মজ্ঞান কখনই হারায় নি, তার আভিজাত্যের অহঙ্কারই তার আত্মরক্ষার কারণ হয়েছে। ফরাসি প্রভৃতি ল্যাটিন জাতিরা বহুকাল যাবৎ জর্ম্মাণদের বর্ব্বর বলেই উপেক্ষা ও অবজ্ঞা করে এসেছিল। বর্ব্বর শব্দের মৌলিক অর্থ হচ্ছে—সেই জাতি যার ভাষা বোঝা যায় না। সুতরাং এ জাতি যে কস্মিনকালেও অজ্ঞাত-কুলশীল জর্ম্মাণ ভাষার প্রাধান্য স্বীকার করে নি, তা বলা বাহুল্য।

এমন কি, যে জর্ম্মাণ দর্শন গত শতাব্দীতে পৃথিবীর শিক্ষিত সমাজের মনের উপর একছত্র এবং অখণ্ড রাজত্ব করেছে—সে দর্শনও ফরাস মনকে বেশীদিন আত্মবশে রাখতে পারে নি। প্রসিদ্ধ ফরাসি লেখক Taine গত শতাব্দীর মধ্যভাগে এই মত প্রকাশ করেন যে, জর্ম্মাণী তৎপূর্ব্ববর্ত্তী একশ বৎসর যা চিন্তা করেছে—তৎপরবর্ত্তী একশ বৎসর সমগ্র ইউরোপকে সেই চিন্তার পুনর্চিন্তা করতে হবে। এ ভবিষ্যদ্বাণী যে খেটেছে, তার প্রমাণ আমরা আমাদের বিশ্ব-বিদ্যালয়েই পাই। এ যুগের যে ইংরাজি দর্শন আমরা চর্চ্চা করি—তা যে গত যুগের জর্ম্মাণ দর্শনের পুনরাবৃত্তি মাত্র, তার পরিচয় নব-কান্টিয়ান, নব-হেগেলিয়ান প্রভৃতি নামেই পাওয়া যায়। আমরা দূর এসিয়াবাসী হয়েও, জর্ম্মাণ দর্শনকে দূরে রাখতে পারি নি; বরং সত্য কথা বলতে হলে, গত ত্রিশ বৎসর ধরে আমরাও শুধু জর্ম্মাণীর তৈরি বৈজ্ঞানিক খাদ্য উদরস্থ করছি আর তার জাবর কাটছি। মনো-জগতে যে, ল্যাটিন নামক একটি প্রদেশ আছে যা কুয়াশায় ঢাকা নয়—এ কথা আমরা নিজেরা আলোর দেশের লোক হয়েও, একরকম

ভুলেই গিয়েছিলুম। এক বর্ণ জর্ম্মাণ না জেনেও Nietsche-র বই আমরা অনেকেই পড়েছি এবং তাঁর কথার দুকুল-ভাসানো বন্যায় হাবুডুবুও খেয়েছি, কিন্তু ফরাসি দার্শনিক Guyot-র নাম আমরা অনেকেই শুনি নি, যদিচ উভয়েই মনোরাজ্যে একই পথের পথিক; দুয়ের ভিতর প্রভেদ এই যে, যে পথে ফরাসি Guyot ধীর পাদক্ষেপে অগ্রসর হয়েছেন, সেই পথে জর্ম্মাণ Nietsche তাণ্ডব-নৃত্য করেছেন। নকুলীশ-পাশুপত দর্শনে দেখতে পাই যে, পাশুপত সম্প্রদায়ের সাধনমার্গে, উপহারসংজ্ঞক ছয়প্রকার ক্রিয়া ছিল। তার মধ্যে প্রধান চারটি হচ্ছে, হা হা করে' হাস্য করা, গন্ধর্ব্ব শাস্ত্রানুসারে গীত গাওয়া, নাট্যশাস্ত্রানুসারে নৃত্য করা, এবং হুড্ডুকার করা—অর্থাৎ পুঙ্গবের ন্যায় চীৎকার করা। Nietsche-র লেখা পড়ে আমার মনে হয় যে, নকুলীশ-পাশুপত দর্শন ভারতবর্ষে তার ভব-লীলা সম্বরণ করে জর্ম্মানীতে আবার পুনর্জ্জন্ম লাভ করেছে। গেটে এবং কাণ্ট সাহিত্যের জগদ্গুরু হলেও, এ কথা নিঃসন্দেহ যে, বিশ্ব-মানবের মনের উপর আধুনিক জর্ম্মাণ মনের প্রভাব যেমন অকারণ তেমনি মারাত্মক, কেননা জর্ম্মাণ দর্শন অপর জাতির মনের আকাশ ঘুলিয়ে দেয়। জর্ম্মাণ আত্মার অশেষ গুণের মধ্যে একটি হচ্ছে কুয়াশা সৃষ্টি করবার শক্তি, এবং সে কুয়াশার গতিরোধ করাও যেমন কঠিন, তার প্রকোপে মনের স্বাস্থ্যরক্ষা করাও তেমনি কঠিন। এ সত্য ফরাসি জাতিই সর্ব্বপ্রথমে আবিষ্কার করে। যে সময়ে জর্ম্মাণ আত্মা আমাদের ঘাড়ে চড়্‌তে সুরু করে—ঠিক সেই সময়ে তা ফরাসিদের ঘাড় থেকে নেমে যেতে সুরু করে। আজ প্রায় ত্রিশ বৎসর পূর্ব্বে Taine-এর একটি ধনুর্দ্ধর শিষ্য Maurice Barrés, ল্যাটিনমনের

উপর জর্ম্মাণ মনের এই বিজাতীয় উপদ্রবের উচ্ছেদকল্পে লেখনী ধারণ করেন। যে পুস্তকে তিনি মনোজগতে জর্ম্মাণ শাসনের বিরুদ্ধে যুদ্ধঘোষণা করেন—সে পুস্তকের নাম Under the Eyes of the Barbarians। জর্ম্মাণ জাতির আদিম বর্ব্বরতা যে এ যুগে বৈজ্ঞানিক বর্ব্বরতার আকার ধারণ করেছে, বর্ত্তমান যুদ্ধের বহুপূর্ব্বে তা ফরাসি-মনীষীদের কাছে ধরা পড়ে, এবং তাও এক হিসেবে ভাষাসূত্রে। জর্ম্মাণ সাহিত্যের ফরাসি পাঠকেরা হঠাৎ আবিষ্কার করেন যে, জর্ম্মাণ অভিধানে এমন একটি কথা আছে, যা ফরাসি অভিধানে নেই—এবং সে হচ্ছে পরশ্রীকাতরতা। অপরপক্ষে জর্ম্মাণ অভিধানে humanity শব্দের সাক্ষাৎ অণুবীক্ষণের সাহায্যেও লাভ করা যায় না। মাতৃ-ভাষা জাতির পৈতৃক প্রাণরক্ষার পক্ষে যে কতদূর সহায়, তারই প্রমাণ-স্বরূপ,—ঈষৎ অবান্তর হলেও,—এ ব্যাপারের উল্লেখ করলুম।

(৭)

আমি ইতিপূর্ব্বে বলেছি যে লোকভাষা, মৃতভাষা এবং বিদেশী-ভাষার অধীনতাপাশ মোচন করতে পারলেও, অক্লেশে সম্পূর্ণ আত্ম-প্রতিষ্ঠ হতে পারে না। মৌখিক ভাষার স্বরাজ্যলাভের তৃতীয় পরিপন্থী হচ্ছে পুঁথিগত কৃত্রিমভাষা—অর্থাৎ সাধুভাষা। এ বিষয়ে এ প্রবন্ধে আমি বেশী বাক্যব্যয় করতে চাই নে; কেননা ইতিপূর্ব্বে এ বিষয়ে আমি বহু বক্তৃতা করেছি; সে সব কথার পুনরুক্তি করা এ ক্ষেত্রে আমার পক্ষে প্রেয়ও নয়, শ্রেয়ও নয়; তবে কথাটা একেবারে ছেঁটে দিলে এ প্রবন্ধের অঙ্গহানি হয়, এই কারণে সংক্ষেপে এ বিষয়ে আমার মত বিবৃত করতে বাধ্য হচ্ছি।

মানুষে মৃতভাষা ত্যাগ করে যখন প্রথমে লোকভাষা অর্থাৎ মৌখিক ভাষায় লিখতে আরম্ভ করে—তখন সেই মৃতভাষার রচনা-পদ্ধতির আদর্শেই রচনা করা তার পক্ষে স্বাভাবিক। এর উদাহরণও ইউরোপীয় সাহিত্যে পাওয়া যায়;—পদে ও বাক্যে Latinism-এর আমদানি ইংরাজির আদি গদ্য-লেখকেরাও যথেষ্ট করেছিলেন। সুতরাং আমরাও যে তা করব, সে ত নিতান্ত স্বাভাবিক। বাংলা গদ্যের বয়েস সবে একশ বছর হলেও, তা এক যুগ পিছনে ফেলে এখন দ্বিতীয় যুগে চল্‌ছে। প্রথম যুগে, সংস্কৃত গদ্যের অনুকরণে এবং সংস্কৃত শব্দের উপকরণে বাংলা গদ্য লেখা হত। যে যুগ চল্‌ছে, তাতে বাংলা গদ্য গঠিত হয়েছে ইংরাজি বাক্যের অনুকরণে এবং সংস্কৃত শব্দের উপকরণে। আমার বিশ্বাস, এখন আমরা তার তৃতীয় যুগের—অর্থাৎ সম্পূর্ণ স্বাধীনতার যুগের—মুখে এসে পৌঁচেছি। আমার এ বিশ্বাস ভুল হতে পারে, কিন্তু এ কথা নিঃসন্দেহ যে, পরভাষার অনুকরণে এবং উপকরণে যে লিখিত ভাষা গঠিত হয়, সেই পুঁথিগত ভাষা অনেক অংশে কৃত্রিম। তারপর আর একটি কথা আছে। যার জীবন আছে, তার নিত্যনূতন বদল হয়। জীবন হচ্ছে একটি ধারাবাহিক পরিবর্ত্তনের স্রোত মাত্র; সেই কারণেই জীবন্ত ভাষা ক্রম-পরিবর্ত্তনশীল, এবং যুগে যুগে তা নূতন মূর্ত্তি ধারণ করে; অপরপক্ষে লিখিত ভাষা অক্ষরের মধ্যে অক্ষয় হয়ে বসে থাকে। নৈসর্গিক কারণেই, লিখিত ভাষার কাছ থেকে কথিত ভাষা কালবশে এতটা দূরে সরে যায় যে, সে দুই ভাষা প্রায় দুটি বিভিন্ন ভাষা হয়ে ওঠে। তখন মৃতভাষার সঙ্গে জীবন্ত ভাষার সেই প্রাচীন বিবাদ আবার নূতন আকারে দেখা দেয়; কেননা পূর্ব্বযুগের লিখিত ভাষা পরযুগের

কাছে সম্পূর্ণ মৃত না হলেও, অর্দ্ধমৃত ত বটেই। মৃতভাষার সঙ্গে জীবন্ত ভাষার বিরোধের চাইতে সাধুভাষার সঙ্গে চলূতি ভাষার বিরোধের কলরবটা কিছু বেশী, কেননা এ হচ্ছে জ্ঞাতি-শত্রুতা। তা ছাড়া লিখিত ভাষাই হচ্ছে সাহিত্য-জগতে মৌখিক ভাষার যথার্থ শিক্ষাগুরু। সুতরাং মৌখিক ভাষার পক্ষে সাহিত্যরাজ্য অধিকার করবার প্রয়াসটা সত্য সত্যই শিষ্যের পক্ষে গুরুকে ছাড়িয়ে ওঠবার চেষ্টা। এ অবস্থায় সাহিত্যের দ্রোণাচার্য্যেরা যে সাহিত্যের একলব্য-দের অঙ্গুলিচ্ছেদের আদেশ দেবেন, তাতে আর আশ্চর্য্য কি ?—এতে অবশ্য ভয় পেলে স্বভাষাকে স্বরাট করে তোলা যাবে না। এ কথাটা শ্রুতিকটু হলেও সত্য যে, গুরুভক্তি না থাকলে যেমন সনাতন বিদ্যা অর্জ্জন করা যায় না, তেমনি গুরুমারা বিদ্যে না শিখলেও নূতন সাহিত্যের সর্জ্জন করা যায় না। Plato, Aristotle-এর যুগ থেকে সুরু করে অদ্যাবধি, সকল দেশের সকল যুগের সাহিত্যের ইতিহাস এই সত্যের পরিচয় দিয়ে আস্ছে। অতএব বইয়ের ভাষার সঙ্গে মুখের ভাষার যুদ্ধটা নিরর্থকও নয়, নিস্ফলও নয়। মৃতভাষার সঙ্গে জীবন্ত ভাষার, বিদেশী ভাষার সঙ্গে স্বদেশী ভাষার লড়াইও ত ঐ বইয়ের ভাষার সঙ্গে মুখের ভাষার জীবন-সংগ্রাম বই আর কিছুই নয়।

(৮)

ইউরোপ হতে সংগৃহীত এই ইতিহাসের আলোক বঙ্গভাষার উপর ফেলে দেখা যাক্, আমাদের মাতৃভাষার বর্ত্তমান অবস্থাটা কি ? বঙ্গ-ভাষার পুরাতত্ত্ব আমরা আজও পূরো জানি নে; কিন্তু বঙ্গ সাহিত্যের

ইতিহাস আমাদের কাছে একেবারে অবিদিত নয়। এ ইতিহাসের দু'টি সম্পূর্ণ পৃথক অধ্যায় আছে। আমাদের সাহিত্যের যে যুগ গত হয়েছে সেটিকে নবাবী যুগ, এবং যে যুগ আগত হয়েছে সেটিকে ইংরাজি যুগ বলা যায়।

নবাবী যুগের সাহিত্যে, ছড়া পাঁচালি পদাবলী ও সংস্কৃত কাব্যের প্রাকৃত অনুবাদ ব্যতীত আর কিছুই পাওয়া যায় না; এক কথায় এ সাহিত্য হচ্ছে পদ্যে লেখা গান ও গল্পের সাহিত্য। কিন্তু নবাবী আমলে বাঙ্গালী যে একমাত্র উদরান্ন ব্যতীত অপর কোন বিষয়ে ভাবনাচিন্তা করে নি, এ কথা সত্য নয়। সে যুগে এ দেশে ধর্ম্মশাস্ত্র ও ন্যায়শাস্ত্রের যথেস্ট চর্চ্চা ছিল। জনরব যে, মনুসংহিতার মন্বর্থ-মুক্তাবলীর রচয়িতা কুল্লুকভট্ট ভাহিরপুরের রাজবংশের, এবং কুসুমাঞ্জলীর প্রণেতা উদয়নাচার্য্য ভাদুড়িকুলের আদিপুরুষ। এ প্রবাদ সত্য বলে গ্রাহ্য করে' নেবার দিকে আমার মনের একটা স্বাভাবিক ঝোঁক আছে, কেননা আমি জাতিতে বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ। তৎসত্ত্বেও, প্রমাণের অসদ্ভাবহেতু এ কিম্বদন্তিতে কোনরূপ আস্থা স্থাপন করা যায় না। কিন্তু বাঙ্গালীর হাতে যে একটি নব্যন্যায় এবং একটি নব্য স্মৃতি গড়ে উঠেছিল, সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই। বঙ্গদেশজাত এ সকল সংস্কৃত শাস্ত্রের মূল্য যে কি, সে বিষয়ে মতামত প্রকাশ করবার অধিকার আমার নেই। সংস্কৃত শাস্ত্রে সুপণ্ডিত আমার জনৈক দ্রাবিড় বন্ধু বলেন যে, বাঙ্গলার নব্যন্যায় যে নব্য, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই—কিন্তু তা ন্যায় কি না, সে বিষয়ে বিশেষ সন্দেহ আছে! অষ্টাদশতত্ত্ব রচনা করে রঘুনন্দন বাঙ্গালী জাতির উপকার কি অপকার করেছেন, সে বিষয়েও যথেষ্ট মতভেদের অবসর আছে। কিন্তু এই সকল গ্রন্থই

প্রমাণ যে—নবাবী আমলেও বাঙ্গালী জাতির বুদ্ধিবৃত্তি একেবারে ঘুমিয়ে পড়ে নি, এবং বাঙ্গালী সমাজতত্ত্ব ও জ্ঞানতত্ত্ব সম্বন্ধে চিন্তা করতে বিচার করতে কখনই ক্ষান্ত হয় নি। কিন্তু সে যুগে আমাদের জ্ঞান ও চিন্তার একমাত্র বাহন ছিল সংস্কৃত ভাষা, যেমন মধ্যযুগে ইউরোপের ছিল ল্যাটিন। সে কালে বুদ্ধিবিদ্যার বিষয়ের উপর হস্তক্ষেপ করবার লোকভাষার কোনই অধিকার ছিল না। সুতরাং এদেশে ইংরাজ আসার পূর্ব্বে বাংলা ছিল, মধ্যযুগের ইউরোপে যাকে বলত একটি vulgar tongue-অর্থাৎ ইতর ভাষা।

ইংরাজি আমলে বাংলা সাহিত্যের যথেষ্ট শ্রীবৃদ্ধি হয়েছে, কিন্তু আমাদের দর্শন বিজ্ঞানের বাহন আজ সংস্কৃতের পরিবর্ত্তে ইংরাজি হয়েছে। কথাটা যে সত্য, তার প্রমাণ স্বরূপ দু'একটি উদাহরণ দেওয়া যাক্। সার জগদীশচন্দ্র বসু, ডাক্তার প্রফুল্লচন্দ্র রায় এবং ডাক্তার ব্রজেন্দ্র নাথ শীল প্রভৃতি দেশপূজ্য মনীষীগণ তাঁদের বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিক গ্রন্থসকল ইংরাজি ভাষাতেই রচনা করেন। অর্থাৎ Leibnitz-এর যুগে জর্ম্মাণ ভাষার যে অবস্থা ছিল—আজ এই বিংশ শতাব্দীতে বাংলা ভাষা ঠিক সেই অবস্থাতেই আছে,—সাহিত্যের স্কুলে আজও তা প্রমোসন পায় নি, তার ইতরতার কলঙ্ক আজও ঘোচে নি।

(৯)

বলা বাহুল্য বঙ্গ সাহিত্য যতদিন কেবলমাত্র গল্প ও গানের গণ্ডীর ভিতর আটক থাকবে—ততদিন শিক্ষিত সমাজে বঙ্গভাষা যথার্থ প্রতিষ্ঠা লাভ করতে পারবে না। কেননা শ্রেষ্ঠকাব্য সাহিত্যের

মুকুটমণি হলেও, সস্তা কথা ও গাথা নিতান্তই অকিঞ্চিৎকর পদার্থ। নিকৃষ্ট কাব্যসাহিত্যের পরিমাণ বৃদ্ধি হওয়াতে কোন সাহিত্যেরই গৌরব বৃদ্ধি হয় না, এবং অক্ষম হস্তের অযত্নপ্রসূত গান ও গল্প প্রায়ই উৎকৃষ্ট হয় না; কেননা যথার্থ কাব্যসৃষ্টির জন্য চাই স্রষ্টার প্রাক্তনসংস্কার এবং অসামান্য প্রতিভা। এবং সকলেই অবগত আছেন যে, প্রতিভাশালী লেখক এবেলা ওবেলা হাটে বাজারে মেলে না। হালে বঙ্গ সাহিত্যের একটি নূতন চাল দেখে আমি ঈষৎ ভীত হয়ে পড়েছি। সম্প্রতি আমাদের সাহিত্যে রসমাহাত্ম্য-কীর্ত্তন ও রসতত্ত্ব-বিচারের বেজায় ধূম পড়ে গিয়েছে। এতে অবশ্য ভয়ের কোনও কারণ থাকত না, যদি সাহিত্যে রসের লোভে তার সারের দিকটা উপেক্ষা করবার একটা সম্ভাবনা না এসে পড়ত। কদলী বৃক্ষের অন্তরে সার নেই—আছে কেবল রস; সে কারণ আমরা যদি বঙ্গ সাহিত্যে সেই সুগোল নিটোল মসৃণ চিক্কণ নধর সরস বৃক্ষের চাষের প্রশ্রয় দিই, তাহলে বঙ্গসরস্বতীর কপালে নিশ্চয়ই শুধু কদলী ভক্ষণই লেখা আছে। এস্থলে, আমি সকলকে স্মরণ করিয়ে দিতে চাই যে,—ভাষার উৎপত্তি কর্ম্মে, আর তার পরিণতি জ্ঞানে। ভাষা ব্যতীত মানুষের চিন্তা প্রকাশ করবার অপর কোনও উপায় নেই। অপরপক্ষে আমরা যাকে বলি রস, আর ইংরাজরা emotion,—সে বস্তু প্রকাশ করবার নানা উপায় আছে—যথা, স্বেদ কম্প মূর্চ্ছা বেপথু শিৎকার চীৎকার প্রভৃতি। সুতরাং এ কথা নির্ভয়ে বলা যেতে পারে যে, জ্ঞান ও চিন্তার বাহন হয়েই ভাষা তার স্বরূপ ও স্বরাজ্য লাভ করে। কাব্য সাহিত্যের শীর্ষস্থান অধিকার করে, কেননা এক-মাত্র কাব্যেই, জ্ঞানের ভাষা কর্ম্মের ভাষা ও ভক্তির ভাষা,

এই ত্রিধারার ত্রিবেণীসঙ্গম হয়। তিনিই যথার্থ কবিপদবাচ্য, যাঁর হৃদয়রসের সঙ্গে বহুলপরিমাণে জ্ঞানের সার, যাঁর বুকের রক্তের সঙ্গে অনেকখানি মনের ধাতু অবিচ্ছেদ্যভাবে মিশ্রিত থাকে। সত্য ও সুন্দর যে কারও কারও হাতে একই বস্তু হয়ে ওঠে, তার জাজ্বল্যমান প্রমাণ কালিদাস সেক্‌স্‌পিয়ার দান্তে মিলটন গেটে রবীন্দ্রনাথ প্রভৃতি মহাকবিদের কাব্য।

সুতরাং বঙ্গ সাহিত্যের বর্ত্তমান অজ্ঞান অবস্থা আমাদের কাছে মোটেই সন্তোষজনক নয়। বঙ্গসরস্বতী কালে যে আমাদের মনোজগতের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা হবেন—এই দুরাশাই আমাদের উচ্চ আশা। অতএব কি অবস্থায় এবং কি কারণে লোকভাষা পরবশ হয়ে পড়ে, আর কি ব্যবস্থায় এবং কি উপায়ে তা আত্মবশ হয়ে ওঠে, তারও কিঞ্চিৎ আলোচনা করা দরকার। অবস্থা বুঝলে তার ব্যবস্থা করা সহজ। মাতৃভাষাকে স্বপ্রতিষ্ঠ করবার লোভ যে আমরা কিছুতেই সম্বরণ করতে পারি নে, তার কারণ আমরা জানি যে "সর্ব্বং আত্মবশং সুখং" আর "সর্ব্বং পরবশং দুঃখং"।

(১০)

জীবন্ত ভাষার উপর মৃত ভাষার প্রভুত্বের কারণ নির্ণয় করবার জন্য, ল্যাটিনের উদাহরণ নেওয়া যাক্। পুরাকালে ল্যাটিন যে ইউরোপের পশ্চিমভাগের উপর একাধিপত্য করেছিল তার কারণ, সেকালে ল্যাটিন ছিল সে ভূভাগের রাজভাষা। গ্রীকভাষা সে যুগে রোমানদের বিদ্যাশিক্ষার ভাষা হলেও, সে ভাষা রাজভাষা নয় বলে

রোমের অধীনস্থ অপর দেশসকলে তা অপরিচিত ছিল। তবে রোমান সাম্রাজ্যের ধ্বংশের পরও ল্যাটিন যে আর এক হাজার বছর ধরে ইউরোপে নির্ব্বিবাদে প্রভুত্ব করে—তার কারণ রোম তার রাজত্ব হারিয়ে স্বর্গত্ব লাভ করলে;—যে রোম ছিল প্রাচীন যুগের কর্ম্মরাজ্যের কেন্দ্র, সেই রোম হয়ে উঠল মধ্যযুগের ধর্ম্মরাজ্যের Eternal City, অর্থাৎ অমরাপুরী। এক কথায়, রোমানরা খৃষ্টধর্ম্ম অবলম্বন করবার পর ল্যাটিন হল দেবভাষা। কোনও বিশেষ ধর্ম্মের ভাষা, অর্থাৎ যজনযাজন ধ্যানধারণা উপাসনা আরাধনা মন্ত্রতন্ত্র স্তবস্তোত্রের ভাষা যে, সেই ধর্ম্মাবলম্বী লৌকিক মনের অলৌকিক শ্রদ্ধা ও ভক্তি আকর্ষণ করে,—বিশেষত সে ভাষার অর্থ যদি জনগণের জানা না থাকে,—এ সত্য ত জগদ্বিখ্যাত। ল্যাটিনের প্রতাপ ইউরোপে আজও অক্ষুন্ন থাকত, যদি না Renaissance এবং Reformation ইউরোপের মনকে রোমান-চর্চ্চের একান্ত বশ্যতা থেকে মুক্ত করত। মধ্যযুগের শেষভাগে গ্রীক সাহিত্যের আবিষ্কারের সঙ্গে সঙ্গে ইউরোপ মানুষের স্বাধীনচিন্তা ও স্বোপার্জ্জিত জ্ঞানের সাক্ষাৎ লাভ করলে। এর ফলে, রোমের ধর্ম্ম-মন্দিরের অটল ভিত টলটলায়মান হ'ল, এবং সেই সঙ্গে ল্যাটিন ভাষারও দৈবশক্তি লোপ পাবার উপক্রম হল। গ্রীক ভাষার প্রভূত ঐশ্বর্য্য ও অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্যের তুলনায় ল্যাটিন ভাষা ইউরোপের শিক্ষিত সম্প্রদায়ের চোখে ক্ষীণসত্ত্ব ও হীনপ্রভ হয়ে পড়ল। এই গ্রীক সাহিত্যের চর্চ্চায় সে যুগের মনীষীগণ নূতন দর্শন বিজ্ঞানের সৃষ্টি করতে ব্যগ্র হলেন। কিন্তু স্বাধীনচিন্তা-প্রসূত দর্শন বিজ্ঞান, সুপ্রতিষ্ঠিত ধর্ম্মতন্ত্রকে বিচলিত করতে পারলেও, বিপর্য্যস্ত করতে পারে না। এক ধর্ম্মমতের স্থান

অধিকার করতে পারে শুধু আরেক ধর্ম্মমত। তাই লুথারের প্রবর্ত্তিত Reformationই জর্ম্মানিক ভাষাসমূহকে ল্যাটিনের অধীনতা থেকে যথার্থ মুক্তি দান করলে।

(১১)

লুথার যেদিন জর্ম্মাণীর লোকভাষায় বাইবেলের অনুবাদ করলেন, সেই দিনই জর্ম্মাণ সাহিত্যের পাকা বুনিয়াদের পত্তন হল। ভাষার সঙ্গে ধর্ম্মের সম্পর্ক যে অতি ঘনিষ্ঠ, এ সত্য সকলের নিকট সুস্পষ্ট না হলেও, নিঃসন্দেহ। মানুষের মনের বাইরে ভাষা নেই, এবং ভাষার বাইরেও মন নেই। ভাষা ও মন হচ্ছে একই বস্তুর অন্তর ও বাহির। সুতরাং ধর্ম্মমত ভাষান্তরিত হলে, রূপান্তরিত হতে বাধ্য। একটি উদাহরণ নেওয়া যাক। ইউরোপ খৃষ্টধর্ম্ম অবলম্বন করবার অব্যবহিত কাল পরেই সে দেশে দুটি সম্পূর্ণ পৃথক খৃষ্ট সংঘের সৃষ্টি হল,—একটি রোমে আর একটি কনস্টাণ্টিনোপলে। রোমান সাম্রাজ্য তার অধঃপতনের মুখে যে দুটি ভাগে বিভক্ত হয়ে পড়েছিল, খৃষ্টধর্ম্ম তার অভ্যুত্থানের মুখে ঠিক সেই দুটি ভাগে বিভক্ত হয়ে পড়ল। এর মূল কারণ যে ভাষার পার্থক্য, তার পরিচয় এ দুটি সংঘের নামেই পাওয়া যায়;—একটির নাম গ্রীক চর্চ্চ, অপরটির রোমান। New Testament যদি গ্রীক অর্থাৎ ইউরোপের ভাষায় লেখা না হ'ত, তাহলে এসিয়ার ধর্ম্ম ইউরোপে গ্রাহ্য হ'ত কি না, সে বিষয়েও আমার সন্দেহ আছে। ভাষার শক্তিতে আমি এতটাই বিশ্বাস করি। এদেশের বৌদ্ধধর্ম্মও যে দুটি শাখায় বিভক্ত হয়ে পড়েছিল, তার মূলেও ছিল ঐ ভাষার পার্থক্য। মহাযানের ভাষা সংস্কৃত, এবং হীনযানের পালি।

অপরপক্ষে পৃথিবীতে যখন কোন নূতন ধর্ম্মমত জন্মলাভ করে, তখন তার বাহন হয় একটি নূতন ভাষা। বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচারিত হয়েছিল পালিতে, এবং জৈনধর্ম্ম মাগধী প্রাকৃতে।—সুতরাং লুথার যখন খৃষ্টধর্ম্মের নূতন সংস্করণ প্রকাশ কর্‌লেন, তখন তাঁকে ল্যাটিন ত্যাগ করে জর্ম্মাণ ভাষারই আশ্রয় নিতে হল। তিনি এ উপায় অবলম্বন না কর্‌লে Protestantism ইউরোপে একটি স্বতন্ত্র ধর্ম্ম হিসাবে কখনই প্রতিষ্ঠালাভ কর্‌তে পারত না। তার প্রমাণ, ল্যাটিনের অপভ্রংশ যাদের মাতৃভাষা, ইউরোপের সেই সকল জাতি আজিও রোমান ক্যাথলিক; রোমান্স ভাষাই রোমান চর্চ্চের সঙ্গে তাদের মনের প্রধান যোগসূত্র। অপরপক্ষে যে-সকল জাতির ভাষা জর্ম্মাণিক, সেই সকল জাতিই প্রটেষ্টাণ্ট। একই কারণে বাংলা সংস্কৃতের প্রভুত্ব হতে মুক্তিলাভ করেছে। চৈতন্যদেবের আবির্ভাবের পরেই বাংলা সাহিত্যের প্রকৃত অভ্যুদয়ের সূত্রপাত হয়েছে। মহাপ্রভু যেদিন ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মের বিরুদ্ধে বৈষ্ণব ধর্ম্মের, জ্ঞান ও কর্ম্মের উপরে ভক্তির প্রাধান্য প্রচার করতে উদ্যত হলেন, সেদিন তাঁকে সংস্কৃত ত্যাগ করে বাংলার আশ্রয় নিতে হল। চৈতন্যের ধর্ম্ম সংস্কারকে বাংলাদেশের Reformation বলা অসঙ্গত নয়। তারপর এসেছে আমাদের Renaissance;—ইউরোপ একদিন যেমন গ্রীক সাহিত্য আবিষ্কার করে ল্যাটিন ভাষার একাধিপত্য থেকে মুক্তি লাভ করে, আমরাও তেমনি ইংরাজি সাহিত্য আবিষ্কার করে সংস্কৃত ভাষার একাধিপত্য হতে মুক্তি লাভ করেছি,—এবং সে একই কারণে। পশ্চিম ইউরোপে গ্রীক, ধর্ম্মের নয়, বিদ্যাশিক্ষার ভাষা বলেই গ্রাহ্য হয়েছিল;—আমাদের কাছেও ইংরাজি তেমনি, ধর্ম্মের নয়, বিদ্যাশিক্ষার ভাষা বলেই গ্রাহ্য হয়েছে।

ল্যাটিন অবশ্য তাই বলে ইউরোপে বাতিল হয়ে যায় নি ;—সে ভাষার অধ্যয়ন অধ্যাপনা আজও সে দেশে সজোরে চল্‌ছে—কিন্তু সে বিদ্যা-শিক্ষার ভাষা হিসাবে। অবশ্য রোমান ক্যাথলিক-জাতির কাছে সে ভাষা আজও কতকপরিমাণে ধর্ম্মের ভাষা বলে মান্য, কিন্তু প্রধানতঃ বিদ্যাশিক্ষার ভাষা বলেই গণ্য। আমাদের বাঙ্গালীদের কাছে সংস্কৃত আজকের দিনে ঐ হিসাবেই গণ্য ও মান্য।

(১২)

অতএব দেখা গেল যে পরভাষা, তা মৃতই হোক আর বিদেশীই হোক, লোকভাষার উপর প্রভুত্ব করে এই গুণে যে, তা জ্ঞানবিজ্ঞানের ভাষা, এক কথায় বিদ্যাশিক্ষার ভাষা ; বলা বাহুল্য ধর্ম্মের ভাষাও আসলে বিদ্যার ভাষা। অপর বিদ্যার সঙ্গে এ বিদ্যার প্রভেদ এই যে, তা অপরা বিদ্যা নয়—তা হচ্ছে theology, অর্থাৎ ব্রহ্মবিদ্যা। এই গুণেই ইংরাজি আজ বাংলার উপর প্রভুত্ব করছে। এ প্রভুত্ব হতে মুক্তিলাভ করবার একমাত্র উপায় হচ্ছে বাংলাকে বিদ্যাশিক্ষার ভাষা, অধ্যয়ন অধ্যাপনার ভাষা, এক কথায় বিদ্যালয়ের ভাষা করে তোলা। আমাদের উচ্চ আশা এই যে, ভবিষ্যতে বাংলা উচ্চশিক্ষার ভাষা হবে ; শুধু বাল্য বিদ্যালয়ে নয়, বিশ্ববিদ্যালয়েও এ ভাষা পাবে প্রথম আসন, এবং ইংরাজি দ্বিতীয় আসন গ্রহণ করবে। যতদিন বাংলা, হয় বিদ্যা-লয়ের বহির্ভূত হয়ে থাকবে, নয় ইংরাজির অনুচর কিম্বা পার্শ্বচর হিসাবে সেখানে স্থান পাবে,—ততদিন বাংলা সাহিত্য সর্ব্বাঙ্গসুন্দর ও সর্ব্ব-শক্তিশালী হয়ে উঠবে না, এবং বাঙ্গালীর প্রতিভাও ততদিন পূর্ণ বিকাশ

লাভ করবার পূর্ণ সুযোগ পাবে না। সাহিত্যেই জাতীয় মনের প্রকাশ, অতএব সাহিত্যের ঐশ্বর্য্যেই জাতীয় মনের ঐশ্বর্য্যের পরিচয়। আমি পূর্ব্বেই বলেছি, ভাষা ও মন একই বস্তুর এ পিঠ আর ওপিঠ। বাংলা ভাষাকে বিদ্যালয়ের ভাষা করে তোলবার পথে কত এবং কি গুরুতর বাধা আছে, সে বিষয়ে আমি সম্পূর্ণ সচেতন, তৎসত্ত্বেও আমি বলি, সে-সকল বাধা আমাদের অতিক্রম করতেই হবে—নচেৎ বাঙ্গালীর মন চিরকাল অর্দ্ধপক্ক অবস্থাতেই থেকে যাবে। বঙ্গ সাহিত্যের গুরু-গম্ভীর প্রবন্ধনিবন্ধাদি পাঠ করলেই দেখা যায় যে, সে সকল রচনা কোনও অংশে পাকা আর কোনও অংশে কাঁচা। এ সব লেখার সঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষার্থীদের উত্তরপত্রের একটা পারিবারিক সাদৃশ্য আছে। পঠিত পুস্তকের স্মৃতি লেখকদের যেখানে অক্ষুণ্ণ, সেখানে লেখা পাকা, আর যেখানে ক্ষুণ্ণ, সেখানে কাঁচা। রবীন্দ্রনাথের কাব্যে যে মনের পরিচয় পেয়ে ইউরোপ যুগপৎ বিস্মিত ও মুগ্ধ হয়ে গিয়েছে, সেই পক্ককষায় মন আমাদের শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে একান্ত দুর্লভ। এর কারণ, আমাদের মনকে দিবারাত্রি পরভাষার জাগ দিয়ে অকালপক্ক করে তোলা হচ্ছে।

বিদ্যালয়ের ভাষা না হলে আমাদের ভাষা যে তার পূর্ণশ্রী পূর্ণশক্তি লাভ করবে না, একথাও যেমন সত্য;—অপরপক্ষে আমাদের সাহিত্য, জ্ঞান বিজ্ঞানের সাহিত্য না হলেও যে তা বিদ্যালয়ে গ্রাহ্য হবে না, এ কথাও তেমনি সত্য। বঙ্কিমচন্দ্র বঙ্গদর্শনের পত্রসূচনায় লিখেছেন—

"এদিকে কোন সুশিক্ষিত বাঙ্গালিকে যদি জিজ্ঞাসা করা যায় "মহাশয় আপান বাঙ্গালি, বাঙ্গালা গ্রন্থ বা পত্রাদিতে আপনি এত হতাদর কেন"? তিনি উত্তর করেন "কোন্ বাঙ্গলা গ্রন্থে বা পত্রে আদর

করিব ? পাঠ্য রচনা পাইলে অবশ্য পড়ি”। আমরা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করি যে এ কথার উত্তর নাই”।

আজকের দিনে বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষেরা যদি আমাদের ঐরূপ প্রশ্ন করেন, তাহলে আমাদেরও মুক্তকণ্ঠে না হোক্ রুদ্ধকণ্ঠে স্বীকার কর্‌তে হবে যে, সে প্রশ্নের উত্তর নেই। তবে আমাদের এ ক্ষেত্রে কর্ত্তব্য যে কি, সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই;—বাংলা ভাষায় আমাদের বিদ্যার সাহিত্য গড়ে তুলতে হবে, এবং সে জন্য বহু শিক্ষিত লোককে কায়মনোবাক্যে বহুদিন ধরে পরিশ্রম কর্‌তে হবে। ইতি-মধ্যেই আমাদের মধ্যে কেউ কেউ মাতৃভাষাতেই ইতিহাস এবং দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধসকল রচনা কর্‌তে প্রবৃত্ত হয়েছেন; কিন্তু সে সাহিত্যের যে তেমন কিছু গৌরব কিম্বা সৌরভ নেই তার কারণ, একদিকে ইংরেজি ভাবের আর একদিকে সংস্কৃত ভাষার চাপের মধ্যে পড়ে, আমরা অকুণ্ঠিত চিত্তে ভাবতেও পারি নে, মুক্তহস্তে লিখতেও পারি নে।

(১৩)

উপসংহারে আমার বক্তব্য এই যে, মৃতভাষা ও পরভাষার প্রভুত্ব থেকে মাতৃভাষাকে আমি মুক্ত কর্‌তে চাই বলে, এ ভুল যেন কেউ না করেন যে, আমি সংস্কৃত ও ইংরাজির পঠনপাঠন বন্ধ করে দিতে চাই। আমার বিশ্বাস, তা করলে বঙ্গ সাহিত্যে ইভলিউসান হওয়া দূরে থাক্, একটা বিষম ও সম্ভবত ভীষণ reversion এসে পড়বে। সংস্কৃত ও ইংরাজি সাহিত্যের চর্চ্চা থেকেই আমরা সেই মনের বল ও হাতের কৌশল লাভ কর্‌ব, যা আমাদের সাহিত্যের মুক্তির কারণ হবে।

বর্ত্তমানে ইউরোপের সকল ভাষাই গ্রীক ল্যাটিনের অধীনতা হতে মুক্তিলাভ করেছে, কিন্তু তাই বলে সে দেশে গ্রীক ল্যাটিনের অধ্যয়ন অধ্যাপনা বন্ধ হয় নি। বরং সাহিত্য-রাজ্যে ইউরোপের এই স্বদেশী যুগে উপরোক্ত দুটি ক্ল্যাসিকের চর্চ্চা যত গভীর ও বিস্তৃত হয়েছে, ক্ল্যাসিক শাসিত যুগে তার সিকির সিকিও হয় নি।

যদি জিজ্ঞাসা করা যায় যে ক্লাসিক চর্চ্চা করবার সার্থকতা কি? তাহলে সে দেশের কাব্যরসের রসিক উত্তর দেবেন যে, ঐ দুটী প্রাচীন ভাষায় যে কাব্যামৃত সঞ্চিত রয়েছে, তার রসাস্বাদ না করলে মানব জনম বিফল হয়; দার্শনিক বলবেন, মনের উদারতা ও হৃদয়ের গভীরতা লাভ করবার জন্য অতীতের সাহিত্যের পরিচয় লাভ করা একান্ত প্রয়োজন; বৈজ্ঞানিক প্রমাণ করতে উদ্যত হবেন যে, অতীতের সভ্যতার সঙ্গে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে পরিচয় না থাকলে, আমরা বর্ত্তমান সভ্যতার যথার্থ প্রকৃতি ও মতিগতির পরিচয় পাব না, কেননা বর্ত্তমান ক্রমগঠিত হয়েছে অতীতের গর্ভে; এবং আর্টিষ্ট দেখিয়ে দেবেন যে, ক্লাসিক সাহিত্যের এমন একটী গুণ আছে, যা বর্ত্তমান সাহিত্যে পাওয়া দুর্ঘট—এবং সে গুণের নাম হচ্ছে আভিজাত্য। এ সকল উক্তিই সত্য; সুতরাং সংস্কৃত ভাষা ও সংস্কৃত সাহিত্যের সম্যক চর্চ্চা আমাদের চিরদিনই করতে হবে। বলা বাহুল্য পৃথিবীর অসংখ্য মৃতভাষার মধ্যে, গ্রীক ল্যাটিন ও সংস্কৃত, এই তিনটী আর্য্য ভাষাই ক্লাসিক—অপর কোনোটীই নয়। এ স্থানে একটী কথার উল্লেখ করা দরকার। অলঙ্কারশাস্ত্রের ভাষায় বলতে গেলে, ইউরোপে গ্রীক ল্যাটিনের বাণী সেকালে ছিল প্রভুসম্মিত, একালে তা হয়েছে সুহৃদসম্মিত,—অর্থাৎ আগে যা ছিল বেদবাক্য, এখন তা হয়েছে

ন্যায়কথা। আশা করি কালে সংস্কৃতসরস্বতীর বাণীও আমাদের কাছে তার প্রভুসম্মিত চরিত্র হারিয়ে সুহৃদ্‌সম্মিত হয়ে উঠবে। তা যে দূর ভবিষ্যতেও কান্তাবাণী হয়ে উঠবে, সে ভয় পাবার কোনও কারণ নেই। এই তিনটী ক্লাসিকের মহা গুণ এই যে, তার প্রত্যেকটীই পুরুষালি সাহিত্য, মেয়েলি নয়;—সে সাহিত্যে আধ আধ ভাষ, কিম্বা গদগদ ভাষের স্থান নেই, সে সাহিত্য যেখানে কোমল সেখানে দুর্ব্বল নয়, যেখানে সানুরাগ সেখানে সানুনাসিক নয়। এ কারণেও সংস্কৃতের চর্চ্চা আমাদের পক্ষে অত্যাবশ্যক এবং অবশ্যকর্ত্তব্য, কেননা বাংলার বাণীর কান্তাসম্মিত হয়ে পড়বার দিকে একটা স্বাভাবিক ঝোঁক এবং রোখ আছে।

আজকের দিনে ইউরোপের কোনও ভাষাই অপর কোনও ভাষার আওতায় পড়ে নেই,—সে ভূভাগে এখন সবাই স্বাধীন, সবাই প্রধান,—অথচ সে দেশের শিক্ষিত সম্প্রদায় এই জাতি-স্বাতন্ত্র্যের যুগেও স্বদেশী ভাষা ব্যতীত আরও অন্তত দুটি তিনটি বিদেশী ভাষা সাগ্রহে এবং সানন্দে শিক্ষা করেন। এর কারণ কি?—এর কারণ, সভ্যজগতের এ জ্ঞান জন্মেছে যে, মানুষের মনোজগৎ কেউ আর এক হাতে গড়ে নি, এর ভিতর নানা যুগের নানা দেশের হাত আছে। সে কারণ, বিদেশী ভাষা ও বিদেশী সাহিত্যের চর্চ্চা ছেড়ে দিলে, মানুষকে মনোরাজ্যে একঘরে এবং কুনো হয়ে পড়তে হয়। একমাত্র জাতীয় সাহিত্যের চর্চ্চায় মানুষের মন জাতীয় ভাবের গণ্ডীর মধ্যেই থেকে যায়, এবং এ বিষয়ে বোধহয় দ্বিমত নেই যে, মনোরাজ্যে কূপমণ্ডুক হওয়াটা মোটেই বাঞ্ছনীয় নয়,—সে কূপের পরিসর যতই প্রশস্ত, ও তার গভীরতা যতই অগাধ হোক না কেন। এবং এ কথাও অস্বীকার

করবার জো নেই যে, যে-জাতি মনে যতই বড় হোক্ না কেন, তার মনের একটা বিশেষরকম সঙ্কীর্ণতা আছে, এবং তার মনের ঘরের দেয়াল ভাঙবার জন্য বিদেশীমনের ধাক্কা চাই। বিদেশীর প্রতি অবজ্ঞা, বিদেশী মনের অজ্ঞতা থেকেই জন্মলাভ করে—এবং এই সূত্রে; জাতির প্রতি জাতির দ্বেষ হিংসাও প্রশ্রয় পায়। অপরের মনের সম্পর্কে এলে, তার সঙ্গে মনের মিল হওয়াটা মানুষের পক্ষে স্বাভাবিক; কেননা তখন দেখা যায় যে, অপর জাতির লোকরাও আসলে মানুষ, এবং অনেকটা আমাদের মতই মানুষ। সুতরাং বিদেশী সাহিত্যের চর্চ্চায়, শুধু আমাদের মন নয়, হৃদয়ও উদারতা লাভ করে,—আমরা শুধু মানসিক নয়, নৈতিক উন্নতিও লাভ করি। অতএব মনোজগতে যথার্থ মুক্তি লাভ করতে হলে, আমাদের পক্ষে বিশ্বমানবের মনের সংস্পর্শে আসা দরকার। সত্য কথা এই যে, মনোজগতে বৈচিত্র্য থাকলেও কোনও দেশভেদ নেই; আমরা আমাদের মনগড়া বেড়া দিয়ে তার মনগড়া ভাগ-বাটোয়ারা করি,—সত্যের আলোকে এ সব অলীক প্রাচীর কুয়াশার মত মিলিয়ে যায়। এ কথা আমি বিশ্বাস করি বলে, আমার মতে, আমাদের পক্ষে শুধু ইংরাজি নয়, সেই সঙ্গে ফরাসি এবং জর্ম্মাণও শেখা দরকার। ইংরাজি ভাষা অবশ্য সমগ্র ইউরোপের সমস্ত জ্ঞান ও চিন্তা আমাদের মনের ঘরে পৌঁছে দিচ্ছে, কিন্তু অনুবাদের মারফৎ সাহিত্য পড়া গ্রামোফোনের মারফৎ গান শোনার মত; অর্থাৎ ও উপায়ে মানুষের প্রাণের কথা আমাদের কাণে যন্ত্রধ্বনি আকারে এসে পৌঁছয়। সে যাই হোক্, আজকের দিনে ইংরাজির চর্চ্চা ত্যাগ করলে বিশ্বমানবের বিদ্যালয়ের প্রবেশ-দ্বার স্বহস্তে বন্ধ করে দেওয়া হবে। বাংলা আমাদের শিক্ষার প্রধান

ভাষা হলে ইংরাজি-বাণী আর প্রভুসম্মিত থাক্‌বে না, সুহৃদসম্মিত হয়ে উঠবে—প্রভু তখন যথার্থ সখা হয়ে উঠবে। আর একটি কথা বলেই আমি আমার প্রবন্ধ শেষ করব।

(১৪)

আজকের দিনে ভারতবাসীর মুখে "স্বরাজ" ছাড়া অপর কোনও কথা নেই। দেশের স্বরাজ্য পরের কাছে হাত পেতে পাওয়া যায় কি যায় না, তা আমি বলতে পারি নে; কিন্তু এ কথা আমি খুব জোরের সঙ্গে বল্‌তে পারি যে, মনের স্বরাজ্য নিজহাতে গড়ে তুলতে হয়। তারপর দেশের স্বরাজ্য ইংরাজি ভাষার প্রতাপে লাভ করা গেলেও, মনের স্বরাজ্য একমাত্র স্বভাষার প্রসাদেই লাভ করা যায়। সুতরাং সাহিত্যচর্চ্চা আমাদের পক্ষে একটা সখ নয়, জাতীয় জীবন গঠনের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উপায়—কেননা এ ক্ষেত্রে যা কিছু গড়ে উঠবে, তার মূলে থাকবে জাতীয় আত্মা এবং জাতীয় কৃতিত্ব।

এক জাতের বুদ্ধিমান লোক আছেন যাঁরা বলেন যে, আমাদের পক্ষে একটা বড় সাহিত্য গড়ে তোলবার চেষ্টাটা সম্পূর্ণ বৃথা। তাঁদের মতে সাহিত্যের অভ্যুদয় জাতীয় অভ্যুদয়কে অনুসরণ করে। এবং নিজের মতের স্বপক্ষে তাঁরা Pericles-এর Athens, Augustus-এর রোম, Elizabeth-এর ইংলণ্ড এবং Louis xiv-এর ফ্রান্সের নজির দেখান। এ মত গ্রাহ্য করার অর্থ, আত্মার উপর বাহ্যবস্তুর শক্তির প্রাধান্য স্বীকার করা। কিন্তু অদৃষ্টবাদ মানুষের পুরুষকারকে খর্ব্ব করে, অতএব বিজ্ঞানসম্মত হলেও তা অগ্রাহ্য। সুখের বিষয় এ মত মেনে নেবার কোনও বৈজ্ঞানিক কারণ নেই। যদি সাহিত্যের

অভ্যুদয় একমাত্র রাষ্ট্রশক্তির উপর নির্ভর করত, তাহলে অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে জর্ম্মাণীতে অমন অপূর্ব্ব সাহিত্যের সৃষ্টি হত না, কারণ সে যুগে জর্ম্মাণীর রাষ্ট্রীয়শক্তি শূন্যের কোঠায় গিয়ে পড়েছিল। নেপোলিয়ান যেদিন সমবেত জর্ম্মাণ জাতিকে পদদলিত করে Jena নগরে প্রবেশ করেন, সেদিন সে নগরে গেটে ও হেগেল উভয়েই উপস্থিত ছিলেন, এবং সম্ভবত এঁদের একজন কাব্যের, আর একজন দর্শনের ধ্যানে মগ্ন ছিলেন; কেননা বিজয়ী ফরাসিদের তোপের গর্জ্জন যে এঁদের যোগ-নিদ্রা ভঙ্গ করেছিল—এ কথা ইতিহাসে লেখে না। আর এ যুগে জর্ম্মাণ জাতি সাংসারিক হিসেবে অপূর্ব্ব অভ্যুদয় লাভ করেছে, কিন্তু জর্ম্মাণ সাহিত্য সে অভ্যুদয়ের অনুসরণ করে নি। বরং সত্য কথা এই যে, সে দেশে লক্ষ্মীর আস্ফালনে সরস্বতী পৃষ্ঠভঙ্গ দিয়েছেন।

আসল ঘটনা এই যে, যুগবিশেষে দেশবিশেষের জাতীয় আত্মা যখন সজ্ঞান ও সক্রিয় হয়ে ওঠে, তখন কি সাহিত্য কি সমাজ সবই এক নূতন শক্তি লাভ করে, এক নূতন মূর্ত্তি ধারণ করে। তখন জাতির আত্মশক্তি নানা দিকে নানা ক্ষেত্রে বিকশিত ও প্রস্ফুটিত হয়ে ওঠে। Pericles-এর Athens প্রভৃতি এই সত্যের নিদর্শন। কিন্তু এমন হওয়া আশ্চর্য্য নয় যে, জাতীয় আত্মা প্রবুদ্ধ হয়ে উঠলেও অবস্থার গুণে বা দোষে তা বিশেষ একটা দিকেই মাথা তুলতে পারে,—হয় সাহিত্যের দিকে, নয় শিল্পবাণিজ্যের দিকে। সুতরাং জাতি হিসাবে আমরা শক্তিশালী নই বলে, আমাদের সাহিত্য-সৃষ্টির চেষ্টা যে বিড়ম্বনা, তা হতেই পারে না। তা ছাড়া সাহিত্যের প্রধান কাজই যখন জাতীয় আত্মাকে প্রবুদ্ধ করা—তখন তার অবসর চিরকালই

আছে। আমার শেষ কথা এই যে, বাংলার ভবিষ্যৎ ও বাঙ্গলীর ভবিষ্যৎ মূলে একই বস্তু।

শ্রীপ্রমথ চৌধুরী।

বাংলার বেখাপ বর্ণমালা।

——ঃ০ঃ——

হরিকে সে কেন অরি বলে, এক চাষার কাছে কৈফিয়ৎ চাওয়ায় সে উত্তর করে—"কইতে কই অরি কিন্তু নিক্‌তে নিকি অরি!" আমরা, বাঙালীরা, কইতে কই বাংলা, কিন্তু লিখ্‌তে লিখি সংস্কৃত—অন্তত, লেখবার বেলা সংস্কৃত-গোচের একটা সাধু-ভাষার চর্চ্চা ক'রে আসা গেছে; যাতে ক'রে অনেক সময়, দ্বিজু রায়ের গানের গ্রন্থকারের রচনার মত, "দিনের মত বিষয় হত রাতের মত অন্ধকার, জলের মত বিষয় হত ইঁটের মত শক্ত!"

বাংলা ব্যাকরণ সংস্কৃত ব্যাকরণ নয়, এ সহজ তত্ত্বের ইঙ্গিতমাত্র করলে কিছুদিন আগে হৈ-হৈ রৈ-রৈ ব্যাপার বেধে যেত। ক্রমে, কি ভাগ্যি, সত্যি কথাগুল আমাদের দেশের লোকের গা-সওয়া হয়ে আস্‌ছে। বাঙালীর বুকের পাটা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে বাংলা ভাষাটাও ক্রমশ নিজমূর্ত্তি ধ'রে সেবকদের কাছে দেখা দিচ্ছে।

সংস্কৃত-ছাঁদে চলবার চেষ্টা ক'রে বাংলা ভাষার যে দুর্গতি হয়েছে তার খবর আমরা মাঝে মাঝে সবুজ পত্রের পাতায় সম্পাদক মশায়ের কলম থেকে পেয়ে থাকি। সম্প্রতি, যে গবেষণার ফলে শ্রীযুক্ত সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায় প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ বৃত্তি পেয়েছেন, তার এক অংশ দেখার সুযোগ ঘটায়, খাঁটি বাংলায় যত রকমের শব্দ শোনা যায় তার লিপি হিসেবে সংস্কৃতের নকল-করা বর্ণমালা কতটা খাপ-ছাড়া, তা বুঝতে আর বাকি নেই।

পাঁচ ভাষার ব্যাকরণ চর্চ্চায় সুনীতি বাবু যে অধ্যবসায় দেখিয়েছেন, সূক্ষ্ম আওয়াজ কানে ধরবার, মিশল আওয়াজ ছাড়িয়ে দেখবার তাঁর যে অসাধারণ ক্ষমতার পরিচয় পাওয়া যায়, তাতে ভরসা হয় যে এত দিন পরে একটা সর্ব্বাঙ্গসম্পূর্ণ বাংলা ব্যাকরণ জুটবে। গ্রন্থটা শেষ হতে দেরী লাগবে, বর্ণমালা সম্বন্ধে যেটুকু হয়েছে তাও প্রকাশ হয় নি। সুতরাং তা থেকে দু-চারটি কৌতুকের কথা তুলে নিয়ে আমার এ প্রবন্ধের কাজে লাগিয়ে নিলে দোষ কি?

পণ্ডিতী ভাষায় লিখতে থাকলে পাণ্ডিতী বর্ণমালার ত্রুটি বড় ধরা পড়ে না। মুখের কথার শব্দগুলি লেখায় ঠিকমত আনবার চেষ্টা করলে তবেই ফ্যাসাদে পড়তে হয়। তখন টের পাওয়া যায় যে ছেলে-বেলার মুখস্থ বর্ণমালা গোড়ায় বাংলা ভাষার জন্যে তৈরী হয় নি। সাহেবের সামনে বার করবার জন্যে শিশু বাংলা ভাষাকে সস্তায় পাওয়া ready-made পোষাকে সাজ'তে গিয়ে তার চেহারাও খোল্‌তাই হয় নি, তার অবাধে চলা-ফেরাও মুস্কিল হয়ে পড়েছে।

প্রথমত, বাংলা কথা কইতে যত রকমের যতগুলি আওয়াজ মুখ দিয়ে বার হয়, বিদ্যাসাগরের বর্ণপরিচয়ের বর্ণমালা দিয়ে তা ত লিখে দেখাবার উপায় নেই। আবার এই বর্ণমালায় কোন কোন শব্দের একের বেশী অক্ষর থাকায়, কোন্‌টি কোথায় খাটে তা বুদ্ধি খাটিয়ে জানবার যো নেই; হয় সকলে মিলে, চোখ বুজে, একই বদভ্যাস বজায় রাখা, নয় নানা মুনির নানা মত ফলান, এ দুই দোষের মধ্যে একটা এসে পড়ে। তার উপর এমন অক্ষরও সব আছে যারা

* এ প্রবন্ধে শব্দ কথাটা সংস্কৃত অর্থে ব্যবহার হচ্ছে না। পাঠকরা অনুগ্রহ ক'রে ওর বাংলা মানে "আওয়াজ" যেন ধ'রে নেন।

বেকার ব'সে থেকে জায়গা জুড়ে আছে মাত্র। লাভের মধ্যে, বানান শিখতে ছেলেদের মাথা ঘুরে যায়, ছাপাখানার ঝঞ্ঝাট ও খরচ বাড়ে, আর বাংলা typewriter অভ্যুদয়ের পথে কাঁটা পড়ে।

বর্ণপরিচয়ের হাল সংস্করণে অসংযুক্ত ব্যঞ্জনবর্ণের ফর্দ্দে ৪০টি অক্ষর দেখা যায়। পাঁচ বর্গের পাঁচটি ক'রে ২৫ ; য থেকে হ পর্য্যন্ত ৮ ; আর হ-র পর ড় ঢ় য় ৎ ং ঃ ँ এই ৭টি। সাধে বলি পণ্ডিতী-বর্ণমালা! যতক্ষণ সংস্কৃতের নকল চল্‌ছিল ততক্ষণ এক রকম ছিল। কিন্তু হসন্ত ত-কে খণ্ড-ত নাম দেওয়াই বা কি, আর তাকে বর্ণমালায় আলাদা স্থান দেওয়াই বা কি, কার সহজ বুদ্ধিতে আসৃত? হাতের লেখার আমলে স্বধু ত-য়ে হসন্তের চিহ্ন কেন, হ-য়ে উকার, ভ-য়ে রফলা, ট-য়ে ট-য়ে, প্রভৃতি, হাতের টানে অক্ষরে-চিহ্নে জড়িয়ে, কত নতুন রকমের চেহারা দাঁড়াত—সবগুলি যে আলাদা অক্ষর ব'লে বর্ণমালায় ঢুকে পড়ে নি, এই ভাগ্যি! ছেলেবেলায় ক্ষ ও জ্ঞ-কে এ রকম অনধিকার প্রবেশ করতে দেখা গিয়েছিল, আজকাল তারা বর্ণপরিচয়ের প্রথম ভাগ ছেড়ে যুক্তাক্ষরের মধ্যে স্বস্থানে প্রস্থান ক'রে বাঁচিয়েছে।

সে যা হোক্, সংস্কৃত আদর্শের মায়া কাটিয়ে, ছেলেবেলার মুখস্থ ভুলে, একমাত্র বাংলা উচ্চারণের হিসেবে যদি একটি বর্ণমালা বা শব্দ-মালা খাড়া করা যায়, তাহলে যা দরকার নেই তা বাদ দিলে, যা অভাব আছে তা যুগিয়েও ঐ ৪০ অক্ষরের কমেই কাজ চলে। আলোচনার স্ববিধের জন্যে বাংলার শব্দসকল আমার পছন্দমত ৯টি বর্গে ভাগ ক'রে সাজান যাক্। আমার এ ফর্দ্দ থেকে ফাজিল অক্ষর সব বাদ দিয়ে, নাজাই অক্ষরের কাজ চলিত অক্ষরে ফুট্‌কি প্রভৃতি চিহ্ন যোগে সেরে নেওয়া যাচ্ছে।

১।	ক-বর্গ—ক, খ, গ, ঘ।	...	...	৪
২।	চ-বর্গ—চ, ছ, জ, ঝ।	...	...	৪
৩।	ট-বর্গ—ট, ঠ, ড, ঢ।	...	...	৪
৪।	ত-বর্গ—ত, থ, দ, ধ। (ৎ=হসন্ত ত মাত্র)			৪
৫।	প-বর্গ—প, ফ, ব, ভ।	...	...	৪
৬।	ँ-বর্গ—ँ, ন, ম, ঙ। (ং=হসন্ত ঙ মাত্র)			৪
৭।	য়-বর্গ—য়, র, ল, ড়, ঢ়, ব (w)।		...	৬
৮।	শ-বর্গ—শ, স, চ় (ts), জ় (z)।		...	৪
৯।	হ-বর্গ—হ, guttural খ় ফ় (f), ভ় (v)। (ঃ=হসন্ত হ)		...	৪
				মোট—৩৮

আমার এই বর্গগুলির মধ্যে প্রথম ৫টি মামুলী, তাদের মধ্যে বিশেষত্ব কিছু নেই। চলিত বর্ণমালার অক্ষরগুলি এ স্থলে ঠিকমত কাজই দিচ্ছে—প্রত্যেক শব্দের একটি ক'রে অক্ষর, প্রত্যেক অক্ষরের একমাত্র শব্দ। কিন্তু বাদবাকি বর্গগুলিতে কিছু বা পুরোণ বিদায়, কিছু বা নতুন আমদানী হয়েছে, সে সব কথা খুঁটিনাটি ক'রে বলা দরকার।

ँ বর্গ

চন্দ্রবিন্দু বে-ভেজাল খাঁটি নাকিসুরের চিহ্ন, তাই ওকে বর্গের মাথায় বসিয়ে ওর নামে বর্গের নাম দেওয়া গেল। তবে চন্দ্রবিন্দুতে বাংলা ব্যঞ্জন-শব্দের একটি গুণ নেই, অর্থাৎ ওর সঙ্গে অপর ব্যঞ্জন শব্দের দ্বিত্ব না হয়েই যোগ হয়। দাঁতে জীভ চেপে নাকি আওয়াজ করলে ন্ (n) বেরয়, ঠোঁট চেপে করলে ম্ (m)। ঞ ও ণ-র বাংলায়

আলাদা শব্দ কিছু নেই, ওদের কাজ অপর অক্ষর যোগে চালিয়ে নেওয়া যায়, তাই ফর্দ্দ থেকে এ দুটি বাদ পড়্‌ল।

অপর ব্যঞ্জন-বর্ণের সঙ্গে যুক্ত থাক্‌লে ঞ-র শব্দ ঠিক দন্ত্যন-র মত। মঞ্চ = মন্‌চ, গঞ্জ = গন্‌জ, ঝঞ্ঝন্ = ঝন্‌ঝন্। ঞ একলা পড়লে য়ঁ ছাড়া আর কিছু নয়—ডেঞে = ডেয়েঁ। যাচ্ঞা কথায় ঞ ন-র মত হয়ে যায় (যাচিন্না)। ঞ-র খাঁটি আওয়াজ হিস্পানী Señor প্রভৃতি য়ুরোপীয় ভাষার কথায় আজও পাওয়া যায়, রাঢ়দেশের স্থানে স্থানে যাইঞা খাইঞার মধ্যে ঞ-শব্দ অস্থানে র'য়ে গেছে, কিন্তু কলকাত্তাই বাংলায় তা মোটেই নেই।

ণ-র "আনো" * নাম থেকে অনুমান হয় যে ওর মূর্দ্ধণ্য উচ্চারণের সঙ্গে বাংলার এককালে পরিচয় ছিল। দাক্ষিণাত্যে এই বর্ণ মূর্দ্ধ থেকে উচ্চারণ হয় এবং সেখানে বর্ণমালা আওড়াবার সময় ওকে "অণ" ব'লে পড়া হয়। টাকরার উপর দিকে জীভ নিয়ে যেতে গেলে ণ শব্দ বার হবার আগে একটা অ শব্দ আপনি এসে পড়ে। কিন্তু বাংলায়, এখনকার মত মূর্দ্ধণ্য ণ-কে আবকল দন্ত্যন-র মত উচ্চারণ করতে হলে, ওকে "আনো" নাম দেবার কোন কারণ বা মানে থাকে না। যা হোক্ একালে খাঁটি মূর্দ্ধণ্য ণ শব্দ বাংলা থেকে এমনি লোপ পেয়েছে যে ইচ্ছে করলেও তা বাঙালীর মুখ দিয়ে বার হওয়া ভার।

বাংলার ঙ শব্দ ন-য়ে গ-য়ে মোলায়েম মিলনের ফল। বাংলা কথায় যে-কোন দুই ব্যঞ্জন বর্ণের যোগ হলে একটি ঝোঁক এসে পড়ে,

---

* ছেলেদের পাখী-আঁকার ছড়া—

এক ছিল আনো

তার পিঠে চেপেছে দানো। ইত্যাদি।

যার ফলে যুক্তশব্দের একটির (প্রায়ই দ্বিতীয়টির)* দ্বিত্ব হয়। কর্জ্জা দুই জ দিয়েই লিখি, আর এক জ দিয়ে কর্জা লিখি, উচ্চারণের বেলা জ-টি ডবল না হয়ে যায় না। কিন্তু ঙ শব্দে গ-র দ্বিত্ব না হয়েই ন-য়ে গ-য়ে যোগ হয়েছে, তাই বর্ণমালার অপর অক্ষর যোগে এ আওয়াজটুকু পাবার যো নেই। গ-র দ্বিত্ব নিয়েই ঙ-য় ঙ্গ-য় প্রভেদ এবং সেই কারণেই কলকাতাই উচ্চারণে যাঁদের কান তৈরী তাঁরা আজকাল বাঙ্গালী ও বাঙ্গলা না লিখে বাঙালী ও বাংলা লিখতে বাধ্য হন।

য়-বর্গ

যে অক্ষরটাকে অন্তস্থ য বলা হয় (সে যখন কথার আদ্যন্তমধ্যে সমভাবে বিরাজ করে তখন তার অন্তস্থ নাম ঘুচিয়ে দিলে মন্দ হয় না) তার আওয়াজ বর্গীয় জ থেকে কোন অংশে ভিন্ন নয়, কাজেই এ অক্ষর আমার শব্দমালায় স্থান পেতে পারে না। অন্তস্থ-য বাদ দিয়েও, এই তরল য়-বর্গে অপর সকল বর্গের চেয়ে শব্দসংখ্যা' বেশী। বিদেশের লোকে যে বাংলা কথাকে শুনতে মিষ্টি বলে, সেটা হয়ত এই তরল শব্দের প্রাচুর্য্যে।

বাংলা য় ইংরেজী y-র কাজ করা সম্বন্ধে সুনীতি বাবুর মনে কেমন যেন একটু কিন্তু র'য়ে গেছে যার তাৎপর্য্য আমি ঠিক ধরতে পারি নি। পূর্ব্বে য় (yaw) অক্ষরকে অন্তস্থ-অ বলা হত, এবং হয়ত তার উচ্চারণ অ-র মতই ছিল। কিন্তু আজকাল ছায়া বায়ুর ত কথাই নেই, কেয়ূর, ময়ূরকেও বেশীর ভাগ শিক্ষিত লোকে কেউর, মউর না ব'লে keyur,

---

* য-ফলা, ব-ফলা, ম-ফলা যোগ হলে ফলাটি লোপ বা লুপ্তপ্রায় হয়ে যুক্তবর্ণের প্রথমটির দ্বিত্ব হয়—যেমন প্রাপ্য (প্রাপ্প), অশ্ব (অশ্‌শ), পদ্ম (পদ্দ)। র-ফলা অবশ্য লোপ হয় না—যেমন অপ্রিয় (অপ্‌প্রিয়)।

mayur বলবে। সুতরাং য়ুরোপ (Europe) কে ঘুরিয়ে ইউরোপ লেখার কোনই আবশ্যক নেই। Y-শব্দের সঙ্গে বাংলার কোন বিরোধ দূরে থাক্, এটা বাঙালীর বিশেষ প্রিয়পাত্র ব'লেই ত মনে হয়। সুনীতি বাবু দেখিয়েছেন যে এ শব্দটা মীড়ের মত বাংলা গানের কথার কাঁটা খোঁচা মেরে দেবার কাজে লাগে। আমাদের সঙ্গীতে যেমন এক স্বর থেকে আর স্বরে মীড়ের টানে বেমালুম যাতায়াৎ করা হয়, বাংলা গানের কথা সুরে গাইতেও তেমনি, এক স্বরবর্ণের পিঠ-পিঠ অপর স্বর উচ্চারণ করতে হলে য়-মীড় দিয়ে আওয়াজটা নরম করে নেওয়া হয়। মা-আমার গাইতে মা-য়-আমার বেরিয়ে যায় ; কে-আসে কে-য়-াসে হয়ে পড়ে।*

দেবনাগরী ব-র বা ইংরেজী w-র শব্দ (বাংলা অক্ষরে যা পেট-কাটা ব দিয়ে লেখা যেতে পারে) কম হলেও আছে। ফার্সী থেকে নেওয়া (newa) কথায় এ শব্দ বেশীর ভাগ পাওয়া (pawa) যায়— যেমন হাওয়া (hawa), খাওয়া (khawa)। ও আর য় মিলিয়ে w শব্দটাকে জবড়জং ক'রে না লিখে, ব দিয়ে লিখলেই ত বেশ পরিষ্কার হয়—যেমন মারবাড়ী, কাবুলিবালা। তবে বিনা আমাদের দেশে ভাল ব'লে স্বীকার আর কাজে করার মধ্যে অন্তরায়টা কিছু ভীষণ গোচের।

শ-বর্গ

মূর্দ্ধণ্য ষ-শব্দ ণ-শব্দেরই মত বাংলা থেকে লোপ পেয়েছে। এখন ওটা বাঙালীর পক্ষে ইচ্ছে করলেও উচ্চারণ করা কঠিন।

---

* তা ছাড়া, য়-শব্দের যোলায়েম অমায়িকতার গুণে বাংলা ভাষায় "য়ে" কথাটা কি না করতে পারে? কড়া কথাকে মিঠে করা, মগজের খাটনি বাঁচিয়ে জীভ-চালাবার সুখ ভোগের ব্যবস্থা করা, বক্তার বুদ্ধির অভাব শ্রোতাকে পূর্ণ করতে বাধ্য করা, প্রভৃতি ওর অসাধ্য কর্ম কিছু নেই।

দন্ত্য-স (ইং s) শব্দটা বাংলায় এক পক্ষে কম বটে, কিন্তু অপর পক্ষে যেটুকু আছে তা নিজস্ব অক্ষর ছাড়িয়ে তালব্য শ ও মূর্দ্ধন্য ষ এদেরও এলাকার অংশ জবর-দখল করেছে—যেমন শ্রী (sri), শ্রম (srom), ষ্ট্যাম্প (stamp), ষ্টেশন (station)। ইংরেজী কথা বাংলায় লিখতে যখন বানানটা ইচ্ছেমত করার বাধা নেই, তখন স্ট্যাম্প, স্টেশন লিখে s-শব্দটাকে ওর আসল দন্ত্য-স চিহ্ন দিতে আপত্তি কি? এ শব্দ পূর্ব্ববঙ্গে ছ দিয়ে লেখা হয়—যেমন ছোলেনামা (solenama); কিন্তু ছোলে লিখলে কলকাতায় solay না প'ড়ে chholay পড়বে। যে দিক দিয়েই দেখা যাক্, দন্ত্যস-র স্ব-শব্দ একেবারে উড়িয়ে দিলে বাংলা লিপিকে মিছিমিছি কানা ক'রে রাখা হয়।

দন্ত্যস-র জায়গাটুকু বাদ দিলে বাংলায় বাকি সব তালব্য শ-র রাজত্ব, তাই এর নামেই বর্গের নামকরণ করা গেল। সবিশেষ কথাটার তিন শ-র উচ্চারণে কোন তফাৎ নেই। এই তিন শ কথাটা শুনলে মারাঠি ভাষী হাসবে, কারণ তার কাছে শ একটি মাত্র, অপর দুটার একটি sa, অন্যটি বাঙালীর অনুচ্চারণীয় মূর্দ্ধন্য ষ,—হিন্দি ভাষায় খ দিয়ে যার কাছাকাছি যাবার চেষ্টা করে (হিন্দি মানুখ্ = মানুষ)।

চ় (ts) শব্দ মোলায়েম ভাবে ৎ ও স যোগের ফল। মারাঠি "চাংলা" কথাটা যাঁরা শুনেছেন তাঁরাই এর খাঁটি রূপ জেনেছেন। পূর্ব্ববঙ্গের চাল, চিঁড়ে, প্রভৃতির উচ্চারণেও এই চ় (ts) পাওয়া যায়। কলকাতাই ভাষায় যে সকল সাধু কথার ছ মুখের কথার চ হয়—যেমন "চলিয়াছি" থেকে "চলেচি"—সেই চ-র উচ্চারণ চ় (ts) হয়, তবে মারাঠি ভাষার মত অতটা স্পষ্ট নয়—চলেচি = choletsi। ব্যঞ্জ

করেও সময় সময় চ-কে ৎ্-শব্দ দেওয়া হয়—যেমন চমৎকার (tsomot-kar) আর কি।

জ্ (z) শব্দ কলকাতাই উচ্চারণে চলিত নেই ব'লে হঠাৎ মনে হতে পারে, কিন্তু সাজতে (shazte), বুঝতে (buzte), মেজ্‌দা (mezda) নমুনাগুলি পেলে আর সন্দেহ থাকে না।

হ-বর্গ

প্রশ্বাসের নানা শব্দে হ বর্গের উৎপত্তি। অবাধে শ্বাস ছাড়লে শুদ্ধ হ জন্মায়। শ্বাস গলায় বাধা পেলে আর্বী ফার্সী ধরণের guttural খ্, এবং ঠোঁটে বাধা পেলে ঠোঁটের ভঙ্গী ভেদে ফ্ (f) ও ভ্ (v) শব্দের উৎপত্তি হয়।

বাংলায় খ্-র guttural (ঘড়্‌ঘড়ে) শব্দ শুনতে হলে চাঁটগাঁয় যেতে হয়। কলকাতাই উচ্চারণে এ শব্দ দৈবাৎ শোনা যায় মাত্র—যেমন বিরক্তির আঃ (আখ্)।

ফ্ (f) আওয়াজটা বাংলা কথার স্বাভাবিক ধ্বনির সঙ্গে তেমন মিশ খায় না। তবে ফার্সীর ছোঁয়াচে এটা বাংলায় ঢুকে রয়ে গেছে—যেমন সাফ্ (saf), তফাৎ (tafat)। কেও কেও ফুলে ফলেও এ শব্দ আন্‌তে চান (ful, fal) কিন্তু সে ফেশনের বে'কুফীকে তারিফ্ করা যায় না।

ভ্ (v) বাংলার একটী বিবাদী আওয়াজ। এর ন্যায্য ব্যবহার একমাত্র হ-য়ে ব-য়ের (হ্ব) উচ্চারণে পাওয়া যায়। মারাঠি ভাষায়ও সম্ভবত তাই; কেননা মারাঠিতে Victoria-কে হ্বিক্টোরিয়া লেখে। বাঙালীর মুখে হ্ব যুক্তাক্ষরটি যথা লিখিতং তথা কথিতং হয় না।

কারও কারও মুখে ওটা ব-য়ে ভ-য়ের মত উচ্চারণ হয়—যেমন বিভ্‌ল (বিহ্বল)। কিন্তু আজকাল কলকাতার শিক্ষিত সমাজের কায়দা হচ্ছে হ ও ব-র জায়গা অদল-বদল ক'রে হ-কে শেষে ফেলা, তারপর ব-কে ভ্ (v) উচ্চারণ করা। তবে সে ভ্ (v) উচ্চারণের মধ্যে একটু রকমারি আছে। যুক্তাক্ষরের বাংলা রীতি অনুসারে ঐ ভ্ (v) টার হ-র যোগে শাদা ভাবে দ্বিত্ব না হয়ে ওটা uv বা ov হয়ে যায়—যেমন, জিহ্বা=jiuvha, গহ্বর=gaovhar। সুনীতি বাবু আশঙ্কা করেন যে ভ্ (v) শব্দ সভ্য উচ্চারণকেও আক্রমণ করবার যোগাড়ে আছে। তা যদি হয় তবে আশা করি অবস্থা এখনও voyonkar হয়ে ওঠে নি—sovvo উচ্চারণের বর্ব্বরতা ভদ্রসমাজে voolay'ও চলবে না!*

বাংলার বিসর্গ বেশীর ভাগ হসন্ত হ মাত্র। সময় বিশেষে হ-বর্গের অপর হসন্ত বর্ণেরও কাজ করে—যেমন, উঃ (uf), আঃ (german ach!)। বাংলা কথার শেষে বিসর্গটার আওয়াজ লোপ পেয়েছে সুতরাং সেখানে ওর ফাঁকা চেহারা দেখিয়ে লাভ কি? বিদ্যাসাগরের আমলে শ্রেয়ঃ স্রোতঃ প্রভৃতি বিসর্গ দিয়ে বানান করা হত, এখন

---

* বাংলা ভাষায় v শব্দের অনধিকার চর্চ্চার মূল সম্বন্ধে আমার Theory এই—

ইংরেজ আমলের আগে এ শব্দ বাঙালীর মুখে আনাও দরকার হত না, জানাও ছিল না। কাজেই রাজভাষার v যখন দায়ে ঠেকে বার করবার চেষ্টা করতে হল, তখন প্রথম প্রথম বাংলা ভ দিয়েই তার কাজ চালিয়ে দিয়ে, Victoria কোনমৎ প্রকারে ভিক্টোরিয়া ব'লে উচ্চারিত হল। ক্রমে, ইংরেজী উচ্চারণ সড়গড় হ'তে, যখন মুখ দিয়ে খাঁটি v কাড়া সম্ভব হ'ল, তখন নতুন বিদ্যের আহ্লাদে দরকারে-বেদরকারে যেখানেই ভ দেখা, সেখানেই v বলার লোভ সামলান মুস্কিল হয়ে পড়ল। তাই বঙ্কিম বাবুর কৃষ্ণকান্তের উইলের নাটকের বিজ্ঞাপনে Vramar! Vramar! ক'রে ক্ষেপিয়ে তোলে। রোগের উৎপত্তি ঠিক করতে পারলে চিকিৎসার বিলম্ব হবে না এই আশায় Theoryটি ব'লে রাখা গেল।

সাবালক ব্যাঙাচীর মত স্রোত বিনা ল্যাজে বেশ চলেছে। তবে আর কেন? আপাতত ক্রমশ প্রভৃতির বিসর্গগুলিকেও কালের স্রোতে ভেসে যেতে দেওয়াই শ্রেয়।

স্বরবর্ণ

বাংলা শব্দের লিপি হিসেবে পণ্ডিতী ব্যঞ্জনবর্ণের চেয়ে স্বরবর্ণের গণ্ডগোল আরও বেশী। বর্ণপরিচয়ে আজকাল অ, আ, ই, ঈ, উ, ঊ, ঋ, ঌ, এ, ঐ, ও, ঔ, এই দশটি স্বরবর্ণ দেখান হয়। এ ফর্দ্দটি অসংযুক্ত স্বরে যুক্তস্বরে, কেজো অক্ষরে বাজে অক্ষরে, এবং তদুপরি আবশ্যক অক্ষরের অভাবে, একটি আলোনা খিচুড়ি বিশেষ।

যুক্তস্বরের মধ্যে শুধু ওই (ঐ), ওউ (ঔ) কেন; আই, উই এই আছে; আউ, ইউ, এউ আছে; আও, উও, এও আছে; একহারা স্বরগুলির উল্টে পাল্টে যত রকম permutation-combination হতে পারে প্রায় তত রকমই আছে। বাকিগুলির জন্যে যখন ভিন্ন ভিন্ন অক্ষরের দরকার হয় নি, তখন ঐ, ঔ, দুটিমাত্র রেখে বাংলা বর্ণমালা ভারী না করলেও চলত।

ঋ ঌ অক্ষর থাক্‌লে কি হবে, বাংলার মধ্যে ওরকম স্বর-শব্দ কোথাও নেই। এ দুটির আওয়াজ র-যে ইকার (রি) ল-য়ে ইকার (লি) হয়ে রয়েছে। তার জন্যে আলাদা অক্ষর কেন? * এ দুটি স্বর-শব্দ আসলে কি (সংস্কৃত ভাষায় যা থাকায় স্বতন্ত্র অক্ষর

* বিকৃতি(bikṛiti)তে বিক্রিতি(bikkriti)তে ক-র দ্বিত্ব ঘটিত উচ্চারণের যে তফাৎ আছে, দুঃখের বিষয় সেটা পড়বার সময় কেও কেও মেনে চলেন না; ব্যঞ্জন র-ফলার মত পূর্ব্ববর্ত্তী ব্যঞ্জন-শব্দের দ্বিত্ব ঘটাতে না পারায় ঋকারের যা একটু স্বত্ব বাংলায়ও রয়ে গেছে।

আবশ্যক হয়েছিল) তাই বা ক'জন বাঙালী খবর রাখে? ঋ হচ্ছে র-র রত্ব অর্থাৎ জীভ কাঁপার মর্ম্মর রব। আর ঌ হচ্ছে ল-র লত্ব অর্থাৎ জীভের ধারে ধারে লালা-কল্লোল কলধ্বনি। ইংরেজী little কথার শেষে ঌ-র আওয়াজ পাওয়া যায়। ফরাসী chambre (উচ্চারণ শাঁব্র্‌) কথার শেষে ঋ। সংস্কৃত আমলে লিট্‌ঌ ও শাঁবৃ লিখ্‌লে এই ইংরেজী ও ফরাসী কথা দুটি ঠিকমত উচ্চারণ হতে পারত, কিন্তু ও ভাবে বানান করলে বাঙালীর দ্বারা তা হবে না।* মোট কথা বাংলার চলিত কোন স্বর শব্দ লিখতে ঋ বা ঌ অক্ষরের কোন প্রয়োজন হয় না।

বাংলার অ সংস্কৃত অ-র মত, হ্রস্ব আ (অা) নয়। আমাদের অ একেবারে আলাদা স্বরশব্দের চিহ্ন যার আওয়াজ ইংরেজী aw দিয়ে বোঝান যেতে পারে।

ইকার ও উকারের যেমন হ্রস্ব দীর্ঘ আছে তেমনি বাংলার অপর সকল স্বরশব্দেরই হ্রস্ব দীর্ঘ আছে, কিন্তু সে সবের জন্যে স্বতন্ত্র অক্ষরের অভাবেও কাজ বেশ চ'লে যাচ্ছে। তাতে বোঝা যায় যে দীর্ঘ ঈ ও ঊ অক্ষর বাহুল্য। এমন কি, ইকার উকারের আলাদা হ্রস্ব দীর্ঘ চিহ্ন না থাক্‌লেই ভাল হত, কারণ বাংলার বানান্ চলে একদিকে উচ্চারণ বলে অপর দিকে, তাতে ক'রে বাংলা ছাত্রের মাথা খারাপ করা ছাড়া এই ফাজিল চিহ্নগুলি আর কোন কাজে লাগে না।

---

* দাক্ষিণাত্যে ঋ, ঌ-কে বাংলা হিন্দির মত রি, লি উচ্চারণ না ক'রে, রু, লু বলে। দাক্ষিণাত্যের বেশীর ভাগ সংস্কৃত উচ্চারণ বাংলার চেয়ে বিশুদ্ধ ব'লে বাঙালীরা অনেক সময় মনে করেন যে এই রু, লু-ই বুঝি খাঁটি সংস্কৃত উচ্চারণ। কিন্তু উপরে দেখান গেছে যে তা নয়। সুনীতি বাবু দেখেছেন যে কোন প্রাকৃত ভাষায় ঋ, ঌ-র আসল উচ্চারণ বজায় রাখা হয় নি।

আমরা লিখি তিন, বলি তীন (ইকারের হ্রস্বত্ব ইং tin শব্দে খাঁটি পাওয়া যায়); লিখি সতী, বলি সতি ; লিখি কুল, বলি কূল (হ্রস্ব উকার কাকে বলে তা হিন্দী কুল্ শব্দে পরিষ্কার শোনা যায়) ; লিখি মুহূর্ত্ত, বলি মুহুর্ত্ত।

যাহোক্, যত রকম স্বরশব্দ আছে, আর এক এক স্বরের যত রকমের মাত্রা (হ্রস্ব দীর্ঘ প্রভৃতি) পাওয়া যায়, দৃষ্টান্ত সমেত তার ফর্দ্দ ধ'রে দিলেই আসল অবস্থাটা ত বোঝা যাবে। তবে, কোন কালে সংস্কৃত বর্ণমালার হাতথেকে রেহাই পেয়ে, বাংলার অবস্থার মত ব্যবস্থা হয়ে উঠ্‌বে কি না তা' কে বল্‌তে পারে ?

যে স্বর-শব্দমালা নীচে সাজিয়ে দেওয়া যাচ্ছে সেটা পড়বার সময় মনে রাখা আবশ্যক যে বাংলায় স্বরের দৈর্ঘ্য দুরকমে হয়—১। টানে ২। ঝোঁকে। যেমন ব়াক্য কথাটার আকার ঝোঁকে দীর্ঘ, বাক্ কথাটার আকার টানে দীর্ঘ। রাধার রা ঝোঁকে দীর্ঘ, রাধার ধা ঝোঁক টান দুয়েরই অভাবে হ্রস্ব। ইং hat, mat, cat সবই হ্রস্ব ; এক (অ্যাক) টানে দীর্ঘ ; not ঝোঁকে দীর্ঘ।

অ
- হ্রস্ব—ইং doll (ডল্), কত, কথা, অকপট।
- দীর্ঘ—ইং ball (বল্), ছল, দল।
- চাপা—ইং cut (কট্), বস্, আপনি, আমরা।

লুপ্ত অকারের চিহ্নটা সংস্কৃত কথা অবিকল লিখতে ছাড়া বাংলায় কোন কাজে আসে না।

আ
- হ্রস্ব—আমি, রোগা, রাধার ধা।
- দীর্ঘ—রাধার রা, গাছ, বাড়ী।

ই
- হ্রস্ব—চিঠি, পাই, সতী, চাষী।
- দীর্ঘ—তিন, দীন, বীর, স্থবির।
- অস্ফুট—পূর্ব্ববঙ্গের কাইল (কালি), বাইক (বাক্য) প্রভৃতি। কলকাতাই উচ্চারণে এই ই-শব্দটা অস্ফুট ভাবেও নেই, অর্থাৎ অস্ফুট ই-টা লোপ পেয়েছে।*

উ
- হ্রস্ব—সাধু, তূলা, ধূলা।
- দীর্ঘ—চুল, কুল, কূপ, রূপ।

ও
- হ্রস্ব—লোহা, বোঝা, গতি (গোতি) মন্দ (মোন্দো)।
- দীর্ঘ—রোগ, শোক, শ্রম (srom) যম (জোম)।

এ
- হ্রস্ব—একটু, বেদানা, সময়ে, ব্যক্তি (বেক্তি)।
- দীর্ঘ—বেদ, উদ্দেশ, ক্লেশ।

অ্যা
- হ্রস্ব—ব্যস্ত (ব্যাস্ত) ত্যজ্য (ত্যাজ্য), সমস্যা।
- দীর্ঘ—এক (অ্যাক), ত্যাগ, ব্যাকুল।

হ্রস্ব-দীর্ঘের আলাদা চিহ্ন দরকার নেই তা ত দেখা গেল। কিন্তু বাহুল্য নিয়ে যদিবা চালান যায়, তবু অভাব নিয়ে আর চুপ ক'রে ব'সে থাকা চলে না। বাংলা এখন আর কুনো অবস্থায় নেই—বিদেশী কথা

---

* কলকাতাই উচ্চারণে সাধু ভাষার ই যেখানে যেখানে লোপ পেয়েছে সেখানে কিন্তু সে তার প্রভাব রেখে গেছে। অন্যান্য গুণের মধ্যে ইকার পূর্ব্ববর্ত্তী অকারের উচ্চারণ ওকারের মত ক'রে দেয়। আমরা সাধু "করিয়া" স্থলে পূর্ব্ববঙ্গের মত "কইর্যা" বলি নে বটে, কিন্তু "কোরে" বলি। মুখের ভাষা লিখতে হলে সমাপিকা করে (kawre) ও অসমাপিকা করে (kore) এ দুইয়ের প্রভেদ বাঁচিয়ে বানান করা উচিত, নইলে পাঠকের পড়তে গোল লাগবে। কেও কেও ক-য়ে ওকার দিয়ে অসমাপিকা "কোরে" লেখবার পক্ষপাতী, কিন্তু তার চেয়ে লুপ্ত ইকারের চিহ্ন দিয়ে "ক'রে" লেখা ভাল, এ বিষয়ে অধিকাংশ লোকের রায় যোগেশচন্দ্র বিদ্যানিধি বাহাদুরের সঙ্গে মতের মিল হবে, কারণ তাহলে বানানের মধ্যে উৎপত্তির ইতিহাসটুকু থেকে যায়।

নিয়ে কারবার করতে হচ্ছে, বিদেশীর কাছে নিজেকে জাহির করতে হচ্ছে, কাজেই একছুটে থাকলে আর ভাল দেখায় না। মারাঠিতে খোলা অ (all), চাপা অ (us) ও অ্যা শব্দের অক্ষর ছিল না। তারা অকারে চিহ্ন দিয়ে চাপা অ, আকারে চিহ্ন দিয়ে খোলা অ, একারে চিহ্ন দিয়ে অ্যা, ক'রে নিয়েছে—যেমন অাঁল (all), অঁস্ (us) আমি বলি মাথায় ˙ দিয়ে চাপা অ, আর মাথায় ৴ দিয়ে খোলা এ (অ্যা) বাংলায় বেশ চিহ্নিত হতে পারে। যেমন cut=কঁট্, cat=কেঁট। এ ছাড়া আবশ্যক মত য়ুরোপীয় হ্রস্ব ও দীর্ঘের সাধারণ চিহ্ন ব্যবহার করলে আর বাংলার স্বরলিপিকে কোন শব্দ লিখনে পিছপাও থাকতে হয় না। ওদিকে ত ব্যঞ্জন লিপিতে ব-র পেট কেটে, আর জ, ফ, ভ-তে বিন্দু দিয়ে, সকল চলিত ব্যঞ্জন-শব্দের অক্ষর পূরণ ক'রে নেওয়া গেছে।

চিহ্নের কথা বলতে মনে হ'ল যে বাংলা হাতের লেখা থেকে ছাপার অক্ষর তৈরী সম্বন্ধে আজ পর্য্যন্ত ভাল ক'রে মাথা খাটান হয় নি। চীনে ভাষার কম্পোজিটারদের মত ঘরের এক পাশ থেকে আর এক পাশ দৌড়-দৌড়ীর আবশ্যক না হলেও অক্ষর ও চিহ্নের বাহুল্যের কারণে বাংলা ছাপাখানার অনেক অনর্থক অসুবিধে ভোগ করতে হয়। রেল-গাড়ি মোটর-গাড়ি সবই প্রথম প্রথম ঘোড়া-গাড়ির গড়নে তৈরী হয়েছিল, ক্রমে স্ব স্ব ধর্ম্ম অনুসারে তাদের চেহারা বদ্‌লে এসেছে। বাংলার ছাপার অক্ষরেরও এখন নিজমূর্ত্তি ধারণ করবার সময় হয়েছে। কিন্তু এ আলোচনার স্থান এ প্রবন্ধে নয়।

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

'পঞ্চক'।

——:০:——

"ঘরেতে ভ্রমর এল গুণগুণিয়ে
আমারে কার কথা সে যায় শুনিয়ে।"

চৈত্র মাস। প্রচণ্ড রোদ। তমালতালীর কাঁধে কাঁধে কোমলাঙ্গী লতিকারা সব শুকিয়ে উঠেছে। কাকেরা পর্য্যন্ত ডাক্‌ছে না। তারা সব নিবিড় বনে নিবিড়তম ছায়ায় আশ্রয় নিয়েছে। মার্ত্তণ্ডদেব যেন সহস্রমুখ হয়ে চারিদিকে আগুণ ঢেলে দিচ্ছেন। রাজার পথে পশ্চিমে হাওয়ায় তপ্ত ধূলি উড়ছে সাংঘাতিক। কিন্তু সে হাওয়া সে ধূলি অচলায়তনের দেয়াল পর্য্যন্ত এসে থেমে যা'চ্ছে। তাদের প্রবেশ এখানে নেই। বাহিরের সুখ বাহিরের দুঃখ, বাহিরের হাসি বাহিরের অশ্রু—বাহিরের আশা আকাঙ্ক্ষা, উল্লাস আনন্দ—সে-সবের প্রবেশ এখানে জন্ম-জন্মান্তর থেকে নিষিদ্ধ। এখানে সে হচ্ছে অচলায়তন। যেখানে হাজার হাজার বছরের বাঁধা রাস্তায় বাঁধা নিয়মে বাঁধা জীবনের ভিতর দিয়ে পাকা মানুষ তৈরী হ'য়ে উঠছে। এখানে একটু কারও ভুল করবার আশঙ্কা নেই—একটু কারও পথভ্রষ্ট হবার সম্ভাবনা নেই। এটা হচ্ছে মানুষের সুপ্তির স্থান—এটা হচ্ছে নাকি মানুষের মুক্তির মন্দির!

রাজার পথে মত্ত হাওয়ায় তপ্ত ধূলি উড়ুক—কিন্তু এখানকার গাছের পাতাটী পর্য্যন্ত নড়ছে না। কি জানি যদি সে নড়াতে একটু

কিছু ঘুলিয়ে যায়। কি জানি যদি সে নড়া দেখে কারও মনে প্রশ্ন ওঠে যে গাছের পাতাগুলো নড়ে কোন্ নিয়মে। আর সেটার উত্তর বের করতে গেলে হয়ত অচলায়তনের প্রাচীরগুলো পর্য্যন্ত পাগল হ'য়ে একদিন উঠে হাঁটতে লেগে যাবে। তাই এখানের গাছের পাতাটী পর্য্যন্ত নড়ে না। এখানকার পাখীগুলো পর্য্যন্ত ডাকে শাস্ত্রানুসারে—তাদের ডাক বনের পাখীর ডাকের মত তেমন অকেজো একেবারেই নয়। তাদের প্রত্যেক ডাকের একটা ভীষণ রকম মর্ম্ম আছে। কোনটায় বা দিনশুদ্ধি হচ্ছে—কোনটায় বা রাত্রিশঙ্কা হরণ করছে—কোনটায় পিশাচ-ভয়ভঞ্জন ঘটছে—কোনটায় বা সর্পভয়নিস্তারণ আসছে। চারিদিকে সাংঘাতিক শান্তি নিদ্রার চাইতেও আবেশময়—মৃত্যুর চাইতেও মৌন—এটা হচ্ছে নাকি মানুষের মুক্তির মন্দির।

সেই চৈত্রমাসে প্রচণ্ড গ্রীষ্মে মধ্যাহ্নভোজন সমাপন করে' অচলায়তনে যে যার যার মতো আপন আপন কক্ষে আশ্রয় নিয়েছে—সেই বিরাট শান্তি উপভোগ করবার জন্যে। কিন্তু বেচারা পঞ্চকের আর শান্তি নেই। তার উপর আজ কড়াকড় হুকুম হয়েছে যে সূর্য্যাস্তের পূর্ব্বে তাকে অজতন্ত্র থেকে শৃঙ্গীশাপ মোচনের স্বস্ত্যয়নটা মুখস্ত করতেই হবে। নইলে তার জলস্পর্শ নিষিদ্ধ। পঞ্চক বৃহৎ অজতন্ত্রখানা কোন রকমে টেনে তার আপনার কক্ষে এনে শৃঙ্গীশাপ-মোচনটা বার বার করে' আবৃত্তি করছিল আর পূর্ব্বজন্মে তার মাথার ওপরে দুটো শৃঙ্গ থাকার কতটা সম্ভাবনা ছিল এবং পরজন্মে তার মাথায় শৃঙ্গ গজাবার কতটা সম্ভাবনা জমা হয়ে উঠছে তাই এক এক বার ভাবছিল। পঞ্চক যত বেশী করে' তার মন সেখানে লাগাতে

যাচ্ছিল অজতন্ত্রখানা যেন তত বেশী দুর্ব্বোধ্য হয়ে উঠছিল। যত বেশীবার সে পড়ছিল তত বেশী তার মন লাগছিল না। এই রকম যখন পঞ্চকের সঙ্গে আর অজতন্ত্রের সঙ্গে একটা বিরাট সংগ্রাম চল্‌ছিল তখন কোথা থেকে কোন্ পথ দিয়ে কোন রন্ধ্র খুঁজে হঠাৎ—

ঘরেতে ভ্রমর এল গুণগুণিয়ে,—

পঞ্চকের হৃদয়টা যেন চক্ষের পলকে মুখের মধ্যে লাফিয়ে এলো—তার মর্ম্মতলের কোথায় কোন্ নিভৃতে একটী বহুদিনের ভুলে-যাওয়া মর্‌চে-ধরা তারে ঝঙ্কার দিয়ে উঠল—অজতন্ত্রের অক্ষরগুলো পিঁপড়ের সারের মতো যেন ধীরে ধীরে কোথায় মিলিয়ে গেল—প্রকাণ্ড পুঁথি-খানা যেন কোথায় অদৃশ্য হয়ে গেল—পঞ্চক তার কান মন প্রাণ—তার সমস্ত অস্তিত্বটা দিয়ে শুন্‌লে সেই ক্ষুদ্র ভ্রমরের গুণ্‌গুণ্ গুঞ্জন:—

আমারে কার কথা সে যায় শুনিয়ে

ওগো আমায় কার কথা সে শুনিয়ে যায়! এই সহস্র সহস্র বৎসর খাড়া হয়ে আছে যে অচলায়তন—যেখানে ভাবনা নেই চিন্তা নেই—আশা নেই আকাঙ্ক্ষা নেই—দুঃখ নেই সুখ নেই—যেখানে আছে শুধু অভ্যাস আর সোয়াস্তি—যেখানে আছে শুধু শান্তি আর সংযম—সেখানে ঐ একরত্তি ভ্রমরটুকু এসে কার কথা শুনিয়ে যায়। ওগো আমায় কার কথা সে শুনিয়ে গেল! হায় পঞ্চক!

ঐ একরত্তি ভ্রমরটুকু! কোন্ শক্তি তার ক্ষুদ্র দুটী পাখাতে জড়িয়ে সে এ জগতে এসেছে! কোন শক্তি? তার সে-শক্তিতে যে আজ অচলায়তনের চব্বিশ হাত উঁচু সাত হাত পুরু দেয়াল কেঁপে উঠ্‌ল—তার সে গুণ্‌গুণ্ গুঞ্জনে যে বড় বড় সমাসের ঢাকের বাদ্য, বড় বড় অলঙ্কারের করতালের ঝম্‌ঝম্ ধ্বনি সব বেখাপ্পা হ'য়ে উঠ্‌ল!

ঐ একরত্তি ভ্রমরটুকু! তার আলাপে যে আজ শাস্ত্রের নিষেধ-গুলোকে প্রলাপের মতো মনে হচ্ছে! আজ যে ঐ রত্তিটুকু ভ্রমরের গুঞ্জনধ্বনির পাছে পাছে বেরিয়ে পড়বার জন্যে অন্তর-দেবতার আসন থেকে তাগিদ্ আস্‌ছে—ঐ গুঞ্জনধ্বনির পাছে পাছে—দীপ্ত আকাশের তলে তলে—মুক্ত বাতাসের সুরে সুরে—বুঝি—বুঝি—সেই কথা আমাকে শুনিয়ে যায়—হায় আজ

কেমনে রহি ঘরে
মন যে কেমন করে
কেমনে কাটে গো দিন দিন গুণিয়ে।

না, দিন আর কাটে না। পঞ্চকের দিন আর কাট্‌বে না এখানে—এই অচলায়তনে। কোন্ মায়া বিস্তার করে' আজ ক্ষুদ্র পতঙ্গ পঞ্চকের রুদ্ধ অন্তরের দ্বার খুলে সেখানে কার আহ্বান, কার সংবাদ রেখে গেল। ঐ ক্ষুদ্র ভ্রমরের গুণ্‌গুণ্ ধ্বনির সঙ্গে পঞ্চকের হৃদয়-বীণার কোন্ পরদার কোন্ তারটী সৃষ্টির আদি থেকে বাঁধা ছিল যে আজ তার গুঞ্জন পঞ্চকের কান দিয়ে পশে' সেই তারটায় আঘাত কর্‌লে—সে-তার যে মুহূর্ত্তে ঝঙ্কার দিয়ে উঠ্‌ল—পঞ্চককে পাগল করে' দিয়ে গেল। সে-সুরের স্পর্শে কোন্ পুরুষ জেগে উঠ্‌ল পঞ্চকের অন্তরে অন্তরে—কোন পুরুষ—যে এতদিন কোন কথা কয় নি, কোন সাড়া দেয় নি—পঞ্চাশ হাজার বছর সে এমনি করে' লুকিয়ে ছিল। কে জান্‌ত যে এমন কেউ আছে পঞ্চকের অন্তরে যে এই অচলায়তনের দেড় হাত জায়গায় আঁট্‌বে না। যদি জান্‌ত তবে বুঝি ঐ অচলায়তনের বিরাট প্রাচীর অমন সগর্ব্বে আকাশে মাথা

উঁচু করে' দাঁড়াতেই পার্‌ত না। যখন একবার দাঁড়িয়েছে—যখন পঞ্চকের অন্তরে সেই বিরাট পুরুষ জেগেছে তখন সেই প্রাচীরের উদ্ধত মস্তক নীচু কর্‌তেই হবে—নইলে যে পাথরগুলো দিয়ে ও প্রাচীর তৈরী হয়েছে, সে পাথরগুলোকে তুচ্ছ বালিরাশির মতো ঝুর্‌ ঝুর্‌ করে' ধসে' পড়তে হবে—অন্য উপায় নেই। ঐ প্রাচীর খাড়া করে' রাখ্‌তে হ'লে পঞ্চককে মর্‌তে হবে। পঞ্চক মর্‌বে! অসম্ভব—পঞ্চকের মর্‌বার উপায় নেই—পঞ্চককে যে বাঁচতেই হবে।

পঞ্চককে বাঁচতেই হবে—ভগবানের আদেশ। ভগবানের আদেশেরও উপরে যারা আদেশ চালাতে চাইবে তাদের এই বিশ্ব-মানবের মহা মেলায় অপমান হবে পদে পদে, পলে পলে। যারা পঞ্চককে ঘিরে রাখতে চাইবে তারা ভগবানকেই বন্দী কর্‌বে—আর ভগবানকে বন্দী কর্‌লে ভগবানের কোন ক্ষতি নেই কিন্তু মানুষের অকল্যাণ ও অমঙ্গল হবে—আর তার পরিমাণ হবে হিমাদ্রির চাইতেও উঁচু, সিন্ধুর চাইতেও গভীর।

সমস্ত জগৎ জুড়ে যে আনন্দের সুর নিশিদিন বাজ্‌ছে সেই আনন্দের সুর যারা কান পেতে হৃদয়ের তলে তলে শুনতে পায় নি—যে আনন্দের আলোক সমস্ত আকাশে ছড়িয়ে আছে সে-আলোক যারা মানুষের মর্ম্মে মর্ম্মে আঁখি মেলে দেখতে চায় নি তাদের পক্ষেই সম্ভব হয়েছে আপনার চারপাশে গণ্ডি টেনে দিয়ে এ জগতকে দেখা দুঃখময় করে', অমঙ্গলময় করে', অশুচি করে' অপবিত্র করে'—তাদের পক্ষেই মানা সম্ভব হয়েছে এ জগতটা সয়তানের সৃষ্টি—এ জগৎ সয়তানের ইশারায় চল্‌ছে। কোথায় গো তোমার ভগবান যদি তিনি ঐ মুক্ত উদার নীল আকাশের মাঝে নেই—যদি তিনি ঐ বর্ষার কালো

মেঘের ঝিলিক্-হানা গুর্ গুর্ ডাকের মধ্যে নেই—যদি তিনি প্রথম আষাঢ়ের ঝর্ ঝর্ ধারায় ভেজা চষা-মাটির গন্ধে নেই—ঐ ক্ষুদ্র ভ্রমর-টুকুর পক্ষগুঞ্জনে নেই—মানুষের হৃদয়তলের মুক্তির সঙ্গীতে নেই। কোথায় আছেন তিনি—কোথায় তাঁকে বন্দী করে' ক্ষুদ্র করে' অক্ষম করে' লুকিয়ে রেখেছ? কোথায় তাকে অশুচি করে' ভীত শঙ্কিত করে', মিথ্যা করে', অপমানিত করে', অপরাধের সীমা বাড়াচ্ছ? হায়! অচলায়তনের কারও চোখে পড়ে নি যে ভগবানকে বাঁধতে গিয়ে তারা নিজেরাই বাঁধা পড়েছে—ভগবান যেমন তেমনি আছেন—তাঁর সৃষ্টি যেমন চল্‌ছিল তেমনি চল্‌ছে।

পঞ্চকের আর এ অচলায়তনে থাকা চল্‌বে না—কিছুতেই না। আজ যে ঐ ক্ষুদ্র ভ্রমরটুকুর মৃদু-গুঞ্জনধ্বনি সমস্ত জগতের আনন্দের প্রতিনিধি হ'য়ে এসে পঞ্চকের প্রাণে প্রাণে আগুন ছুটিয়ে দিয়ে গেল। ওগো—জাগো—জাগো—শতাব্দী শতাব্দী ধরে' নিজের চারদিক অন্ধকারে জড়িয়ে যে আলোকের সন্ধান করছিলে প্রাণে আনন্দ নিয়ে একবার তাকিয়ে দেখ সে-আলোক ঐ মুক্ত নীল আকাশ ছেয়ে আছে—সে আলোক বাতাসের সঙ্গে সঙ্গে গেয়ে চলেছে—সে আলো প্রাণের স্পন্দনে স্পন্দনে নাচছে—সে-আলো হৃদয়-বীণার সুরে সুরে বাজছে—ঐ যে সে "আলোর স্রোতে পাল তুলেছে হাজার প্রজাপতি"—ঐ যে সে "আলোর ঢেউয়ে উঠ্‌ল মেতে মল্লিকা মালতী"—সে আলোক মানুষের কর্ম্মে আশায় আকাঙ্ক্ষায় প্রেমে ভক্তিতে প্রীতিতে শ্রদ্ধায় আপনাকে ছড়িয়ে দিয়ে আছে। না, পঞ্চকের আর এখানে থাকা চল্‌বে না। পঞ্চকের প্রাণে প্রাণে যে আজ সেই আনন্দ-আলোকের স্রোত ছুটেছে—সে-স্রোতে যে সব

ভেসে গেল—যত অপমান অপরাধ, শতাব্দীর বন্ধন—শত সহস্র স্রোতের ভারী ভারী শৃঙ্খল আজ সব তুচ্ছ তৃণের মত পট্ পট্ করে ছিঁড়ে গেল—পঞ্চককে আজ কে ধরে' রাখবে—কার সাধ্য—

হারে রে রে রে রে
আমায় ছেড়ে দেরে দেরে।
যেমন ছাড়া বনের পাখী
মনের আনন্দে রে।

ঘন শ্রাবণ-ধারা
যেমন বাঁধন-হারা
বাদল বাতাস যেমন ডাকাত
আকাশ লুটে ফেরে।

হারে রে রে রে রে
আমায় রাখবে ধরে কেরে
দাবানলের নাচন যেমন
সকল কানন ঘেরে।

বজ্র যেমন বেগে
গর্জ্জে ঝড়ের মেঘে
অট্ট হাস্যে সকল বিঘ্ন-বাধার বক্ষ চেরে।

ছুট্‌বে—আজ পঞ্চক ছুট্‌বে—ছুট্‌বে আজ সে চন্দ্র গ্রহ তারায় আপনার প্রাণের সঙ্গীত ছড়িয়ে দিয়ে দিয়ে—ছুট্‌বে আজ সে এই বিস্তৃত পৃথিবীর বক্ষে মরু গিরি কান্তারে, নগর নগরী পল্লীতে আপনার চরণ-চিহ্ন এঁকে এঁকে—ছুট্‌বে আজ সে ঐ প্রভঞ্জন-পাগল

সফেন-তরঙ্গোচ্ছ্বসিত ক্ষুব্ধ অশান্ত সিন্ধুর বক্ষ দলিত মথিত করে'! ছুটবে আজ সে শীত গ্রীষ্ম বর্ষার ভিতর দিয়ে দিয়ে—অগ্নি জল বায়ুর মধ্য দিয়ে দিয়ে—ঐ বিশ্বমানবের মহা কোলাহলের, মহা সংগ্রামের মাঝ দিয়ে দিয়ে আপনার প্রাণের আনন্দের আগুণ ছড়িয়ে ছড়িয়ে—তাতে যদি পঙ্ককের অপঘাত মৃত্যুও হয় ক্ষতি নেই—অন্ততঃ তাতে কিছু সার্থকতা আছে। অচলায়তনে ঐ শ্বাস-রুদ্ধ হয়ে মরার চাইতে সে-মৃত্যু অনেক গুণে শ্রেয় ও প্রেয়।

(২)

"এ পথ গেছে কোন্‌খানে গো কোন্‌খানে
তা কে জানে তা কে জানে।"

ঐ যে শোণপাংশু-পল্লীর বুক চিরে টিয়ে পাখীর চাইতেও সবুজ ধানের ক্ষেতের মাঝ দিয়ে পৃথিবীর বুকে এঁকে বেঁকে মাটীর পথটা বহুদূর চলে গিয়ে কুয়াশার মত গাছ পালার ভিতরে লুকিয়ে গেছে—সে-পথ গেছে কোন্‌খানে—তা কে জানে? ঐ পথটী বেয়ে বেয়ে সৃষ্টির আদি থেকে কত নর নারী কত দেশ জাতি কত গান কত সুর—কত হাসি কত অশ্রু আপনার আপনার গান গেয়ে গেয়ে চলে গেছে—কোথায়? তা কে জানে তা কে জানে! কোন্ পাহাড়ের পারে নিয়ে নিয়ে গেছে তাদের ঐ পথ—কোন্ সাগরের ধারে নিয়ে গেছে তাদের ঐ রাস্তা—এ পথ বেয়ে কোন্ দুরাশার সন্ধানে তারা যাত্রা করেছিল—তাদের অশ্রু শেষ হয়েছিল কোথায়—তা কে জানে? বুঝি কেউ জানে না।

তা না জানুক্ তবুও ঐ পথ বেয়েই চল্‌তে হবে। এই চলাতেই যে আনন্দ। যারা প্রত্যেক পাদক্ষেপের সঙ্গে সঙ্গে আপনার লাভ ক্ষতির হিসেব করে' করে' চলে তারা মানুষের অন্তরের জীবন-দেবতার আনন্দ-মন্ত্রের সংবাদ পায় নি—বুঝি কোন দিন পাবেও না। এ সৃষ্টিটা যে সমস্ত অহৈতুক—এখানকার লাভটাই যে খুব লাভ নয়, ক্ষতিটাই যে খুব ক্ষতি নয়—তা তারা বুঝবে না কোন দিন। ঐ যে আনন্দ-মন্ত্র—যে মন্ত্রে ঊষার সঙ্গে সঙ্গে বনে বনে লক্ষ ফুল গাল-ভরা হাসি নিয়ে ফুটে ওঠে—তারা কি খোঁজ করে এতে তাদের লাভ কি? তারা যে না ফুটে পারে না—সৌরভ না ছড়িয়ে যে তারা বাঁচে না। সেটাই যে তাদের সত্য। ফোটাতেই তাদের সার্থকতা—সৌরভ ছড়ানতেই তাদের গৌরব। যখন মানুষ ঐ আনন্দ-মন্ত্রে সঞ্জিবীত হ'য়ে উঠ্‌বে—ঐ আনন্দ-মন্ত্রে দীক্ষিত হবে তখন "এ পথ গেছে কোন্‌খানে" এ প্রশ্ন মনে জাগ্‌লেও কোন সন্দেহ, কোন শঙ্কা তার প্রাণে বাজ্‌বে না। সে যে তখন থেমে থাক্‌তে পারবেই না। তার চলাতেই যে তখন আনন্দ। প্রত্যেক পাদক্ষেপে যে তখন তার সুর বেজে উঠ্‌বে। প্রত্যেক অঙ্গ-সঞ্চালন থেকে তার তখন সৌন্দর্য্য ঝরে পড়্‌বে। সে তখন বুঝ্‌বে যে সমস্তের সার্থকতা তার আপনার মধ্যেই লুকিয়ে আছে। সে যে—

"খসে যাবার ভেসে যাবার
ভাস্‌বারই আনন্দে রে!

সে যে—

"জালিয়ে আগুণ ধেয়ে ধেয়ে
জ্বল্‌বারই আনন্দ রে!"

সে যে—

"ফেলে দেবার ছেড়ে দেবার
মরবারই আনন্দে রে।"

সে যে—

"লুটে যাবার ছুটে যাবার
চল্‌বারই আনন্দে রে।"

এ কবি-কল্পনাও নয়—পাগলের প্রলাপও নয়। এ ভগবানের সৃষ্টিলীলার নিগূঢ় সত্যটুকু। তাই পঞ্চক চল্‌বে—ঐ পথ ধরেই সে চল্‌বে—এই চলাই যে তার সত্য—এই চলাতেই রয়েছে তার অমৃত।

(৩)

আজ আমরা সবাই অপেক্ষা করে' বসে' আছি কবে ভগবানের ইঙ্গিতে বাঙ্গালার সহরে সহরে পল্লীতে পল্লীতে বাঙ্গালীর ঘরে ঘরে পঞ্চকের জন্ম হবে। কবে পঞ্চকের প্রাণের অদম্য বেগের মুখে যত আলস্য যত জড়তা সব ভেসে যাবে—যত জীর্ণতা যত মিথ্যা সব খসে যাবে—যত শঙ্কা যত অধর্ম্ম সব চক্ষের পলকে অদৃশ্য হবে। সে দিন "সনাতন জড়তার" দেয়াল ভেঙে সত্যের পথ মুক্ত হবে। সত্য যে দিন আপনার পথ পাবে—যে দিন আমরা আর সত্যকে ঠেলে রাখ্‌ব না—দাবিয়ে রাখ্‌ব না সেই দিন এই বাঙ্গালার মরা গাঙে বান আস্‌বে—বাঙ্গালীর মরা প্রাণে স্রোত খুল্‌বে। মানুষ যখন সত্য হয়ে উঠ্‌বে তখন সুন্দর ও মঙ্গল তার কাছ থেকে কিছুতেই দূরে থাক্‌তে পারবে না।

শ্রীসুরেশ চন্দ্র চক্রবর্ত্তী।

পৌষ, ১৩২৪

সবুজ পত্র

সম্পাদক

শ্রীপ্রমথ চৌধুরী

বার্ষিক মূল্য দুই টাকা ছয় আনা।
সবুজ পত্র কার্য্যালয়, ৩ নং হেষ্টিংস্ ষ্ট্রীট,
কলিকাতা।

কলিকাতা।
৩ নং হেষ্টিংস্ ষ্ট্রীট।
শ্রীপ্রমথ চৌধুরী এম্, এ, বার-য়্যাট-ল কর্তৃক
প্রকাশিত।

কলিকাতা।
উইক্‌লী নোট্‌স প্রিণ্টিং ওয়ার্কস,
৩ নং হেষ্টিংস্ ষ্ট্রীট।
শ্রীসারদা প্রসাদ দাস দ্বারা মুদ্রিত।

পাত্র ও পাত্রী।

——:০:——

ইতিপূর্ব্বে প্রজাপতি কখনো আমার কপালে বসেন নি বটে কিন্তু একবার আমার মানসপদ্মে বসেছিলেন। তখন আমার বয়স ষোলো। তার পরে—কাঁচাঘুমে চমক্ লাগিয়ে দিলে যেমন ঘুম আর আস্‌তে চায় না—আমার সেই দশা হল। আমার বন্ধু বান্ধবরা কেউ কেউ দারপরিগ্রহ ব্যাপারে দ্বিতীয়, এমন কি, তৃতীয় পক্ষে প্রোমোশন পেলেন আমি কৌমার্য্যের লাস্‌ট্‌ বেঞ্চিতে বসে শূন্য সংসারের কড়িকাঠ গণনা করে কাটিয়ে দিলুম।

আমি চোদ্দ বছর বয়সে এণ্ট্রেন্স পাস করেছিলুম। তখন বিবাহ কিম্বা এণ্টেন্স পরীক্ষায় বয়স বিচার ছিল না। আমি কোনোদিন পড়ার বই গিলি নি, সেইজন্যে শারীরিক বা মানসিক অজীর্ণ রোগে আমাকে ভুগতে হয় নি। ইঁদুর যেমন দাঁত বসাবার জিনিস পেলেই সেটাকে কেটে কুটে ফেলে, তা সেটা খাদ্যই হোক্ আর অখাদ্যই হোক্, শিশুকাল থেকেই তেমনি ছাপার বই দেখ্‌লেই সেটা পড়ে ফেলা আমার স্বভাব ছিল। সংসারে পড়ার বইয়ের চেয়ে না-পড়ার বইয়ের সংখ্যা ঢের বেশী এইজন্যে আমার পুঁথির সৌরজগতে স্কুল-পাঠ্য পৃথিবীর চেয়ে বেস্কুল-পাঠ্য সূর্য্য চোদ্দ লক্ষগুণে বড় ছিল। তবু, আমার সংস্কৃত পণ্ডিত মশায়ের নিদারুণ ভবিষ্যদ্বাণী সত্ত্বেও, আমি পরীক্ষায় পাস করেছিলুম।

আমার বাবা ছিলেন ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট্। তখন আমরা ছিলেম সাতক্ষীরায় কিম্বা জাহানাবাদে কিম্বা ঐ রকম কোনো একটা জায়গায়। গোড়াতেই বলে' রাখা ভাল, দেশ, কাল এবং পাত্র সম্বন্ধে আমার এই ইতিহাসে যে-কোনো স্পষ্ট উল্লেখ থাক্‌বে তার সবগুলোই সুস্পষ্ট মিথ্যা; যাঁদের রসবোধের চেয়ে কৌতূহল বেশী তাঁদের ঠক্‌তে হবে। বাবা তখন তদন্তে বেরিয়েছিলেন। মায়ের ছিল কি-একটা ব্রত, দক্ষিণা এবং ভোজন ব্যবস্থার জন্য ব্রাহ্মণ তাঁর দরকার। এই রকম পারমার্থিক প্রয়োজনে আমাদের পণ্ডিত মশায় ছিলেন মায়ের প্রধান সহায়। এইজন্য মা তাঁর কাছে বিশেষ কৃতজ্ঞ ছিলেন, যদিচ বাবার মনের ভাব ছিল ঠিক তার উল্টো।

আজ আহারান্তে দান দক্ষিণার যে ব্যবস্থা হল তার মধ্যে আমিও তালিকাভুক্ত হলুম। সে পক্ষে যে-আলোচনা হয়েছিল তার মর্ম্মটা এই—আমার ত কলকাতায় কলেজে যাবার সময় হল। এমন অবস্থায় পুত্রবিচ্ছেদদুঃখ দূর করবার জন্যে একটা সদুপায় অবলম্বন করা কর্ত্তব্য। যদি একটি শিশুবধূ মায়ের কোলের কাছে থাকে তবে তাকে মানুষ করে যত্ন করে তাঁর দিন কাট্‌তে পারে। পণ্ডিত মশায়ের মেয়ে কাশীশ্বরী এই কাজের পক্ষে উপযুক্ত—কারণ সে শিশুও বটে সুশীলাও বটে—আর কুলশাস্ত্রের গণিতে তার সঙ্গে আমার অঙ্কে অঙ্কে মিল। তা ছাড়া ব্রাহ্মণের কন্যাদায় মোচনের পারমার্থিক ফলও লোভের সামগ্রী।

মায়ের মন বিচলিত হল। মেয়েটিকে একবার দেখা কর্ত্তব্য এমন আভাস দেবামাত্র পণ্ডিত মশায় বল্লেন, তাঁর "পরিবার" কাল রাত্রেই মেয়েটিকে নিয়ে বাসায় এসে পৌঁচেছেন। মায়ের পছন্দ হতে দেরি

হল না; কেননা রুচির সঙ্গে পুণ্যের বাটখারার যোগ হওয়াতে সহজেই ওজন ভারি হল। মা বল্লেন, মেয়েটি সুলক্ষণা, অর্থাৎ যথেষ্ট পরিমাণ সুন্দরী না হলেও সান্ত্বনার কারণ আছে।

কথাটা পরম্পরায় আমার কানে উঠ্‌ল। যে-পণ্ডিত মশায়ের ধাতুরূপকে বরাবর ভয় করে এসেচি তাঁরই কন্যার সঙ্গে আমার বিবাহের সম্বন্ধ—এরই বিসদৃশতা আমার মনকে প্রথমেই প্রবল বেগে আকর্ষণ করলে। রূপকথার গল্পের মত হঠাৎ সুবন্ত প্রকরণ যেন তার সমস্ত অনুস্বার বিসর্গ ঝেড়ে ফেলে একেবারে রাজকন্যা হয়ে উঠল।

একদিন বিকেলে মা তাঁর ঘরে আমাকে ডাকিয়ে বল্লেন, "সনু, পণ্ডিত মশায়ের বাসা থেকে আম আর মিষ্টি এসেচে, খেয়ে দেখ্।" মা জান্‌তেন আমাকে পঁচিশটা আম খেতে দিলে আর-পঁচিশটার দ্বারা তার পাদপূরণ করলে তবে আমার ছন্দ মেলে। তাই তিনি রসনার সরস পথ দিয়ে আমার হৃদয়কে আহ্বান করলেন। কাশীশ্বরী তাঁর কোলে বসেছিল। স্মৃতি অনেকটা অস্পষ্ট হয়ে এসেচে, কিন্তু মনে আছে রাঙতা দিয়ে তার খোঁপা মোড়া—আর গায়ে কলকাতার দোকানের এক সাটিনের জ্যাকেট; সেটা নীল এবং লাল এবং লেস্ এবং ফিতের একটা প্রত্যক্ষ প্রলাপ। যতটা মনে পড়চে রং শাম্‌লা, ভুরু জোড়া খুব ঘন, এবং চোখদুটো পোষা প্রাণীর মত, বিনা সঙ্কোচে তাকিয়ে আছে। মুখের বাকি অংশ কিছুই মনে পড়ে না—বোধ হয় বিধাতার কারখানায় তার গড়ন তখনো সারা হয় নি, কেবল একমেটে করে রাখা হয়েচে। আর যাই হোক্ তাকে দেখতে নেহাৎ ভালমানুষের মত।

আমার বুকের ভিতরটা ফুলে উঠ্‌ল। মনে মনে বুঝলুম, ঐ রাঙ্‌তা-জড়ানো-বেণীওয়ালা জ্যাকেট্‌-মোড়া সামগ্রীটি ষোল আনা আমার,—আমি ওর প্রভু, আমি ওর দেবতা। অন্য সমস্ত দুর্লভ সামগ্রীর জন্যেই সাধনা করতে হয় কেবল এই একটি জিনিসের জন্য নয়; আমি কড়ে আঙুল নড়ালেই হয়; বিধাতা এই বর দেবার জন্যে আমাকে সেধে বেড়াচ্চেন। মা'কে যে আমি বরাবর দেখে আস্‌চি, স্ত্রী বল্‌তে কি বোঝায় তা আমার ঐ-সূত্রে জানা ছিল। দেখেচি, বাবা অন্য সমস্ত ব্রতের উপর চটা ছিলেন কিন্তু সাবিত্রী ব্রতের বেলায় তিনি মুখে যাই বলুন মনে মনে বেশ একটু আনন্দ বোধ করতেন। মা তাঁকে ভালবাস্‌তেন তা জানি কিন্তু কিসে বাবা রাগ করবেন কিসে তাঁর বিরক্তি হবে এইটেকে মা যে একান্ত মনে ভয় করতেন এরই রসটুকু বাবা তাঁর সমস্ত পৌরুষ দিয়ে সব চেয়ে উপভোগ করতেন। পূজাতে দেবতাদের বোধ হয় বড়-একটা কিছু আসে যায় না, কেননা সেটা তাঁদের বৈধ বরাদ্দ, কিন্তু মানুষের না কি ওটা অবৈধ পাওনা এই জন্যে ঐটের লোভে তাদের অসামাল করে। সেই বালিকার রূপগুণের টান সে দিন আমার উপরে পৌঁছয় নি, কিন্তু আমি যে পূজনীয় সে কথাটা সেই চোদ্দ বছর বয়সে আমার পুরুষের রক্তে গাঁজিয়ে উঠ্‌ল। সে দিন খুব গৌরবের সঙ্গেই আমগুলো খেলুম—এমন কি, সগর্ব্বে তিনটে আম পাতে বাকি রাখ্‌লুম, যা আমার জীবনে কখনো ঘটে নি; এবং তার জন্যে সমস্ত অপরাহ্ণ কালটা অনুশোচনায় গেল।

সে দিন কাশীশ্বরী খবর পায় নি আমার সঙ্গে তার সম্বন্ধটা কোন্‌ শ্রেণীর—কিন্তু বাড়ি গিয়েই বোধ হয় জান্‌তে পেরেছিল। তার পরে যখনি তার সঙ্গে দেখা হত সে শশব্যস্ত হয়ে লুকোবার জায়গা

পেত না। আমাকে দেখে তার এই ত্রস্ততা আমার খুব ভাল লাগ্‌ত। আমার আবির্ভাব বিশ্বের কোনো-একটা জায়গায় কোনো-একটা আকারে খুব একটা প্রবল প্রভাব সঞ্চার করে এই জৈব-রাসায়নিক তথ্যটা আমার কাছে বড় মনোরম ছিল। আমাকে দেখেও যে কেউ ভয় করে বা লজ্জা করে বা কোনো-একটা-কিছু করে সেটা বড় অপূর্ব্ব। কাশীশ্বরী তার পালানোর দ্বারাই আমাকে জানিয়ে যেত জগতের মধ্যে সে বিশেষভাবে, সম্পূর্ণভাবে এবং নিগূঢ়ভাবে আমারই।

এতকালের অকিঞ্চিৎকরতা থেকে হঠাৎ একমুহূর্ত্তে এমন একান্ত গৌরবের পদ লাভ করে কিছুদিন আমার মাথার মধ্যে রক্ত ঝাঁ ঝাঁ করতে লাগ্‌ল। বাবা যে রকম মাকে কর্ত্তব্যের বা রন্ধনের বা ব্যবস্থার ত্রুটি নিয়ে সর্ব্বদা ব্যাকুল করে তুলেচেন, আমিও মনে মনে তারি ছবির উপরে দাগা বুলোতে লাগ্‌লুম। বাবার অভিপ্রেত কোনো একটা লক্ষ্য সাধন করবার সময় মা যে রকম সাবধানে নানা প্রকার মনোহর কৌশলে কাজ উদ্ধার করতেন আমি কল্পনায় কাশীশ্বরীকেও সেই পথে প্রবৃত্ত হতে দেখ্‌লুম। মাঝে মাঝে মনে মনে তাকে অকাতরে এবং অকস্মাৎ মোটা অঙ্কের ব্যাঙ্কনোট থেকে আরম্ভ করে হীরের গয়না পর্য্যন্ত দান করতে আরম্ভ করলুম। এক-একদিন ভাত খেতে বসে তার খাওয়াই হল না এবং জান্‌লার ধারে বসে আঁচলের খুঁট দিয়ে সে চোখের জল মুচচে এই করুণ দৃশ্যও আমি মনশ্চক্ষে দেখতে পেলুম এবং এটা যে আমার কাছে অত্যন্ত শোচনীয় বোধ হল তা বল্‌তে পারি নে। ছোট ছেলেদের আত্মনির্ভরতার সম্বন্ধে বাবা অত্যন্ত বেশী সতর্ক ছিলেন। নিজের ঘর ঠিক করা, নিজের কাপড় চোপড় রাখা, সমস্তই আমাকে নিজের হাতে করতে হত। কিন্তু আমার মনের মধ্যে গার্হস্থ্যের যে-

চিত্রগুলি স্পষ্ট রেখায় জেগে উঠ্‌ল তার মধ্যে একটি নীচে লিখে রাখচি। বলা বাহুল্য, আমার পৈতৃক ইতিহাসে ঠিক এই রকম ঘটনাই পূর্ব্বে একদিন ঘটেছিল—এই কল্পনার মধ্যে আমার ওরিজিন্যালিটি কিছুই নেই। চিত্রটি এই,—রবিবারে মধ্যাহ্ন-ভোজনের পর আমি খাটের উপর বালিশে ঠেসান দিয়ে পা ছড়িয়ে আধ-শোয়া অবস্থায় খবরের কাগজ পড়চি। হাতে গুড়গুড়ির নল। ঈষৎ তন্দ্রাবেশে নলটা নীচে পড়ে গেল। বারান্দায় বসে কাশীশ্বরী ধোবাকে কাপড় দিচ্ছিল, আমি তাকে ডাক দিলুম ; সে তাড়াতাড়ি ছুটে এসে আমার হাতে নল তুলে দিলে। আমি তাকে বল্লুম, "দেখ, আমার বসবার ঘরের বাঁ দিকের আলমারির তিনের থাকে একটা নীল রঙের মলাট দেওয়া মোটা ইংরাজি বই আছে সেইটে নিয়ে এসত।" কাশী একটা নীল রঙের বই এনে দিলে ; আমি বল্লুম, "আঃ, এটা নয় ; সে এর চেয়ে মোটা, আর তার পিঠের দিকে সোনালি অক্ষরে নাম লেখা।" এবারে সে একটা সবুজ রঙের বই আন্‌লে—সেটা আমি ধপাস্ করে মেঝের উপর ফেলে দিয়ে রেগে উঠে পড়লুম। তখন কাশীর মুখ এতটুকু হয়ে গেল এবং তার চোখ ছল্ ছল্ করে উঠ্‌ল। আমি গিয়ে দেখ্‌লুম তিনের শেল্‌ফে বইটা নেই সেটা আছে পাঁচের শেল্‌ফে। বইটা হাতে করে নিয়ে এসে নিঃশব্দে বিছানায় শুলুম কিন্তু কাশীকে ভুলের কথা কিছু বল্লুম না। সে মাথা হেঁট করে বিমর্ষ হয়ে ধোবাকে কাপড় দিতে লাগ্‌ল এবং নির্ব্বুদ্ধিতার দোষে স্বামীর বিশ্রামে ব্যাঘাত করেচে এই অপরাধ কিছুতেই ভুল্‌তে পারলে না।

বাবা ডাকাতি তদন্ত করচেন, আর আমার এইভাবে দিন যাচ্ছে। এদিকে আমার সম্বন্ধে পণ্ডিতমশায়ের ব্যবহার আর ভাষা একমুহূর্ত্তে

কর্তৃবাচ্য থেকে ভাববাচ্যে এসে পৌঁছল এবং সেটা নিরতিশয় সন্তাববাচ্য।

এমন সময়ে ডাকাতি তদন্ত শেষ হয়ে গেল, বাবা ঘরে ফিরে এলেন। আমি জানি, মা আস্তে আস্তে সময় নিয়ে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে বাবার বিশেষ প্রিয় তরকারী রান্নার সঙ্গে সঙ্গে একটু একটু করে সইয়ে সইয়ে কথাটাকে পাড়বেন বলে প্রস্তুত হয়ে ছিলেন। বাবা পণ্ডিত-মশায়কে অর্থলুব্ধ বলে ঘৃণা করতেন; মা নিশ্চয়ই প্রথমে পণ্ডিতমশায়ের মৃদুরকম নিন্দা অথচ তাঁর স্ত্রী ও কন্যার প্রচুর রকমের প্রশংসা করে কথাটার গোড়াপত্তন করতেন কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে পণ্ডিতমশায়ের আনন্দিত প্রগল্‌ভতায় কথাটা চারিদিকে ছড়িয়ে গিয়েছিল। বিবাহ যে পাকা, দিনক্ষণ দেখা চল্‌চে, একথা তিনি কাউকে জানাতে বাকি রাখেন নি। এমন কি বিবাহকালে সেরেস্তাদার বাবুর পাকা দালানটি কয়দিনের জন্যে তাঁর প্রয়োজন হবে যথাস্থানে সে আলোচনাও তিনি সেরে রেখেচেন। শুভকর্ম্মে সকলেই তাঁকে যথাসাধ্য সাহায্য করতে সম্মত হয়েচে। বাবার আদালতের উকীলের দল চাঁদা করে বিবাহের ব্যয় বহন করতেও রাজি। স্থানীয় এণ্ট্রেন্সস্কুলের সেক্রেটারী বীরেশ্বর বাবুর তৃতীয় ছেলে তৃতীয় ক্লাসে পড়ে, সে চাঁদ ও কুমুদের রূপক অবলম্বন করে এরই মধ্যে বিবাহ সম্বন্ধে ত্রিপদীছন্দে একটা কবিতা লিখেচে। সেক্রেটারি বাবু সেই কবিতাটা নিয়ে রাস্তায় ঘাটে যাকে পেয়েচেন তাকে ধরে ধরে শুনিয়েচেন। ছেলেটির সম্বন্ধে গ্রামের লোক খুব আশান্বিত হয়ে উঠেচে।

সুতরাং ফিরে এসেই বাইরে থেকেই বাবা শুভসংবাদ শুন্‌তে পেলেন। তারপরে মায়ের কান্না এবং অনাহার, বাড়ির সকলের

ভীতিবিহ্বলতা, চাকরদের অকারণ জরিমানা, এজলাসে প্রবলবেগে মামলা ডিস্‌মিস্‌ এবং প্রচণ্ডতেজে শাস্তিদান, পণ্ডিতমশায়ের পদচ্যুতি এবং রাঙ্‌তা-জড়ানো বেণীসহ কাশীশ্বরীকে নিয়ে তাঁর অন্তর্দ্ধান; এবং ছুটি ফুরোবার পূর্ব্বেই মাতৃসঙ্গ থেকে বিচ্ছিন্ন করে আমাকে সবলে কলকাতায় নির্ব্বাসন। আমার মনটা ফাটা ফুটবলের মত চুপ্‌সে গেল—আকাশে আকাশে হাওয়ার উপরে তার লাফালাফি একেবারে বন্ধ হল।

(২)

আমার পরিণয়ের পথে গোড়াতেই এই বিঘ্ন—তার পরে আমার প্রতি বারে-বারেই প্রজাপতির ব্যর্থ-পক্ষপাত ঘটেচে। তার বিস্তারিত বিবরণ দিতে ইচ্ছা করিনে—আমার এই বিফলতার ইতিহাসের সংক্ষিপ্ত নোট দুটো একটা রেখে যাব। বিশ বছর বয়সের পূর্ব্বেই আমি পূরা দমে এম্‌ এ, পরীক্ষা পাস করে চোখে চষমা পরে এবং গোঁফের রেখাটাকে তা' দেবার যোগ্য করে বেরিয়ে এসেচি। বাবা তখন রামপুরহাট কিম্বা নোয়াখালি কিম্বা বারাসত কিম্বা ঐরকম কোনো একটা জায়গায়। এতদিন ত শব্দসাগর মন্থন করে ডিগ্রিরত্ন পাওয়া গেল এবার অর্থসাগর মন্থনের পালা। বাবা তাঁর বড় বড় পেট্রন সাহেবদের স্মরণ করতে গিয়ে দেখ্‌লেন তাঁর সব চেয়ে বড় সহায় যিনি তিনি পরলোকে, তাঁর চেয়ে যিনি কিছু কম তিনি পেন্সন্‌ নিয়ে বিলেতে, যিনি আরো কমজোরী তিনি পাঞ্জাবে বদ্‌লি হয়েছেন, আর যিনি বাংলা দেশে বাকি আছেন তিনি অধিকাংশ উমেদারকেই উপক্রমণিকায়

আশ্বাস দেন কিন্তু উপসংহারে সেটা সংহরণ করেন। আমার পিতামহ যখন ডিপুটি ছিলেন তখন মুরুব্বির বাজার এমন কষা ছিলনা, তাই তখন চাকরি থেকে পেন্‌সন এবং পেন্‌সন থেকে চাকরি একই বংশে খেয়া-পারাপারের মত চল্‌ত। এখন দিন খারাপ তাই বাবা যখন উদ্বিগ্ন হয়ে ভাব্‌ছিলেন যে তাঁর বংশধর গভর্মেণ্ট আপিসের উচ্চ খাঁচা থেকে সওদাগরি আপিসের নিম্ন দাঁড়ে অবতরণ করবে কি না এমন সময় এক ধনী ব্রাহ্মণের একমাত্র কন্যা তাঁর নোটিসে এল। ব্রাহ্মণটি কন্‌ট্র্যাক্টর, তাঁর অর্থাগমের পথটি প্রকাশ্য ভূতলের চেয়ে অদৃশ্য রসাতলের দিক দিয়েই প্রশস্ত ছিল। তিনি সে সময়ে বড় দিন উপলক্ষে কমলালেবু ও অন্যান্য উপহার সামগ্রী যথাযোগ্য পাত্রে বিতরণ করতে ব্যস্ত ছিলেন এমন সময়ে তাঁর পাড়ায় আমরা অভ্যুদয় হল। বাবার বাসা ছিল তাঁর বাড়ির সামনেই, মাঝে ছিল এক রাস্তা। বলা বাহুল্য ডেপুটির এম্‌-এ পাসঃকরা ছেলে কন্যাদায়িকের পক্ষে খুব "প্রাংশুলভ্য ফল"। এইজন্যে কন্‌ট্রাক্টর বাবু আমার প্রতি "উদ্বাহু" হয়ে উঠেছিলেন। তাঁর বাহু আধূলিলম্বিত ছিল সে পরিচয় পূর্ব্বেই দিয়েচি—অন্তত সে বাহু ডেপুটি বাবুর হৃদয় পর্য্যন্ত অতি অনায়াসে পৌঁছল। কিন্তু আমার হৃদয়টা তখন আরো অনেক উপরে ছিল।

কারণ আমার বয়স তখন কুড়ি পেরয়-পেরয়, তখন খাঁটি স্ত্রীরত্ন ছাড়া অন্য কোনো রত্নের প্রতি আমার লোভ ছিল না। শুধু তাই নয় তখনো ভাবুকতার দীপ্তি আমার মনে উজ্জ্বল। অর্থাৎ সহধর্ম্মিণী শব্দের যে-অর্থ আমার মনে ছিল সে-অর্থটা বাজারে চলিত ছিল না। বর্ত্তমান কালে আমাদের দেশে সংসারটা চারদিকেই সঙ্কুচিত, মনন-সাধনের বেলায় মনকে জ্ঞান ও ভাবের উদার ক্ষেত্রে

ব্যাপ্ত করে রাখা আর ব্যবহারের বেলায় তাকে সেই সংসারের অতি ছোট মাপে কৃশ করে আনা এ আমি মনে মনেও সহ্য করতে পারতুম না। যে-স্ত্রীকে আইডিয়ালের পথে সঙ্গিনী করতে চাই, সেই স্ত্রী ঘরকন্নার গারদে পায়ের বেড়ি হয়ে থাক্‌বে এবং প্রত্যেক চলাফেরায় ঝঙ্কার দিয়ে পিছনে টেনে রাখ্‌বে এমন দুগ্রহ আমি স্বীকার করে নিতে নারাজ ছিলুম। আসল কথা আমাদের দেশের প্রহসনে যাদের আধুনিক বলে' বিদ্রূপ করে, কলেজ থেকে টাট্‌কা বেরিয়ে আমি সেই রকম নিরবচ্ছিন্ন আধুনিক হয়ে উঠেছিলুম। আমাদের কালে সেই আধুনিকের দল এখনকার চেয়ে অনেক বেশী ছিল। আশ্চর্য্য এই যে, তারা সত্যই বিশ্বাস করত যে, সমাজকে মেনে চলাই দুর্গতি এবং তাকে টেনে চলাই উন্নতি।

এ-হেন আমি শ্রীযুক্ত সনৎকুমার, একটি বলশালী কন্যাদায়িকের টাকার থলির হাঁ-করা মুখের সাম্‌নে এসে পড়লুম। বাবা বল্লেন "শুভস্য শীঘ্রং।" আমি চুপ করে রইলুম, মনে মনে ভাবলুম একটু দেখে শুনে বুঝে পড়ে নিই। চোখ কান খুলে রাখলুম—কিছু পরিমাণ দেখা এবং অনেকটা পরিমাণ শোনা গেল। মেয়েটি পুতুলের মত ছোট এবং সুন্দর—সে যে স্বভাবের নিয়মে তৈরি হয়েচে তা তাকে দেখে মনে হয় না—কে যেন তার প্রত্যেক চুলটি পাট করে' তার ভুরুটি এঁকে তাকে হাতে করে গড়ে তুলেচে। সে সংস্কৃত ভাষায় গঙ্গার স্তব আবৃত্তি করে পড়তে পারে। তার মা পাথুরে কয়লা পর্য্যন্ত গঙ্গার জলে ধুয়ে তবে রাঁধেন; জীবধাত্রী বসুন্ধরা নানা জাতিকে ধারণ করেন বলে পৃথিবীর সংস্পর্শ সম্বন্ধে তিনি সর্ব্বদাই সঙ্কুচিত; তাঁর অধিকাংশ ব্যবহার জলেরই সঙ্গে, কারণ জলচর মৎস্যরা মুসল-

মান-বংশীয় নয় এবং জলে পেঁয়াজ উৎপন্ন হয় না। তাঁর জীবনের সর্ব্বপ্রধান কাজ আপনার দেহকে গৃহকে কাপড় চোপড় হাঁড়িকুঁড়ি খাটপালং বাসন-কোসনকে শোধন এবং মার্জ্জন করা। তাঁর সমস্ত কৃত্য সমাপন করতে বেলা আড়াইটে হয়ে যায়। তাঁর মেয়েটিকে তিনি স্বহস্তে সর্ব্বাংশে এমনি পরিশুদ্ধ করে তুলেচেন যে তার নিজের মত বা নিজের ইচ্ছা বলে কোনো উৎপাত ছিল না। কোনো ব্যবস্থায় যত অসুবিধাই হোক সেটা পালন করা তার পক্ষে সহজ হয় যদি তার কোনো সঙ্গত কারণ তাকে বুঝিয়ে না দেওয়া যায়। সে খাবার সময় ভাল কাপড় পরে না পাছে সক্‌ড়ি হয়, সে ছায়া সম্বন্ধেও বিচার করতে শিখেচে। সে যেমন পাল্কীর ভিতরে বসেই গঙ্গাস্নান করে, তেমনি অষ্টাদশ পুরাণের মধ্যে আবৃত থেকে সংসারে চলে ফেরে। বিধি-বিধানের পরে আমারো মায়ের যথেষ্ট শ্রদ্ধা ছিল কিন্তু তাঁর চেয়ে আরো বেশী শ্রদ্ধা যে আর কারো থাক্‌বে এবং তাই নিয়ে সে মনে মনে গুমর করবে এটা তিনি সইতে পারতেন না। এইজন্যে আমি যখন তাঁকে বল্লুম, "মা, এ মেয়ের যোগ্য পাত্র আমি নই"— তিনি হেসে বল্লেন, "না, কলিযুগে তেমন পাত্র মেলা ভার!" আমি বল্লুম, "তাহলে আমি বিদায় নিই!" মা বল্লেন, "সে কি সুনু, তোর পছন্দ হল না? কেন, মেয়েটিকে ত দেখতে ভাল।" আমি বল্লুম, "মা, স্ত্রী ত কেবল চেয়ে চেয়ে দেখবার জন্যে নয়, তার বুদ্ধি থাকাও চাই!" মা বল্লেন, "শোন একবার! এরি মধ্যে তুই তার কম বুদ্ধির পরিচয় কি পেলি!" আমি বল্লুম, "বুদ্ধি থাক্‌লে মানুষ দিনরাত এই সব অনর্থক অকাজের মধ্যে বাঁচতেই পারে না। হাঁপিয়ে মরে যায়!"

মায়ের মুখ শুকিয়ে গেল। তিনি জানেন, এই বিবাহ সম্বন্ধে বাবা অপর পক্ষে প্রায় পাকা কথা দিয়েচেন। তিনি আরও জানেন যে, বাবা এটা প্রায়ই ভুলে যান যে, অন্য মানুষেরও ইচ্ছে বলে একটা বালাই থাক্‌তে পারে। বস্তুত বাবা যদি অত্যন্ত বেশী রাগারাগি জবরদস্তি না করতেন তাহলে হয় ত কালক্রমে ঐ পৌরাণিক পুতুলকে বিবাহ করে আমিও একদিন প্রবল ঝোঁকে স্নান আহ্নিক এবং ব্রত উপবাস করতে করতে গঙ্গাতীরে সদ্গতি লাভ করতে পারতুম। অর্থাৎ মায়ের উপর যদি এই বিবাহ দেবার ভার থাক্‌ত তাহলে তিনি সময় নিয়ে অতি ধীর মন্দ সুযোগে ক্ষণে ক্ষণে কানে মন্ত্র দিয়ে ক্ষণে ক্ষণে অশ্রুপাত করে কাজ উদ্ধার করে নিতে পারতেন। বাবা যখন কেবলি তর্জ্জন গর্জ্জন করতে লাগলেন আমি তাঁকে মরিয়া হয়ে বল্লুম—"ছেলেবেলা থেকে খেতে শুতে চল্‌তে ফিরতে আমাকে আত্মনির্ভর উপদেশ দিয়েচেন, কেবল বিবাহের বেলাতেই কি আত্মনির্ভর চল্‌বে না?" কলেজে লজিকে পাস করবার বেলায় ছাড়া ন্যায়শাস্ত্রের জোরে কেউ কোনো দিন সফলতা লাভ করেচে এ আমি দেখি নি। সঙ্গত যুক্তি কুতর্কের আগুনে কখনো জলের মত কাজ করে না, বরঞ্চ তেলের মতই কাজ করে থাকে। বাবা ভেবে রেখেচেন তিনি অন্য পক্ষকে কথা দিয়েচেন বিবাহের ঔচিত্য সম্বন্ধে এর চেয়ে বড় প্রমাণ আর কিছুই নেই। অথচ আমি যদি তাঁকে স্মরণ করিয়ে দিতুম যে পণ্ডিতমশায়কে মাও একদিন কথা দিয়েছিলেন তবু সে কথায় শুধু যে আমার বিবাহ ফেঁসে গেল তা নয় পণ্ডিতমশায়ের জীবিকাও তার সঙ্গে সহমরণে গেল—তাহলে এই উপলক্ষে একটা ফৌজদারি বাধত। বুদ্ধি বিচার এবং রুচির চেয়ে শুচিতা মন্ত্রতন্ত্র ক্রিয়াকর্ম্ম যে ঢের ভাল,

তার কবিত্ব যে সুগভীর ও সুন্দর, তার নিষ্ঠা যে অতি মহৎ, তার ফল যে অতি উত্তম, সিম্বলিজ্‌মটাই যে আইডিয়ালিজ্‌ম্ এ কথা বাবা আজকাল আমাকে শুনিয়ে শুনিয়ে সময়ে অসময়ে আলোচনা করেছেন। আমি রসনাকে থামিয়ে রেখেচি কিন্তু মনকে ত চুপ করিয়ে রাখতে পারি নি। যে-কথাটা মুখের আগার কাছে এসে ফিরে যেত সেটা হচ্ছে এই যে, এ সব যদি আপনি মানেন তবে পাল্‌বার বেলায় মুর্‌গি পালেন কেন? আরো একটা কথা মনে আসত; বাবাই একদিন দিনক্ষণ পালপার্ব্বণ বিধিনিষেধ দান দক্ষিণা নিয়ে তাঁর অসুবিধা বা ক্ষতি ঘটলে মাকে কঠোর ভাষায় এ সব অনুষ্ঠানের পণ্ডতা নিয়ে তাড়না করেচেন। মা তখন দীনতা স্বীকার করে', অবলা জাতি স্বভাবতই অবুঝ বলে', মাথা হেঁট করে বিরক্তির ধাক্কাটা কাটিয়ে দিয়ে ব্রাহ্মণ ভোজনের বিস্তারিত আয়োজনে প্রবৃত্ত হয়েচেন। কিন্তু বিশ্বকর্ম্মা লজিকের পাকা ছাঁচে ঢালাই করে জীব সৃজন করেন নি। অতএব কোনো মানুষের কথায় বা কাজে সঙ্গতি নেই এ কথা বলে তাকে বাগিয়ে নেওয়া যায় না, রাগিয়ে দেওয়া হয় মাত্র। ন্যায়-শাস্ত্রের দোহাই পাড়লে অন্যায়ের প্রচণ্ডতা বেড়ে ওঠে,—যারা পোলিটিকাল বা গার্হস্থ্য অ্যাজিটেশনে শ্রদ্ধাবান তাদের এ কথাটা মনে রাখা উচিত। ঘোড়া যখন তার পিছনের গাড়িটাকে অন্যায় মনে করে' তার উপরে লাথি চালায় তখন অন্যায়টা ত থেকেই যায় মাঝের থেকে তার পাকেও জখম করে। যৌবনের আবেগে অল্প একটুখানি তর্ক করতে গিয়ে আমার সেই দশা হল। পৌরাণিকী মেয়েটির হাত থেকে রক্ষা পাওয়া গেল বটে কিন্তু বাবার আধুনিক যুগের তহবিলের আশ্রয়ও খোওয়ালুম। বাবা বল্লেন,

"যাও তুমি আত্মনির্ভর করগে!" আমি প্রণাম করে বল্লুম, "যে আজ্ঞে!" মা বসে বসে কাঁদতে লাগলেন।

বাবার দক্ষিণ হস্ত বিমুখ হল বটে কিন্তু মাঝখানে মা থাকাতে ক্ষণে ক্ষণে মানি-অর্ডরের পেয়াদার দেখা পাওয়া যেত। মেঘ বর্ষণ বন্ধ করে দিলে, কিন্তু গোপনে স্নিগ্ধ রাত্রে শিশিরের অভিষেক চল্‌তে গেল। তারই জোরে ব্যবসা সুরু করে ছিলুম। ঠিক উনআশি টাকা দিয়ে গোড়াপত্তন হল। আজ সেই কারবারে যে-মূলধন খাট্‌চে তা ঈর্ষা-কাতর জনশ্রুতির চেয়ে অনেক কম হলেও বিশ লক্ষ টাকার চেয়ে কম নয়।

প্রজাপতির পেয়াদারা আমার পিছন পিছন ফিরতে লাগ্‌ল। আগে যে-সব দ্বার বন্ধ ছিল এখন তার আর আগল রইল না। মনে আছে একদিন যৌবনের দুর্নিবার দুরাশায় একটি ষোড়শীর প্রতি (বয়সের অঙ্কটা এখনকার নিষ্ঠাবান পাঠকদের ভয়ে কিছু সহনীয় করে বল্লুম) আমার হৃদয়কে উন্মুখ করেছিলুম কিন্তু খবর পেয়েছিলুম কন্যার মাতৃপক্ষ লক্ষ্য করে আছেন সিবিলিয়ানের প্রতি—অন্তত ব্যারিষ্টারের নীচে তাঁর দৃষ্টি পৌঁছয় না। আমি তাঁর মনোযোগ-মীটরের জিরো-পয়েন্টের নীচে ছিলুম। কিন্তু পরে সেই ঘরেই অন্য একদিন শুধু চা নয় লাঞ্চ্ খেয়েচি, রাত্রে ডিনারের পর মেয়েদের সঙ্গে হুইস্‌ট্ খেলেচি, তাদের মুখে বিলেতের একেবারে খাষ্ মহলের ইংরেজি ভাষার কথাবার্ত্তা শুনেচি। আমার মুস্কিল এই যে, র‍্যাসেলস্, ডেজার্টেড্ ভিলেজ এবং অ্যাডিসন্ ষ্টীল্ পড়ে আমি ইংরিজি পাকিয়েচি, এই মেয়েদের সঙ্গে পাল্লা দেওয়া আমার কর্ম্ম নয়। O my, O dear O dear প্রভৃতি উদ্ভাষণগুলো আমার মুখ দিয়ে ঠিক সুরে বেরবেই

চায় না। আমার যতটুকু বিদ্যা তাতে আমি অত্যন্ত হাল ইংরেজি ভাষায় বড়জোর হাটেবাজারে কেনা-বেচা করতে পারি কিন্তু বিংশ শতাব্দীর ইংরিজিতে প্রেমালাপ করার কথা মনে করলে আমার প্রেমই দৌড় মারে। অথচ এদের মুখে বাংলা ভাষার যে রকম দুর্ভিক্ষ তাতে এদের সঙ্গে খাঁটি বঙ্কিমী সুরে মধুরালাপ করতে গেলে ঠক্‌তে হবে। তাতে মজুরি পোষাবে না। তা যাই হোক্, এই সব বিলিতি গিল্টি করা মেয়ে একদিন আমার পক্ষে সুলভ হয়েছিল। কিন্তু রুদ্ধ দরজার ফাঁকের থেকে যে-মায়াপুরী দেখেছিলুম দরজা যখন খুল্‌ল তখন আ'র তার ঠিকানা পেলুম না। তখন আমার কেবল মনে হতে লাগল সেই যে আমার ব্রহ্মচারিণী নিরর্থক নিয়মের নিরন্তর পুনরাবৃত্তির পাকে অহোরাত্র ঘুরে ঘুরে আপনার জড়-বুদ্ধিকে তৃপ্ত করত, এই মেয়েরাও ঠিক সেই বুদ্ধি নিয়েই বিলিতি চালচলন আদব কায়দার সমস্ত তুচ্ছাতিতুচ্ছ উপসর্গ গুলিকে প্রদক্ষিণ করে দিনের পর দিন বৎসরের পর বৎসর অনায়াসে অক্লান্তচিত্তে কাটিয়ে দিচ্চে। তারাও যেমন ছোঁয়া ও নাওয়ার লেশমাত্র স্খলন দেখলে অশ্রদ্ধায় কণ্টকিত হয়ে উঠ্‌ত এরাও তেম্‌নি এক্‌সেণ্টের একটু খুঁৎ কিম্বা কাঁটা চাম্‌চের অল্প বিপর্য্যয় দেখ্‌লে ঠিক তেমনি করেই অপরাধীর মনুষ্যত্ব সম্বন্ধে সন্দিহান হয়ে ওঠে। তারা দিশি পুতুল, এরা বিলিতি পুতুল। মনের গতি-বেগে এরা চলে না, অভ্যাসের দম দেওয়া কলে এদের চালায়। ফল হল এই যে, মেয়ে জাতের উপরেই আমার মনে মনে অশ্রদ্ধা জন্মাল, আমি ঠিক করলুম, ওদের বুদ্ধি যখন কম তখন স্নান আচমন উপবাসের অকর্ম্ম-কাণ্ড প্রকাণ্ড না হলে ওরা বাঁচে কি করে। বইয়ে পড়েচি একরকম জীবাণু আছে সে ক্রমাগতই ঘোরে কিন্তু মানুষ ঘোরে না, মানুষ চলে। সেই জীবাণুর পরিবর্দ্ধিত

সংস্করণের সঙ্গেই কি বিধাতা হতভাগ্য পুরুষমানুষের বিবাহের সম্বন্ধ পাতিয়েচেন!

এদিকে বয়স যত বাড়তে চল্‌ল বিবাহ সম্বন্ধে দ্বিধাও তত বেড়ে উঠ্‌ল। মানুষের একটা বয়স আছে যখন সে চিন্তা না করেও বিবাহ করতে পারে। সে বয়স পেরলে বিবাহ করতে দুঃসাহসিকতার দরকার হয়। আমি সেই বে-পরোয়া দলের লোক নই। তা ছাড়া কোনো প্রকৃতিস্থ মেয়ে বিনা কারণে এক নিশ্বাসে আমাকে কেন যে বিয়ে করে ফেল্‌বে আমি তা কিছুতেই ভেবে পাই নে। শুনেচি ভালবাসা অন্ধ কিন্তু এখানে সেই অন্ধের উপর ত কোন ভার নেই। সংসার-বুদ্ধির দুটো চোখের চেয়ে আরো বেশী চোখ আছে—সেই চক্ষু যখন বিনা নেশায় আমার দিকে তাকিয়ে দেখে তখন আমার মধ্যে কি দেখতে পায় আমি তাই ভাবি। আমার গুণ নিশ্চয়ই অনেক আছে কিন্তু সে গুলো ত ধরা পড়তে দেরি লাগে, এক-চাহনিতেই বোঝা যায় না। আমার নাসার মধ্যে যে-খর্ব্বতা আছে বুদ্ধির উন্নতি তা পূরণ করেচে জানি কিন্তু নাসাটাই থাকে প্রত্যক্ষ হয়ে আর ভগবান বুদ্ধিকে নিরাকার করে রেখে দিলেন। যাই হোক্ যখন দেখি কোন সাবালক মেয়ে অত্যল্প কালের নোটিসেই আমাকে বিয়ে করতে অত্যল্প-মাত্র আপত্তি করে না তখন মেয়েদের প্রতি আমার শ্রদ্ধা আরো কমে। আমি যদি মেয়ে হতুম তাহলে শ্রীযুৎ সনৎকুমারের নিজের খর্ব্ব নাসার দীর্ঘনিশ্বাসে তার আশা এবং অহঙ্কার ধূলিসাৎ হতে থাক্‌ত।

এমনি করে আমার বিবাহের বোঝাইহীন নৌকাটা মাঝে মাঝে চড়ায় ঠেকেচে কিন্তু ঘাটে এসে পৌঁছয় নি। স্ত্রী ছাড়া সংসারের অন্যান্য উপকরণ ব্যবসার উন্নতির সঙ্গে বেড়ে চল্‌তে লাগ্‌ল। একটা

কথা ভুলে ছিলুম বয়সও বাড়চে। হঠাৎ একটা ঘটনায় সে কথা মনে করিয়ে দিলে।

অভ্রের খনির তদন্তে ছোটনাগপুরের এক সহরে গিয়ে দেখি পণ্ডিত-মশায় সেখানে শাল বনের ছায়ায় ছোট্ট একটি নদীর ধারে দিব্যি বাসা বেঁধে বসে আছেন। তাঁর ছেলে সেখানে কাজ করে। সেই শাল-বনের প্রান্তে আমার তাঁবু পড়েছিল। এখন দেশ জুড়ে আমার ধনের খ্যাতি। পণ্ডিতমশায় বল্লেন, কালে আমি যে অসামান্য হয়ে উঠ্‌ব এ তিনি পূর্ব্বেই জানতেন। তা হবে, কিন্তু আশ্চর্য্য রকম গোপন করে রেখেছিলেন। তা ছাড়া কোন্ লক্ষণের দ্বারা জেনেছিলেন আমি ত তা বল্‌তে পারি নে। বোধ করি অসামান্য লোকদের ছাত্র অবস্থায় ষত্বণত্ব জ্ঞান থাকে না। কাশীশ্বরী শ্বশুর বাড়িতে ছিল, তাই বিনা বাধায় আমি পণ্ডিতমশায়ের ঘরের লোক হয়ে উঠ্‌লুম। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে তাঁর স্ত্রী বিয়োগ হয়েচে—কিন্তু তিনি নাৎনীতে পরিবৃত। সবগুলি তাঁর স্বকীয়া নয়, তার মধ্যে দুটি ছিল তাঁর পরলোকগত দাদার। বৃদ্ধ এদের নিয়ে আপনার বার্দ্ধক্যের অপরাহ্ণকে নানা রঙে রঙীন করে তুলেছেন। তাঁর অমরু শতক আর্য্যাসপ্তশতী হংসদূত পদাঙ্কদূতের শ্লোকের ধারা নুড়িগুলির চারদিকে গিরিনদীর ফেনোচ্ছল প্রবাহের মত এই মেয়েগুলিকে ঘিরে ঘিরে সহাস্যে ধ্বনিত হয়ে উঠ্‌চে। আমি হেসে বল্লুম, "পণ্ডিতমশায়, ব্যাপার খানা কি!" তিনি বল্লেন, "বাবা, তোমাদের ইংরাজি শাস্ত্রে বলে যে শনিগ্রহ চাঁদের মালা পরে থাকেন, এই আমার সেই চাঁদের মালা।"

সেই দরিদ্র ঘরের এই দৃশ্যটি দেখে হঠাৎ আমার মনে পড়ে গেল আমি একা। বুঝতে পারলুম আমি নিজের ভারে নিজে ক্লান্ত

হয়ে পড়েচি। পণ্ডিতমশায় জানেন না যে, তাঁর বয়স হয়েচে, কিন্তু আমার যে হয়েচে সে আমি স্পষ্ট জান্‌লুম। বয়স হয়েচে বল্‌তে এইটে বোঝায়, নিজের চারিদিককে ছাড়িয়ে এসেচি— চারপাশে ঢিলে হয়ে ফাঁক হয়ে গেচে। সে-ফাঁক টাকা দিয়ে খ্যাতি দিয়ে বোজান যায় না। পৃথিবী থেকে রস পাচ্চি নে কেবল বস্তু সংগ্রহ করচি এর ব্যর্থকতা অভ্যাস বশত ভুলে থাকা যায় কিন্তু পণ্ডিতমশায়ের ঘর যখন দেখলুম তখন বুঝলুম, আমার দিন শুষ্ক আমার রাত্রি শূন্য। পণ্ডিতমশায় নিশ্চয় ঠিক করে বসে আছেন যে আমি তাঁর চেয়ে ভাগ্যবান পুরুষ এই কথা মনে করে আমার হাসি এল। এই বস্তুজগৎকে ঘিরে একটি অদৃশ্য আনন্দলোক আছে। সেই আনন্দলোকের সঙ্গে আমাদের জীবনের যোগসূত্র না থাক্‌লে আমরা ত্রিশঙ্কুর মত শূন্যে থাকি। পণ্ডিতমশায়ের সেই যোগ আছে, আমার নেই, এই তফাৎ। আমি আরাম-কেদারার দুই হাতায় দুই পা তুলে দিয়ে সিগরেট খেতে খেতে ভাবতে লাগলুম পুরুষের জীবনের চার আশ্রমের চার অধিদেবতা। বাল্যে মা; যৌবনে স্ত্রী; প্রৌঢ়ে কন্যা, পুত্রবধূ; বার্দ্ধক্যে নাৎনী, নাৎবৌ। এমনি করে মেয়েদের মধ্যদিয়ে পুরুষ আপনার পূর্ণতা পায়। এই তত্ত্বটা মর্ম্মরিত শালবনে আমাকে আবিষ্ট করে ধরল। মনের সাম্‌নে আমার ভাবী বৃদ্ধ বয়সের শেষ প্রান্ত পর্য্যন্ত তাকিয়ে দেখলুম—দেখে তার নিরতিশয় নীরসতায় হৃদয়টা হাহাকার করে উঠ্‌ল। ঐ মরুপথের মধ্য দিয়ে মুনফার বোঝা ঘাড়ে করে নিয়ে কোথায় গিয়ে মুখ থুব্‌ড়ে পড়ে মরতে হবে! আর দেরি করলে ত চলবে না। সম্প্রতি চল্লিশ পেরিয়েছি—যৌবনের শেষ থলিটি ঝেড়ে নেবার জন্যে পঞ্চাশ রাস্তার ধারে বসে আছে, তার লাঠির

ডগাটা এইখান থেকে দেখা যাচ্চে। এখন পকেটের কথাটা বন্ধ রেখে জীবনের কথাটা একটুখানি ভেবে দেখা যাক্। কিন্তু জীবনের যে-অংশে মুলতুবি পড়েচে সে-অংশে আর ত ফিরে যাওয়া চল্‌বে না। তবু তার ছিন্নতায় তালি লাগাবার সময় এখনো সম্পূর্ণ যায় নি।

এখান থেকে কাজের গতিকে পশ্চিমের এক সহরে যেতে হল। সেখানে বিশ্বপতি বাবু ধনী বাঙালী মহাজন। তাঁকে নিয়ে আমার কাজের কথা ছিল। লোকটি খুব হুঁসিয়ার, সুতরাং তাঁর সঙ্গে কোনো কথা পাকা করতে বিস্তর সময় লাগে। এক দিন বিরক্ত হয়ে যখন ভাবচি এঁকে নিয়ে আমার কাজের সুবিধা হবে না, এমন কি, চাকরকে আমার জিনিস-পত্র প্যাক করতে বলে দিয়েচি হেনকালে বিশ্বপতি বাবু সন্ধ্যার সময় এসে আমাকে বল্লেন, "আপনার সঙ্গে নিশ্চয়ই অনেক রকম লোকের আলাপ আছে আপনি একটু মনোযোগ করলে একটি বিধবা বেঁচে যায়।"

ঘটনাটি এই—নন্দকৃষ্ণ বাবু বেরেলিতে প্রথমে আসেন একটি বাঙালী-ইংরাজি স্কুলের হেডমাষ্টার হয়ে। কাজ করেছিলেন খুব ভাল। সকলেই আশ্চর্য্য হয়েছিল এমন সুযোগ্য সুশিক্ষিত লোক দেশ ছেড়ে এতদূরে সামান্য বেতনে চাকরি করতে এলেন কি কারণে। কেবল যে পরীক্ষা পাস করতে তাঁর খ্যাতি ছিল তা নয়, সকল ভাল কাজেই তিনি হাত দিয়েছিলেন। এমন সময় কেমন করে বেরিয়ে পড়ল তাঁর স্ত্রীর রূপ ছিল বটে কিন্তু কুল ছিল না। সামান্য কোন্ জাতের মেয়ে, এমন কি তার ছোঁওয়া লাগ্‌লে পানীয় জলের পানীয়তা এবং অন্যান্য নিগূঢ় সাত্ত্বিক গুণ নষ্ট হয়ে যায়। তাঁকে যখন সবাই চেপে ধরলে তিনি বল্লেন, হাঁ, জাতে ছোট বটে কিন্তু তবু সে তাঁর স্ত্রী। তখন প্রশ্ন উঠল, এমন বিবাহ বৈধ হয় কি করে? যিনি প্রশ্ন করেছিলেন নন্দকৃষ্ণ বাবু তাকে বল্লেন, আপনি ত

শালগ্রাম সাক্ষী করে' পরে পরে ছুটি স্ত্রী বিবাহ করেচেন এবং দ্বিবচনেও সন্তুষ্ট নেই তার বহু প্রমাণ দিয়েচেন। শালগ্রামের কথা বল্‌তে পারিনে কিন্তু অন্তর্য্যামী জানেন আমার বিবাহ আপনার বিবাহের চেয়ে বৈধ, প্রতিদিন প্রতিমুহূর্ত্তে বৈধ—এর চেয়ে বেশী কথা আমি আপনাদের সঙ্গে আলোচনা করতে চাইনে।" যাকে নন্দকৃষ্ণ এই কথা গুলি বল্লেন তিনি খুসি হন নি। তার উপরে লোকের অনিষ্ট করবার ক্ষমতাও তাঁর অসামান্য ছিল। সুতরাং সেই উপদ্রবে নন্দকৃষ্ণ বেরিলি ত্যাগ করে এই বর্ত্তমান সহরে এসে ওকালতি সুরু করলেন। লোকটা অত্যন্ত খুঁৎখুতে ছিলেন,—উপবাসী থাক্‌লেও অন্যায় মকদ্দমা তিনি কিছুতেই নিতেন না। প্রথমটা তাতে তাঁর যত অসুবিধা হোক্‌ শেষকালে উন্নতি হতে লাগ্‌ল। কেননা হাকিমরা তাঁকে সম্পূর্ণ বিশ্বাস করতেন। একখানি বাড়ি করে' একটু জমিয়ে বসেচেন এমন সময় দেশে মন্বন্তর এল। দেশ উজাড় হয়ে যায়। যাদের উপর সাহায্য বিতরণের ভার ছিল তাদের মধ্যে কেউ কেউ চুরি করছিল বলে তিনি ম্যাজিষ্ট্রেট্‌কে জানাতেই ম্যাজিষ্ট্রেট্‌ বল্লেন, "সাধুলোক পাই কোথায় ?" তিনি বল্লেন, "আমাকে যদি বিশ্বাস করেন আমি এ কাজের কতক ভার নিতে পারি।" তিনি ভার পেলেন এবং এই ভার বহন করতে করতেই একদিন মধ্যাহ্নে মাঠের মধ্যে এক গাছ তলায় মারা যান। ডাক্তার বল্লে, তাঁর হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে মৃত্যু হয়েচে।

গল্পের এতটা পর্য্যন্ত আমার পূর্ব্বেই জানা ছিল। কেমন একটা উচ্চ ভাবের মেজাজে এঁরই কথা তুলে আমাদের ক্লাবে আমি বলেছিলুম, "এই নন্দকৃষ্ণের মত লোক যারা সংসারে ফেল করে শুকিয়ে মরে গেচে,—না রেখেচে নাম, না রেখেচে টাকা,—তারাই ভগবানের

সহযোগী হয়ে সংসারটাকে উপরের দিকে”—এইটুকু মাত্র বল্‌তেই ভরা পালের নৌকা হঠাৎ চড়ায় ঠেকে যাওয়ার মত, আমার কথা মাঝখানে বন্ধ হয়ে গেল। কারণ আমাদের মধ্যে খুব একজন সম্পত্তি ও প্রতিপত্তিশালী লোক খবরের কাগজ পড়ছিলেন—তিনি তাঁর চষমার উপর থেকে আমার প্রতি দৃষ্টি হেনে বলে উঠলেন, “হিয়ার্ হিয়ার্!”

যাক্ গে। শোনা গেল নন্দকৃষ্ণর বিধবা স্ত্রী তাঁর একটি মেয়েকে নিয়ে এই পাড়াতেই থাকেন। দেয়ালির রাত্রে মেয়েটির জন্ম হয়েছিল বলে বাপ তার নাম দিয়েছিলেন, দীপালি। বিধবা কোনো সমাজে স্থান পান না বলে সম্পূর্ণ একলা থেকে এই মেয়েটিকে লেখাপড়া শিখিয়ে মানুষ করেচেন। এখন মেয়েটির বয়স পঁচিশের উপর হবে। মায়ের শরীর রুগ্ন এবং বয়সও কম নয়—কোন্‌দিন তিনি মারা যাবেন তখন এই মেয়েটির কোথাও কোনো গতি হবে না। বিশ্বপতি আমাকে বিশেষ অনুনয় করে বল্লেন, “যদি এর পাত্র জুটিয়ে দিতে পারেন ত সেটা একটা পুণ্যকর্ম্ম হবে।”

আমি বিশ্বপতিকে শুক্‌নো স্বার্থপর নিরেট কাজের লোক বলে মনে মনে একটু অবজ্ঞা করেছিলুম। বিধবার অনাথা মেয়েটির জন্য তাঁর এই আগ্রহ দেখে আমার মন গলে গেল। ভাবলুম, প্রাচীন পৃথিবীর মৃত ম্যামথের পাকযন্ত্রের মধ্যে থেকে খাদ্যবীজ বের করে পুঁতে দেখা গেছে তার থেকে অঙ্কুর বেরিয়েচে—তেমনি মানুষের মনুষ্যত্ব বিপুল মৃত-স্তূপের মধ্যে থেকেও সম্পূর্ণ মরতে চায় না।

আমি বিশ্বপতিকে বল্লুম, “পাত্র আমার জানা আছে, কোনো বাধা হবে না। আপনারা কথা এবং দিন ঠিক করুন।”

"কিন্তু মেয়ে না-দেখেই ত আর"—

"না-দেখেই হবে।

"কিন্তু পাত্র যদি সম্পত্তির লোভ করে সে বড় বেশী নেই। মা মরে গেলে কেবল ঐ বাড়ীখানি পাবে, আর সামান্য যদি কিছু পায়।"

"পাত্রের নিজের সম্পত্তি আছে সে জন্যে ভাবতে হবে না।"

"তাঁর নাম বিবরণ প্রভৃতি"—

"সে এখন বলব না, তাহলে জানাজানি হয়ে বিবাহ ফেঁসে যেতে পারে।"

"মেয়ের মাকে ত তার একটা বর্ণনা দিতে হবে।"

"বলবেন, লোকটা অন্য সাধারণ মানুষের মত দোষে গুণে জড়িত। দোষ এত বেশী নেই যে, ভাবনা হতে পারে; গুণও এত বেশী নেই যে, লোভ করা চলে। আমি যতদূর জানি তাতে কন্যার পিতামাতারা তাকে বিশেষ পছন্দ করে, স্বয়ং কন্যাদের মনের কথা ঠিক জানা যায় নি।"

বিশ্বপতি বাবু এই ব্যাপারে যখন অত্যন্ত কৃতজ্ঞ হলেন তখন তাঁর উপরে আমার ভক্তি বেড়ে গেল। যে-কারবারে ইতিপূর্ব্বে তাঁর সঙ্গে আমার দরে বনছিল না, সেটাতে লোকসান দিয়েও রেজিষ্ট্রী দলিল সই করবার জন্যে আমার উৎসাহ হল! তিনি যাবার সময় বলে গেলেন, "পাত্রটিকে বলবেন অন্য সব বিষয়ে যাই হোক এমন গুণবতী মেয়ে কোথাও পাবেন না।"

যে-মেয়ে সমাজের আশ্রয় থেকে এবং শ্রদ্ধা থেকে বঞ্চিত তাকে যদি হৃদয়ের উপর প্রতিষ্ঠিত করা যায় তাহলে সে মেয়ে কি আপনাকে উৎসর্গ করতে কিছুমাত্র কৃপণতা করবে? যে-মেয়ের বড় রকমের

আশা আছে তারি আশার অন্ত থাকে না। কিন্তু এই দীপালির দীপটি মাটির, তাই আমার মত মেটে ঘরের কোণে তার শিখাটির অমর্য্যাদা হবে না।

সন্ধ্যার সময় আলো জ্বেলে বিলিতি কাগজ পড়চি এমন সময় খবর এল একটি মেয়ে আমার সঙ্গে দেখা করতে এসেচে। বাড়ীতে স্ত্রীলোক কেউ নেই, তাই ব্যস্ত হয়ে পড়লুম। কোনো ভদ্র উপায় উদ্ভাবনের পূর্ব্বেই মেয়েটি ঘরের মধ্যে ঢুকে প্রণাম করলে। বাইরে থেকে কেউ বিশ্বাস করবে না, কিন্তু আমি অত্যন্ত লাজুক মানুষ। আমি না তার মুখের দিকে চাইলুম, না তাকে কোনো কথা বল্লুম। সে বল্লে, "আমার নাম দীপালি।"

গলাটি ভারি মিষ্টি। সাহস করে মুখের দিকে চেয়ে দেখলুম, সে মুখ বুদ্ধিতে কোমলতাতে মাখানো। মাথায় ঘোমটা নেই— শাদা দিশি কাপড়, এখনকার ফেশানে পরা। কি বলি ভাবচি এমন সময়ে সে বল্লে, "আমাকে বিবাহ দেবার জন্যে আপনি কোনো চেষ্টা করবেন না।"

আর যাই হোক্ দীপালির মুখে এমন আপত্তি আমি প্রত্যাশাই করি নি। আমি ভেবে রেখেছিলুম বিবাহের প্রস্তাবে তার দেহ মন প্রাণ কৃতজ্ঞতায় ভরে উঠেচে।

জিজ্ঞাসা করলুম, "জানা অজানা কোন পাত্রকেই তুমি বিবাহ করবে না।"

সে বল্লে, "না, কোনো পাত্রকেই না।"

যদিচ মনস্তত্ত্বের চেয়ে বস্তুতত্ত্বেই আমার অভিজ্ঞতা বেশী— বিশেষত নারীচিত্ত আমার কাছে ইংরেজি বানানের চেয়ে কঠিন তবু

কথাটার সাদা অর্থ আমার কাছে সত্য অর্থ বলে মনে হল না। আমি বল্লুম "যে-পাত্র আমি তোমার জন্যে বেছেচি সে অবজ্ঞা করবার যোগ্য নয়।"

দীপালি বল্লে, "আমি তাঁকে অবজ্ঞা করিনে, কিন্তু আমি বিবাহ করবনা।"

আমি বল্লুম, "সে লোকটিও তোমাকে মনের সঙ্গে শ্রদ্ধা করে।"

"কিন্তু না, আমাকে বিবাহ করতে বল্‌বেন না।"

"আচ্ছা বল্‌ব না, কিন্তু আমি কি তোমাদের কোন কাজে লাগ্‌তে পারি নে?"

"আমাকে যদি কোনো মেয়ে-ইস্কুলে পড়াবার কাজ জুটিয়ে দিয়ে এখান থেকে কলকাতায় নিয়ে যান তাহলে ভারি উপকার হয়।"

বল্লুম, "কাজ আছে, জুটিয়ে দিতে পারব।"

এটা সম্পূর্ণ সত্য কথা নয়। মেয়ে ইস্কুলের খবর আমি কি জানি! কিন্তু মেয়ে ইস্কুল স্থাপন করতে ত দোষ নেই।

দীপালি বল্লে, "আপনি আমাদের বাড়ি গিয়ে একবার মায়ের সঙ্গে একথার আলোচনা করে দেখ্‌বেন?"

আমি বল্লুম, "আমি কাল সকালেই যাব।"

দীপালি চলে গেল। কাগজ পড়া আমার বন্ধ হল। ছাতের উপর বেরিয়ে এসে চৌকিতে বস্‌লুম। তারাগুলোকে জিজ্ঞাসা করলুম কোটি কোটি যোজন দূরে থেকে তোমরা কি সত্যই মানুষের জীবনের সমস্ত কর্ম্মসূত্র ও সম্বন্ধসূত্র নিঃশব্দে বসে বসে বুন্‌চ?

এমন সময়ে কোনো খবর না দিয়ে হঠাৎ বিশ্বপতির মেজো ছেলে

শ্রীপতি ছাতে এসে উপস্থিত। তার সঙ্গে যে আলোচনাটা হল, তার মর্ম্ম এই ঃ—

শ্রীপতি দীপালিকে বিবাহ করবার আগ্রহে সমাজ ত্যাগ করতে প্রস্তুত। বাপ বলেন, এমন দুষ্কার্য্য করলে তিনি তাকে ত্যাগ করবেন। দীপালি বলে, তার জন্যে এত বড় দুঃখ অপমান ও ত্যাগ স্বীকার কেউ করবে এমন যোগ্যতা তার নেই। তা ছাড়া শ্রীপতি শিশুকাল থেকে ধনি গৃহে লালিত, দীপালির মতে সে সমাজচ্যুত এবং নিরাশ্রয় হয়ে দারিদ্র্যের কষ্ট সহ্য করতে পারবে না। এই নিয়ে তর্ক চল্‌চে কিছুতে তার মীমাংসা হচ্চে না। ঠিক এই সঙ্কটের সময় আমি মাঝখানে পড়ে এদের মধ্যে আর একটা পাত্রকে খাড়া করে সমস্যার জটিলতা অত্যন্ত বাড়িয়ে তুলেচি। এইজন্যে শ্রীপতি আমাকে এই নাটকের থেকে প্রুফ্‌শিটের কাটা অংশের মত বেরিয়ে যেতে বল্‌চে।

আমি বল্লুম, যখন এসে পড়েচি তখন বেরচ্চিনে। আর যদি বেরই তাহলে গ্রন্থি কেটে তবে বেরিয়ে পড়ব।

বিবাহের দিন পরিবর্ত্তন হল না। কেবলমাত্র পাত্র পরিবর্ত্তন হল। বিশ্বপতির অনুনয় রক্ষা করেচি কিন্তু তাতে তিনি সন্তুষ্ট হন নি। দীপালির অনুনয় রক্ষা করি নি কিন্তু ভাবে বোধ হল সে সন্তুষ্ট হয়েচে। ইস্কুলে কাজ খালি ছিল কিনা জানিনে কিন্তু আমার ঘরে কন্যার স্থান শূন্য ছিল, সেটা পূর্ণ হল। আমার মত বাজে লোক যে নিরর্থক নয় আমার অর্থই সেটা শ্রীপতির কাছে প্রমাণ করে দিলে। তার গৃহদীপ আমার কলকাতার বাড়িতেই জ্বল্‌ল। ভেবেছিলুম সময়-মত বিবাহ না সেরে রাখার মুলতবি অসময়ে বিবাহ করে পূরণ করতে হবে। কিন্তু দেখলুম উপরওয়ালা প্রসন্ন হলে দুটো একটা ক্লাস ডিঙিয়েও

প্রোমোশন পাওয়া যায়। আজ পঞ্চান্ন বছর বয়সে আমার ঘর নাৎনীতে ভরে গেছে উপরন্তু একটি নাতিও জুটেচে। কিন্তু বিশ্বপতি বাবুর সঙ্গে আমার কারবার বন্ধ হয়ে গেছে—কারণ তিনি পাত্রটিকে পছন্দ করেন নি।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

ভদ্রতা।

——:০:——

ভদ্রতা আত্মীয়তার চেয়ে কিছু কম, এবং সামাজিকতার চেয়ে কিছু বেশী। আত্মীয়তা আন্তরিক, সামাজিকতা আনুষ্ঠানিক। ভদ্রতা উভয়ের মধ্যে সেতুস্বরূপ, এবং উভচর।

এই বন্ধনের গুণেই মানুষের সঙ্গে মানুষের মনুষ্যোচিত যে-কোন প্রকার সম্পর্ক রাখা সম্ভবপর হয়; নচেৎ বাকি থাকে শুধু উচ্ছৃঙ্খল একাকার পশুত্ব,—কিম্বা মুক্ত নিরাকার দেবত্ব।

অবশ্য যেখানে ভালবাসা, ভক্তি, ভয় বা অন্য কোন ভ-পূর্ব্বক ভাবাত্মক সম্বন্ধ বিদ্যমান, সেখানে ভদ্রতার কথা ওঠেই না,—কারণ খণ্ড তো সমগ্রের অন্তর্গত। যেখানে সন্তুষ্ট করবার ইচ্ছে স্বাভাবিক, সেখানে ব্যবহার ত আপনা হতেই শুধু শিষ্ট কেন, মিষ্টই হয়ে থাকে। কিন্তু যেখানে অপরিচয় বা অতিপরিচয় বা ঔদাসীন্যবশতঃ মন সহজে অনুকূল নয়, সেইখানেই ভদ্রতার শিক্ষা ও চর্চ্চার প্রয়োজন। অর্থাৎ মনোভাব যেমনই থাকুক না কেন, লোকের সঙ্গে সদ্ব্যবহারের নাম ভদ্রতা। এবং যে সমাজ যত সভ্য, তার লোকব্যবহার তত সদ্ভাব ও সুরুচিব্যঞ্জক।

সকলের মত এক না হলেও যেমন কার্য্যক্ষেত্রে অধিকাংশের মতে মত দিতে হয়, নইলে কাজ চলে না; তেমনি সকলের মন সমান না হলেও, সামাজিক অনুষ্ঠানে সৌভ্রাত্র ও সৌষ্ঠব রক্ষার্থে কতকগুলি

সাধারণ নিয়ম মেনে চলতে হয়, তাকে বলে রীতি। ভদ্রতা রীতি-মাত্র নয়, তার চেয়ে কিছু বেশী উদার। কারণ রীতি ক্রিয়াকর্ম্ম-ক্ষেত্রে ও স্বশ্রেণীর মধ্যেই আবদ্ধ; কিন্তু ভদ্রতা সমাজবিশেষ ও স্থানবিশেষ ছাড়িয়ে সকল সমাজ এবং সকল অবস্থায় পরিব্যাপ্ত। মানুষমাত্রেই পরস্পরের কাছে তা সর্ব্বদা ও সর্ব্বথা দাবি করতে পারে।

অপরপক্ষে নীতির তুলনায় ভদ্রতার ক্ষেত্র অনেক সঙ্কীর্ণ। কোমর বেঁধে পৃথিবীর দুঃখ দূর বা পরের উপকার করতে যাওয়া, কিম্বা ন্যায়ান্যায়ের বিচারপূর্ব্বক চলা, অথবা মহৎ কর্ত্তব্য পালন করা ভদ্রতার এলাকা নয়। যারা কাছাকাছি আছে, কিম্বা ঘটনাচক্রে এসে পড়েছে, তাদের প্রতি সৌজন্য প্রকাশ করাই তার মুখ্য উদ্দেশ্য। সাময়িক এবং উপস্থিত নিয়ে তার কারবার,—কিন্তু অভাবপক্ষে তারই মধ্যে খণ্ডপ্রলয় বেধে যেতে পারে!

কিন্তু রীতির সঙ্গে ভদ্রতার এইটুকু সৌসাদৃশ্য আছে যে, সব সময় সকলের প্রতি সকলের মনে সমান সদ্ভাব থাকা যখন সম্ভব নয়, তখন অন্ততঃ বাইরের প্রকাশে সুষমা বিধানার্থে অনুষ্ঠানের ন্যায় ব্যবহার-কেও কতকগুলি নিয়মাধীন করা সমাজ আবশ্যক মনে করে। আর নীতির সঙ্গে তার এইটুকু সৌসাদৃশ্য আছে যে, মানুষের অন্তরতম প্রদেশে যদি মানুষের প্রতি স্বাভাবিক প্রীতি না থাকৃত ও পরস্পরের মনে আঘাত দেবার সহজ অপ্রবৃত্তি না হত, তাহলে দীর্ঘকাল ধরে' বহু লোকের পক্ষে সে নিয়ম রক্ষা করে চলা প্রায় অসম্ভব হত। সুতরাং ভদ্রতাকে সংক্ষেপে লোকব্যবহারের ক্ষুদ্র রীতিনীতি বলা যেতে পারে। কিম্বা মনুষ্যসম্বন্ধের 'লসাগু',—অর্থাৎ প্রত্যেকের পরস্পরের প্রতি স্নেহ

পরিমাণ সদ্ভাবপ্রকাশ, যেটুকু নইলে জীবন-যান তৈলাভাবে অচল হয়ে পড়ত। কি ঘরে, কি বাইরে, এই সামান্য স্নেহলাভেও যে অনেক সময় মানুষকে বঞ্চিত হতে হয়, সেটি বড়ই দুঃখের বিষয়। অবশ্য সভ্যসমাজে অধিকাংশ লোকই স্পষ্টতঃ অভদ্র নয়; কিন্তু যে মার্জ্জিত ও মোলায়েম, সদাশয় ও সুশ্রী, চৌকোষ ও চোস্ত ব্যবহারকে যথার্থ ভদ্রতা বলা যেতে পারে, তাও সুলভ নয়।

অনেকে আজকাল আক্ষেপ করেন যে, একালের ছেলেদের ভদ্রতা কমে গিয়েছে। যেহেতু অল্প লোকেরই ত্রিকালজ্ঞ হবার সুযোগ ঘটে, সে-কারণ আমি এ কথার সমর্থন বা প্রতিবাদ করতে অক্ষম। তবে এটুকু স্বীকার্য্য যে, আনুষ্ঠানিক ভদ্রতার দিন এদেশে গেছে, বা যেতে বসেছে।

তার এক কারণ হয়ত এই যে, একালের লোকের সময় সংক্ষেপ। প্রত্যেক চিঠির লাইনযোড়া ভিন্ন ভিন্ন পাঠ শিখতে ও লিখতে হলে বোধহয় ইস্কুলের পাঠ বন্ধ করতে হয়। আর উঠতে বসতে যদি প্রত্যেক গুরুজনকে প্রণাম করতে হয়, কিম্বা সকলের কুশলপ্রশ্ন অন্তে অন্য কথা পাড়তে হয়, তাহলেও আধুনিক জীবনযাত্রা চালানো দায় হয়ে পড়ে।

আর এক কারণ এই হতে পারে যে, একালে গুরুলঘু সম্পর্কের দূরত্বকে ঘনিষ্ঠতায় পরিণত করবার দিকে আমাদের ঝোঁক হয়েছে। মাকে 'আপনি' বলা, বাপখুড়োর সামনে তটস্থ হয়ে থাকা, শাশুড়ী ননদের কাছে এক হাত ঘোমটা টেনে ইসারায় কথা কওয়ার আমলের তুলনায় আজকাল আমরা হয়ত অপেক্ষাকৃত সাম্য মৈত্রী ও স্বাধীনতার পক্ষপাতী হয়ে পড়েছি।

কিন্তু এমন যে ব্রাহ্মণ জাতি,—যার তুল্য গুরু সেকালে ছিল না,—তাঁরাও যখন কলিকালে পূর্ব্বপ্রাপ্য পদমর্য্যাদাচ্যুত হতে বাধ্য হয়েছেন, তখন অন্যান্য গুরুজনকেও সেই দৃষ্টান্ত অনুসরণে নিজ নিজ বাকি-খাজনা এবং উপরি-পাওনার লোভ সম্বরণপূর্ব্বক সমতল সমকক্ষতার শ্রীক্ষেত্রে হাসিমুখে নাবতে হবে, ও কালের সঙ্গে সমপদবিক্ষেপে চল্‌তে হবে। সুতরাং উপরোক্ত অনুষ্ঠানের ত্রুটি মার্জ্জনা করে দেখতে হবে যে, সারভূত ভদ্রতার লক্ষণ কি,—যে ভদ্রতা সব দেশের, সব কালের, এবং সব পাত্রের।

প্রতীক বা স্মরণচিহ্ন রচনার আকাঙ্ক্ষা মানুষের মজ্জাগত। অসীমকে সসীমে বাঁধবার, নিরাকারকে সাকারে ধরবার প্রয়াস তার পক্ষে স্বাভাবিক। আমরা সকলেই পৌত্তলিক; তবে প্রকাশের তারতম্য আছে, সাকারীকরণের মাত্রাভেদ আছে। মূর্ত্তিও সাকার, মন্ত্রও সাকার,—কিন্তু কমবেশী। বড়কে ছোটর দ্বারা, ব্যষ্টিকে সমষ্টি দ্বারা, অরূপকে রূপ দ্বারা প্রকাশ করবার এই চেষ্টার উদ্দেশ্য অস্পষ্টকে পরিস্ফুট এবং অলক্ষ্যকে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য করা। তোমার মনে অনেকখানি ভক্তি থাকতে পারে, কিন্তু বাইরে তার কোন চিহ্ন না দেখালে আমিই বা জানব কি করে, তুমিই বা জানাবে কি করে?—অতএব প্রণাম কর। অতএব দাম্পত্য-জীবনের বন্ধন লৌহদ্বারা স্মরণ করাও, তার আনন্দ সিন্দুর-অলক্তক-তাম্বুলের লোহিত রাগে ব্যক্ত কর; এবং বৈধব্যের শূন্যতা বরণাভরণহীন বেশে সূচিত হোক্। খৃষ্টের পরার্থপর অমানুষিক যন্ত্রণা একটি ক্রুশের চতুঃসীমায় আবদ্ধ, বিশ্বলক্ষ্মীর অপরিসীম অনির্ব্বচনীয় সৌন্দর্য্য একটি পদ্মে বিকশিত, ভক্তচক্ষে অখিলব্রহ্মাণ্ডপতি একটি অঙ্গুষ্ঠপরিমাণ প্রতিমায় প্রতিষ্ঠিত

এই চিহ্নতন্ত্রের লাভও আছে, যেহেতু মানুষের সহজবিক্ষিপ্ত চিত্তকে সংহত সংযত করে আনবার সাহায্য করে; আবার ক্ষতিও আছে, যেহেতু জড়বস্তু দ্বারা চেতনকে, অনুষ্ঠান দ্বারা অনুভূতিকে চাপা দেবারও সাহায্য করে। প্রণাম আন্তরিক ভক্তি জ্ঞাপনও করতে পারে, আবার তার অভাব গোপনও করতে পারে। সেইজন্য সভ্যতার বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে সত্যের সেই সকল প্রমাণের প্রতি বোধ হয় মানুষের বেশী ঝোঁক হয়েছে, যা অত সুলভ ও ক্ষণস্থায়ী নয়; যা' একটিমাত্র নির্দ্দিষ্ট আচরণে পর্য্যবসিত নয়, কিন্তু সমগ্র জীবনে পরিব্যাপ্ত।

এই জন্যই বল্‌ছিলুম যে আনুষ্ঠানিক বা স্থূল ভদ্রতা অপেক্ষা আজকাল সূক্ষ্মতর ও ব্যাপকতর মূলভদ্রতার মূল্য বেশী হতে চলেছে। দেশকালভেদে প্রথমোক্তের নানা ভিন্ন প্রকাশ দেখতে পাওয়া যায়; কিন্তু শেষোক্ত সম্বন্ধে মতভেদের অবসর কম। ভদ্রতার এই বাহ্য আকৃতিবৈষম্য ভুলে গিয়ে তার অন্তঃপ্রকৃতিবিশ্লেষণের প্রতি মন দিলে দেখতে পাব যে, তার কতকগুলি লক্ষণ সর্ব্বজনীন ও সর্ব্ববাদীসম্মত।

(২)

প্রথমতঃ ভদ্রতার মূল পরহিতৈষণা, এবং তার ফুল সংযম। উপস্থিত মত পরের যা'তে কষ্ট না হয়,—আমার বাড়ী এসে বা আমার সম্পর্কে থেকে ক্ষণকাল যাতে অন্যে সুখস্বাচ্ছন্দ্য অনুভব করে,—ভদ্রলোকের স্বভাবতঃই এই ইচ্ছা হয়। এবং সে ইচ্ছা কার্য্যে পরিণত করতে হলে অনেক সময় নিজের তৎকালীন প্রতিকুল ইচ্ছা দমন করতে হয়, নিজের

আপাত-সুবিধা বিসর্জ্জন দিতে হয়। আমার যে-সময় বিশেষ জরুরী কাজ আছে, সে-সময় হয়ত একজন সামান্য আলাপিনী (বা অপরিচিতা) দেখা করতে এলেন ; ভদ্রতার নিয়মানুসারে আমার সব কাজ ফেলে রেখে তাঁর আতিথ্যে মনোনিবেশ করতে হবে। যতক্ষণ তাঁর উঠতে ইচ্ছা না হয়, আমার হাজার অসুবিধা হলেও বল্‌বার জো নেই—"সখি, বহে গেল বেলা, শুধু হাসিখেলা, একি আর ভাল লাগে !" আমাদের দেশে দেখাসাক্ষাতের একটা নির্দ্দিষ্ট সময় নেই বলে' এ বিষয় আরও ভুগতে হয়। কিম্বা হয়ত কোন মাননীয় ব্যক্তি আমার মুখের সামনে হয়কে নয়, সাদাকে কালো বলছেন ; আমার কণ্ঠাগ্রে এলেও মুখে বলবার সাধ্য নেই যে—"ওগো, তুমি মিথ্যে কথা বল্‌ছ" ; কিম্বা আর একজনকে—"তুমি দু'দিন আগেই যে ঠিক এর উল্টো কথা বলেছিলে ;" কিম্বা আর একজনকে—"তোমার নিজেরই সম্পূর্ণ দোষে এটি ঘটেছে ;" কিম্বা আর একজনকে—"অন্যের নিন্দা করবার আগে, একবার নিজের দিকে চেয়ে দেখ্‌লে ভাল হয় না ?"

নাঃ—একালেও এদেশে ভদ্রতা বড় কড়া মনিব,—বিশেষতঃ মেয়েদের পক্ষে। চড়া গলায় কড়া কথা বল্‌বে না, চেঁচিয়ে হাসবে না, লোভীর মত খাবে না, গালমন্দ দেবে না, মুখে মুখে জবাব করবে না, অতিরিক্ত চাঞ্চল্য বা স্বাতন্ত্র্য প্রকাশ করবে না ;—ইত্যাদি নানাপ্রকার নেতিমূলক বিধান তারা বড় হলে মেনে চলতে বাধ্য। এক কথায়, তাদের শরীরকে যেমন লজ্জাবস্ত্রে আবৃত রাখতে হয়, ব্যবহারকেও তেমনি সম্ভ্রমের সূক্ষ্মবর্ম্মে সুসম্বৃত রাখা চাই। ছেলে সম্বন্ধে কড়া-কড়ির মাত্রা কিছু কম, কারণ তাদের জীবনসংগ্রামের জন্য প্রস্তুত হতে হবে। কিন্তু সভ্যসমাজে তাদেরই বা শাসন মন্দ কি ?—পাশ্চাত্য দেশে,

যেখানে সমাজক্ষেত্রে স্ত্রীপুরুষের স্বাধীনভাবে মেলামেশা প্রচলিত, সেখানে উভয়পক্ষকেই সামাজিক নিয়মাধীন হয়ে চলতে হয়। আমাদের দেশে সে প্রথা না থাক্‌লেও, পুরুষসমাজে পরস্পরের মধ্যে ভদ্রতারক্ষার নিয়ম যথেষ্ট ছিল। এখন যদি সে বন্ধন শিথিল হয়ে গিয়ে থাকে ত অন্ততঃ একটা কোন কালোচিত আদর্শ যা'তে রক্ষিত হয়, সে বিষয়ে প্রত্যেক পরিবারের যত্নবান হওয়া উচিত। কারণ এসব বিষয়ে ছেলেবেলার অভ্যাসই প্রবল। দুর্ম্মুখ হওয়াই কিছু তেজস্বিতার পরিচয় নয়, দুর্ব্যবহার করাই কিছু চরিত্রবলের প্রমাণ নয়। বদরাগী ও রাশভারি, এ উভয়প্রকার লোকের মধ্যে সমাজে প্রতিপত্তি কার বেশী?—সভ্যমেব জয়তে, নেতরং।

আমাদের সাহিত্যক্ষেত্রে সম্প্রতি যে অভদ্রতার প্রাদুর্ভাব হয়েছে, এই প্রসঙ্গে সে জন্য দুঃখ প্রকাশ না করে' থাকা যায় না। সরস্বতীর মন্দিরে প্রবেশ করবার সময়ও কি জুতোজোড়াটার সঙ্গে আমরা বাঙ্গালীর স্বভাবসিদ্ধ দলাদলির ভাবটা বাইরে রেখে আসতে পারি নে? অবশ্য সাহিত্য-চর্চ্চার যদি কোন উচ্চ লক্ষ্য থাকে, তা যে কেবল লীলাকমলের ব্যজনে অবলীলাক্রমে সাধিত হবে না, তা জানি,—অকল্যাণকে তাড়াতে হলে মধ্যে মধ্যে কুলোর বাতাসও দেওয়া চাই! কিন্তু তীক্ষ্ণ সূক্ষ্ম মারাত্মক আর যে-কোনপ্রকার ভাষার অস্ত্র সাহিত্যরথী ব্যবহার করুন না কেন, ইতরতা বা রূঢ়তার অস্ত্রপ্রয়োগ এ স্থলে নিষিদ্ধ হওয়া উচিত। যিনি বাণীর সেবক হবার স্পর্দ্ধা রাখেন, অশুদ্ধ বাণী ব্যবহার করা তাঁর পক্ষে বিশেষরূপে বিসদৃশ নয় কি?

স্পষ্টবাদীর দল উল্লিখিত সংযমাত্মক ভদ্রতাকে কপটতার নামান্তর মনে করেন। "আমার বাপু স্পষ্ট কথা" বলে' আরম্ভ করে' তাঁরা

মুখে যা আসে তাই বল্‌তে কিছুমাত্র দ্বিধা বোধ করেন না, বরং গর্ব্বই অনুভব করেন। কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, মন এবং মুখের মধ্যে একটা পাকা বাঁধ বেঁধে না রাখলে দু'দিনও কি সমাজ টিঁকতে পারে?— আমার ত মনে হয় কতকগুলি কথা বা বিষয়কে একঘরে করে ভালই হয়েছে। স্পষ্টবাদিতার দোহাই দিয়ে ভদ্রসমাজে সে বাঁধ ভাঙ্গায় আমি ত কোন বাহাদুরী বা সুবিধা দেখতে পাইনে। সামান্য একটি খিল খুলে দিলে অতি বড় বন্ধনও সহজে শিথিল হয়ে পড়ে; একটি পরদা তুলে ফেল্লেও অনেকটা আব্রু নষ্ট হতে পারে। কথার সংযম কিছু কম গুরুতর জিনিস নয়। যদি তা কপটতাই হয় ত সে-পরিমাণ কপটতা সমাজরক্ষার জন্য প্রয়োজনীয়। আমাদের কান যেমন নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ সূক্ষ্ম শব্দের বেশী শুনতে পায় না, চোখ যেমন নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ দূরতার বেশী দেখতে পায় না; তেমনি বোধহয় অখণ্ড সম্পূর্ণ সত্য আমাদের মন গ্রাহ্য বা সহ্য করতে পারবে না বলেই ভগবান দয়া করে অজ্ঞানের আড়াল রেখে দিয়েছেন। ঐখানেই ত তাঁর ভদ্রতা!—বেশী তলিয়ে বুঝে লাভ কি? অনেক সময় কেঁচো খুঁড়তে খুঁড়তে সাপ বেরোয়; কিম্বা ঐ কথাই একটু ঘুরিয়ে ভাব দিয়ে বলা যেতে পারে যে, অনেক সময় সত্য খুঁজতে খুঁজতে শুধু "নিখিল অশ্রু সাগরকূলে" গিয়ে পৌঁছতে হয়।

(৩)

কিন্তু অল্পমাত্রায় যা' উপকারী, বেশিমাত্রায় তা'তেই হিতেবিপরীত হতে পারে,—যথা, হোমিওপ্যাথি ওষুধ। পরের মন-লাগানো কথা বল্‌ব না বলেই যে পরের মন-যোগানো কথা বল্‌তে হবে, তার কোন

মানে নেই। কেউ কেউ ভদ্রতার সঙ্গে খোসামুদির তফাৎ করতে পারেন না বলে' নিজের মানরক্ষার জন্য পরকে অপমান করা আবশ্যক এবং কর্ত্তব্য বোধ করেন। কিন্তু এ দু'য়ের মধ্যে যথেষ্ট প্রভেদ আছে বলে'ত আমার বিশ্বাস।—ভদ্রতার সর্ব্বভূতে সমান দৃষ্টি, খোসামুদির দৃষ্টি কেবল নিজের প্রতি; ভদ্রতা নিজের অসুবিধা করে'ও পরের সুবিধা করে' দিতে উৎসুক, খোসামুদি নিজের সুবিধাটুকুই বোঝে ও খোঁজে; ভদ্রতা চৌকোষ, সরল ও সুন্দর,—খোসামুদি একপেশো, কুটিল ও কুৎসিৎ। স্বীকার করি, বড়লোক দেখ্‌লে মানুষের মুখের ভাব আপনাহতেই একটু মোলায়েম হয়ে আসে, গলার স্বর অজ্ঞাতসারে অতিকোমল সুরে নাবে; এবং বিলাসপুরের মহারাণী তোমার আমার বাড়ী পায়ের ধুলো দিলে তাঁর সমাদরের জন্য তুমি আমি যত ব্যতিব্যস্ত হয়ে পড়ব, ও-পাড়ার পাঁচিধোবানী বেড়াতে এলে মোটেই সেরকম হব না! কিন্তু বহুকালের অভ্যস্ত সামাজিক স্তরভেদঘটিত ব্যবহারতারতম্যের সঙ্গে স্বার্থমূলক বাড়াবাড়ির যে তফাৎ, আশা করি চোখে আঙ্গুল দিয়ে তা' দেখানো অনাবশ্যক। গায়ে পড়ব না মনে করলেই কি দশ হাত দূরে থেকে মানুষকে নখী দন্তী শৃঙ্গীর দলে ফেলতে হবে?—দুঃখের বিষয়, যতদিন বড়লোকমাত্রই প্রায় খোসামোদের বশ থাকবেন, এবং যতদিন পৃথিবীতে বড়ছোটর মধ্যে অবস্থা ও ক্ষমতার এমন আকাশ পাতাল প্রভেদ থাকবে,—ততদিন খোসামোদকে সমাজ থেকে তাড়ানো মুস্কিল। ভদ্রতাকে এইরকম অনেকে ছদ্মবেশরূপে ব্যবহার করে বলে' অতিভদ্রতাকে লোকে যেন সন্দেহের চক্ষে দেখে; কারণ তারা ঠেকে শিখেছে যে অতিনম্র বিনীত ব্যবহারই দুরভিসন্ধির স্বাভাবিক অস্ত্র! ধর্ম্মের বাহ্যাড়ম্বরও এই দোষে দূষিত। সংসারে জহর দুর্লভ

হলেও তত ক্ষতি ছিল না, যদি জহুরী ততোধিক দুর্লভ না হত! একটু সংসারজ্ঞানের চর্চ্চাই খোসামুদি এড়াবার প্রকৃষ্ট উপায়। যে পৃথিবীতে এসেছি, সেটা কিরকম জায়গা জানতে না পারলে উন্নতিচেষ্টা করব কি করে?—যেখানে শক্ত, সেইখানেই ভক্ত (বা অতিভক্ত!),—যেখানে অক্ষমতা, সেইখানেই পরমুখাপেক্ষিতা। ছোট ছেলে কি কম খোসামুদে?—তবে তাদের সবই সুন্দর।

আর একটি জিনিস আছে, যা' ভদ্রতার বেনামী চলে, অথচ বেশি পরিমাণে যা ক্ষতিকর;—সেটি হচ্ছে চক্ষুলজ্জা। এটি আমাদের দেশের ও জাতের একটি রোগবিশেষ বল্লেও অত্যুক্তি হয় না, এবং খুব কম লোকই সে রোগমুক্ত। মনে মনে আমার কোন একটি অনুরোধ রক্ষা করবার মোটেই ইচ্ছা নেই, এমন কি অভিপ্রায় নেই,—অথচ চক্ষুলজ্জায় পড়ে' আমি অনুরোধকর্ত্তার সামনে (বেশ একটু উৎসাহ সহকারেই!) তার প্রস্তাবে সম্মত হলুম। এ স্থলে যদি বিরক্তভাবে কাজটা করে' দিই ত মন্দের ভাল; কিন্তু একবার একজনের জন্য করলেই ত অব্যাহতি পাওয়া যায় না, আর ক্রমাগত অনিচ্ছাসত্ত্বে ঢেঁকি গিল্‌লেও নিজের হজমশক্তির উপর একটু অত্যাচার করা হয়। আবার যদি করব বলে' না করি, তাহলে নিজের কথারও খেলাপী হয়, নিজের মনও খুঁৎখুঁৎ করে, আর অনর্থক পরের আশাভঙ্গও করা হয়। মতামত সম্বন্ধেও এই কথা খাটে। তুমি সজোরে একটা মত ব্যক্ত করছ, সেটা হয়ত আমার মোটেই মনঃপূত নয়; অথচ আমি চক্ষুলজ্জার খাতিরে হয় চুপ করে' থেকে জানাই যে মৌনং অসম্মতিলক্ষণং,—সেটা বরং ভাল; আর নয় ত আম্‌তা-আম্‌তা করে' তোমার মতে সায় দিয়ে যাই, তা'তে অনেক সময় আমার নিতান্ত অনভিপ্রেত এমন কি অন্যায়

কার্য্যে পর্য্যন্ত প্রশ্রয় দিয়ে অন্তরাত্মার অবমাননা করা হয়। কেন এ বিড়ম্বনা?—তার চেয়ে গোড়ায় স্পষ্ট অথচ ভদ্রভাবে 'না' বলতে বা প্রতিবাদ করতে পারলে দু'পক্ষেরই ভবিষ্যতে অনেক অসুবিধা বেঁচে যায়, এবং মতান্তর থেকে মনান্তর পর্য্যন্ত গড়ায় না। 'ভালমানুষ'কে যেমন আমরা 'গো-বেচারা'র দলে ফেলেছি, তেমনি ভদ্রলোক বল্‌তেও যেন দাঁড়িয়েছে এই যে, তাকে যে-সে মনে করলেই ফাঁকি দিতে ও ঠকিয়ে নিতে পারে;—'বৈকুণ্ঠের খাতা' দ্রষ্টব্য। ভদ্রতার সঙ্গে একটু দৃঢ়তা মেশানোই উক্ত রোগের একমাত্র চিকিৎসা। অমায়িক অথচ আত্মপ্রতিষ্ঠ, লোকপ্রিয় অথচ সত্যনিষ্ঠ,—এমন সম্মিশ্রণ কেন এদেশে এত দুর্লভ? কেন খাঁটি লোক যেন রুক্ষ হতেই বাধ্য, এবং শিষ্ট শান্ত ব্যক্তির উপর জুলুম হওয়াটাই নিয়ম?—তাও বলি যে, দাতা ও গ্রহীতা না হলে যেমন দান সম্পূর্ণ হয় না, তেমনি অনুরোধকারীও মাত্রা বুঝে পেড়াপিড়ি করলে তবেই ভদ্রতা রক্ষা করা সম্ভব,—নইলে অযথা টান পড়লে ছিঁড়তে কতক্ষণ!

এইটেই ভদ্রতার প্রধান অসুবিধা,—যে অন্য লোকে শেষ পর্য্যন্ত তার সুবিধাটি আদায় করে' নিতে পারে, তার প্রতি অন্যায় দা।ব করতেও কুণ্ঠিত হয় না,—কারণ ভদ্রলোক বেচারা কপালে হুণ্ডির ছাপ মেরে বসে' আছে। ভদ্র এবং অভদ্রের সংঘর্ষে প্রথমোক্তকেই অনেক সময় হার মানতে হয়, কেননা পূর্ব্বেই বলেছি কতকগুলি অস্ত্রপ্রয়োগ তার ধর্ম্মবিরুদ্ধ; অভদ্রের ত সে বালাই নেই। গল্প শুনেছি যে বিলাতে বড়লোকেরা রাস্তাঘাটে পারৎপক্ষে ছোটলোকদের অপমানসূচক টিট্‌কারীর প্রতিবাদ বা প্রতিকার করেন না,—বিশেষতঃ যদি কোন ভদ্রমহিলা সঙ্গে থাকেন।

(৪)

সংযম যেমন ভদ্রতার প্রধান নিবৃত্তিমূলক লক্ষণ, তেমনি সর্ব্বভূতে সমান দৃষ্টি বা মানুষকে মানুষ জ্ঞান করা তার প্রধান প্রবৃত্তিমূলক লক্ষণ। অর্থসামর্থ্য, বিদ্যাবুদ্ধি, রূপগুণ, মানমর্য্যাদা, আকর্ষণবিকর্ষণ যার যেমনই থাকুক না কেন,—কম হলেও তা'কে পায়ের তলায় ঠাসবার দরকার নেই, বেশী হলেও তার পায়ের তলায় পড়ে' থাকবার দরকার নেই। যা'কে ভাল লাগে তার সঙ্গে গলাগলি ও কর' না, যা'কে মন্দ লাগে তাকে গালাগালি ও দিও না, সকলের প্রতি সহজ সদয় ব্যবহার কর',—এই হচ্ছে তার বিধান। এই সামঞ্জস্যজ্ঞান থেকে একটু নির্লিপ্ত ভাব আসতে পারে,—অবশ্য প্রকাশ্যে। ভদ্রতা ব্যবহার-নীতি মাত্র, মনের নিয়ন্তা নয়। তবে মনস্তত্ত্ববিৎরা বলেন যে, বাইরে যে ভাব দেখানো যায়, সেটা ক্রমে মনের ভিতর পর্য্যন্ত সংক্রামিত হয়; যেমন রাগের প্রকাশ দমন করতে করতে রাগ কমে আসা সম্ভব। (কিন্তু অনুরাগ কমে না বাড়ে?)—পূর্ব্বে ভদ্রতাকে বাঁধ বলেছি; আবশ্যক-স্থলে এই বাঁধই যে প্রাচীরের কাজ করতে পারে, তার আর আশ্চর্য্য কি?—যেখানে এই প্রাণের আড়ালটুকু রাখ্‌তে চাইনে,—অর্থাৎ যেখানে প্রকাশই উদ্দেশ্য,—সেখানে অবশ্য ভদ্রতার কাজ ফুরোয়, এবং উচ্চতর নেতার হাতে রাজদণ্ড দিয়ে সে সরে' পড়ে।

সেই জন্যই আত্মীয়তা যেখানে শুধু রক্ত নয়, অনুরাক্তর উপর প্রতিষ্ঠিত, ভদ্রতার ব্যবধান সেখানে অনাবশ্যক,—এমন কি অপ্রীতিকর। আমার মনে আছে ছেলেবেলায় কোন একটি পূজনীয়া আত্মীয়া যখন আমাদের 'তুই' না বলে' 'তুমি' সম্বোধন করতেন, তখনই বুঝতুম যে তিনি আমাদের উপর রাগ করেছেন! ঘনিষ্ঠসম্পর্কীয় লোকের মধ্যে

মনান্তরস্থলে এরূপ কপট ভদ্রতারীতির দৃষ্টান্ত সকলেরই জানা আছে। সেকেলে গৃহিণী যেখানে গয়না খুলে উপোষ করে' চুল এলিয়ে গোসা-ঘরের মেঝেয় লুটতেন, এবং যথাসময়ে সরল মামুলী-ভাবে মান ভাঙ্গিয়ে নিতেন; আজকালকার গৃহিণী সে স্থলে দৈনিক কর্ত্তব্যপালনের তিলমাত্র ত্রুটি না করে'ও মৌখিক ভদ্রতারক্ষার অন্তরালে যে দুর্জ্জয় অভিমান পোষণ করতে পারেন, তা'কে কাবু করা দুঃসাধ্য ব্যাপার! সেকালের সমতল যুদ্ধক্ষেত্র এবং একালের গুহাগহ্বরমণ্ডিত কণ্টকজালখণ্ডিত ক্ষেত্রে যা' তফাৎ,—এও তাই আর কি!—অতি দুঃখের বিষয়, নিকট এবং স্থায়ী সম্পর্কস্থলেও যখন সব সময়ে আশানুরূপ মনের মিল থাকে না, তখন আত্মীয়ের মধ্যেও সাধারণতঃ ভদ্রতার নিয়ম উপেক্ষা না করাই ভাল। এমনও লোক আছেন, যাঁরা বাইরে অতি বিনীত, কিন্তু ঘরে উগ্রচণ্ডা মূর্ত্তি ধারণ করে' থাকেন! যেন ভদ্রতা একটা পোষাকী বেশ মাত্র, যা ঘরে এসে খুলে না ফেল্‌লে ময়লা হয়ে যেতে পারে! অবশ্য চব্বিশ ঘণ্টা যাদের একসঙ্গে থাক্‌তে হয়, তাদের মধ্যে আনুষ্ঠানিক ভদ্রতার নিয়ম শিথিল না করে' দিলে চলে না, ও সাতখুন মাফ করতেই হয়। তবে আজকালকার যেরকম মতিগতি, তাতে রাশ ঢিলে না দিয়ে টানাই দরকার। এই কথাটাই মনে করিয়ে দেওয়া দরকার যে, একসঙ্গে থাক্‌তে গেলে অষ্টপ্রহর মেজাজে মেজাজে স্বার্থে স্বার্থে সংঘর্ষ হয়ে যে উত্তাপ সঞ্চিত হয়, দৈনিক কর্ম্মজীবনযাত্রায় অনিবার্য্যভাবে যে ধূলিজাল উত্থিত হতে থাকে, ভদ্রতার স্নিগ্ধ শান্তিবারিসিঞ্চনই তা কথঞ্চিৎ নিবারণের অন্যতম উপায়। নিজ নিজ পারিবারিক জীবনের প্রতি দৃষ্টিপাত করলেই অধিকাংশ লোকে বুঝতে পারবেন যে,—সময়মত একটু সহৃদয় ব্যবহার,

অবস্থা বুঝে একটু সংযম, একটি মিষ্টি কথা, একটি হাসির আলোর অভাবে শেষে পরস্পরের মনে এমন দাগ দেগে যায় যে, হাজার চেষ্টাতেও তা' মুছে ফেলা যায় না; ভাঙ্গা জোড়া লাগলেও জোড়ের চিহ্ন চিরকাল থেকে যায়। হাঁড়িকলসী একসঙ্গে থাকলেই ঠোকা-ঠুকি হয়, সে কথা সত্য; কিন্তু একটু ঘন করে' প্রলেপ দিলে আওয়াজটা কম হয়, এবং টেঁকেও বেশিদিন! বাঙ্গালী জাত পরিবার-গতপ্রাণ। সেই পারিবারিক জীবনের উপর প্রায় তার জীবনের সমস্ত সুখদুঃখ নির্ভর করে। তাই সুখের সংসার গড়ে' তোলবার কোন উপকরণই আমাদের অবহেলা করা উচিত নয়। বাইরে যতই মানসম্ভ্রম নামডাক থাকুক না কেন, বাড়ীর ভিতরে শান্তি না থাকলে কোন সংসারী লোকের মনই তৃপ্তিলাভ করতে পারে না। বরং শান্তি ও শৃঙ্খলাপূর্ণ গৃহে এসে বাইরের বিতণ্ডা ও বিরক্তি ভুলতে পারা যায়।

কিন্তু আত্মীয়তা-ক্ষেত্র এত জটিল ও গভীর, এতরকম বাধ্য-বাধকতাপূর্ণ ও দেনাপাওনা-জড়িত যে, সেখানে ভদ্রতার চেহারা ভাল ফোটানো যায় না, ও বেশী নীতির কাছ-ঘেঁষা হয়ে পড়ে। ঘরের বাইরে অনাত্মীয় যে বিস্তৃত সমাজ পড়ে আছে, সেইখানেই ভদ্রতার যথার্থ রূপ ও কদর বোঝা যায়, সেইটেই তার প্রকৃত কর্ম্মক্ষেত্র। কারণ এই ভদ্রতা-সেতু পার হয়ে তবে ত ঘনিষ্ঠতা বা অন্তরঙ্গতায় পৌঁছনো যায়—যদি কপালে থাকে! এক এক সময় আমার মনে হয় যে হয়ত এতে অনেক সময় নষ্ট হয়; হয়ত দুর্লভ মনুষ্যজন্মে কত দুর্লভতর বন্ধুত্ববিকাশ হতে পারত, যদি এই সংক্ষিপ্ত সময়ের মধ্যে এত বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করতে না হ'ত। যদি সামাজিক ব্যবধান এত

দুর্ভেদ্য না হত, যদি সামাজিক বিধান এত দুশ্ছেদ্য না হত, যদি প্রত্যেক পরিবার এক একটি দ্বীপের মত স্বতন্ত্র না হত,—তাহলে হয়ত জীবনের অনাবিল সঙ্গসুখের মাত্রা অনেক বেড়ে যেত। কিন্তু বলা যায় না;—সংসারে যদি সজ্জন অপেক্ষা দুর্জ্জনের সংখ্যাই বেশী হয় ত চলিত নিয়মই ভাল। অনেক প্রতিবন্ধকের ভিতর দিয়ে ছেঁকে এলে তবেই হয়ত স্বচ্ছ জিনিসটি পাওয়া যায়। তা' ছাড়া দুর্লভেরই মুল্য বেশী, তা'ত নিত্যই দেখ্‌তে পাই। একটু দূরতা, একটু দুর্গমতা, একটু রহস্য ভেদ করতে না হলে, একটু কৌতূহলের অবসর না দিলে, মেলামেশার তত আগ্রহ বা আস্বাদ থাকে না। "পড়া পুঁথি সম" আত্মীয়সভার মাঝে একটি বাইরের লোক দৈবাৎ এসে পড়লে সকলে কিরকম তাজা হয়ে ওঠে, ও কথোপকথনের মরাগাঙ্গে কি রকম জোয়ার আসে, তা' অনেকেই লক্ষ্য করে' থাক্‌বেন। সেই জন্যই ত নূতনের এত মাহাত্ম্য, অজানার এত আকর্ষণ। (আর সেই জন্যই কি ভগবান নিজেকে রহস্যের জালে আবৃত রেখেছেন?)—অন্ততঃ এই জন্যেও মেয়েদের শিক্ষা বেশী পুরুষালী করবার পক্ষপাতী আমি নই;—তা'তে তাদের বিশেষত্ব নষ্ট হয়, তাদের স্বকীয় মর্য্যাদা খর্ব্ব করে' নিকৃষ্ট নকলে পরিণত করা হয়।

(৫)

অনেক প্রাসঙ্গিক এবং অপ্রাসঙ্গিক আলোচনার ফলে অবশেষে এইটুকু পাওয়া গেল যে, ভদ্রতা বিস্তৃত নীতিরাজ্যের সামান্য একটি অংশমাত্র হলেও তার গৌরব ও প্রয়োজনীয়তা কিছু কম নয়। কথা

ও কার্য্য—এই দুই ক্ষেত্রে তাকে বিভক্ত করা যেতে পারে, এবং দুইয়েরই বিধিনিষেধ আছে। সেগুলি এত লোকবিশ্রুত, বাপমায়ে এত করে' সেগুলি ছেলেদের মনে বসাবার চেষ্টা করেন যে, পুনরাবৃত্তি বাহুল্য। জানে শোনে সবাই সব, কিন্তু সব সময় কাজে পেরে ওঠে না, সেইটিই দুঃখের বিষয়। 'পঞ্চ্' নামক বিলাতী হাসির কাগজে মজার কথাগুলি প্রায়ই এই দুই শিরোনামাঙ্কিত থাকে:—এক 'Things that had better been left unsaid'; আর এক, 'Things that ought to have been expressed otherwise!' অর্থাৎ যা না বল্লে ভাল হত, এবং যা অন্যরকমে বলা উচিত ছিল। বাচনিক নিষেধও অধিকাংশ এই দুই শ্রেণীভুক্ত। এ বিষয় "সত্যং ব্রুয়াৎ" শ্লোকে যে লাখ কথার এক কথা বলা হয়েছে, তার উপর আর কিছু বলবার নেই। কার্য্যক্ষেত্রে ভদ্রতার এইরকম কোন মূলমন্ত্র আমাদের শাস্ত্রে আছে কিনা জানিনে; তবে ইংরাজীতে যাকে ব্যবহারের 'golden rule' (বা সোনার কাঠি!) বলে, সেটা এ স্থলেও খাটে। ছেলেবেলায় তার যে অনুবাদ শুনে হাসি পেত, সেটি এই:—"নিজে ব্যবহৃত হতে চাহিবে যেমন, কর কর ব্যবহার অপরে তেমন!" এর ভাষা যেমনই হোক্, ভাব ঠিক আছে; এবং তার এই ব্যাখ্যা করা যেতে পারে যে, ছোটখাটো বিষয়ে রীতরক্ষা, এবং অন্যের যাতে সুবিধা, সাহায্য বা তুষ্টিসাধন হয়, তাই করাই ভদ্রতা; ও তদ্বিপরীত করাই অভদ্রতা। আন্তরিক ও আনুষ্ঠানিক নামক আর দুই মূল শ্রেণীতে ভদ্রতাকে ভাগ করেছি, ও বলেছি যে আজকাল প্রথমোক্তের প্রতিই লোকের বেশী ঝোঁক; এবং সংযম ও সাম্যভাব তার দুই প্রধান সর্ব্বজনীন উপাদান। সংযম যে শুধু পরকে

কষ্ট না দেওয়ার বেলায়ই ব্যবহার্য্য তা নয়, কিন্তু যেখানেই সুরুচির ব্যতিক্রম ঘটবার সম্ভাবনা, সেইখানেই প্রযুজ্য। সুরুচি পদার্থটি এত সূক্ষ্ম যে, তাকে কোন কাটাছাঁটা নিয়মের মধ্যে ধরাবাঁধা যায় না, এবং সমাজের স্তরভেদ অনুসারে তার আকারও বিভিন্ন হয়। কথায়ই বলে লোকের ভিন্ন রুচি। তবে সকল দেশের ভদ্রলোককেই মোটামুটি এক সমাজভুক্ত বলে গণ্য করা যেতে পারে। লোকসমাজে অযথা পরনিন্দা বা আত্মশ্লাঘা, পরের উপকার করে' নিজের মুখে দশবার বলা বা তাকে মনে করিয়ে দেওয়া, পরের আর্থিক অবস্থা বা অপর গোপনীয় পারিবারিক কথা সম্বন্ধে খুঁচিয়ে প্রশ্ন বা সমালোচনা করা, অনাহূত পরকে পরামর্শ দান, নিজের টাকার গল্প করা প্রভৃতি যে বাচনিক ক্ষেত্রে মোটেই সুরুচিসঙ্গত নয়,—তা এঁরা সকলেই স্বীকার করবেন। পূর্ব্বেই বলেছি যে স্পষ্ট অভদ্রতা,—যথা পরকে মুখের সামনে অপমান, বা মারধোর চেঁচামেচি করা ইত্যাদি আজকাল সভ্যসমাজে বিরল। কিন্তু আমাদের ভদ্রতম সমাজেও সুরুচির ব্যতিক্রম তেমন বিরল নয় দেখে দুঃখিত হতে হয়; ও সেই জন্যই এত কথা বলা। যে ভারতভূমি শিষ্টতার আকর বলে' খ্যাত ছিল, অন্যান্য অবনতির সঙ্গে যাতে এই পৈতৃক সম্বলটুকুও তার নষ্ট না হয়, অন্ততঃ আমরা মেয়েরা বোধহয় সেদিকে একটু লক্ষ্য রাখলে কৃতকার্য্য হতে পারি। আনুষ্ঠানিক ভদ্রতাকে অপেক্ষাকৃত নীচু আসন দিয়েছি বলে' যেন কেউ এ ভুল বিশ্বাস না করেন যে তাকে একেবারে গৃহ এবং সমাজ থেকে বহিষ্কৃত করাই আমার উদ্দেশ্য। আমার মনে হয় মেয়েরা স্বভাবতঃই কিছু অনুষ্ঠানপ্রিয় বা বাহ্যনিদর্শন-ভক্ত। জানি তুমি ভালবাস, বা তুমি ভক্তি কর, বা তুমি স্নেহ কর,—

তবু মাঝে মাঝে সে কথা বল', কাজে দেখিও, ভাবে জানিও,—"মাঝে মাঝে প্রাণে তোমার পরশখানি দিয়ো",—এই হচ্ছে তাদের ভাবখানা। বেশী সূক্ষ্ম তারা ধরতে পারে না, বেশী ব্যাপক বুঝতে পারে না;—তারা চোখে দেখতে চায়, হাতে পেতে চায়, প্রকাশ চায়, প্রমাণ চায়। তা ছাড়া অনুষ্ঠানের শ্রীটুকুও তারা ভালবাসে। কলমের এক আঁচড়ে বিবাহ আইনসিদ্ধ হতে পারে, কিন্তু স্ত্রী-আচারের চিত্রবৈচিত্র্য ভিন্ন মেয়েদের মন ওঠে না। সেইজন্য পুরুষরা যখন সমাজ-সংস্কারের অছিলায় (এবং হয়ত আসলে খরচ কমাবার অভিপ্রায়ে!) বিবাহের নিমন্ত্রণ-ফর্দ্দ বা ভোজের বাহুল্য ছেঁটে দিতে চান, তখন বাড়ীর মেয়েরা কিছুতেই রাজি হন না। সামাজিক ভদ্রতার অনুষ্ঠান গুলি,—যথা, আত্মীয়বন্ধুর সঙ্গে দেখাসাক্ষাৎ করা, তাদের চিঠি পত্র লেখা, অসুখ-বিসুখে খোঁজখবর নেওয়া, ক্রিয়াকর্ম্মে যোগদান, তত্ত্বতল্লাস, অতিথি-সৎকার প্রভৃতি প্রায়শঃ মেয়েরাই রক্ষা করে' থাকেন, এবং না করতে পারলে কষ্ট বোধ করেন। কিন্তু পুরুষেরা ত দেখেছি পরমাত্মীয় সম্বন্ধেও 'ভাল আছে' এইটুকু দূর থেকে জানতে পারলেই পরম নিশ্চিন্ত মনে থাকেন; যদিও তাঁরা অনেকেই আত্মীয়ের বিপদে আপদে যথেষ্ট সাহায্য করেন, এবং স্বজনবৎসল নন তাও বলতে পারি নে। তার এক কারণ বোধহয় এই যে, গৃহ এবং তারই আঙিনারূপ যে সমাজ, তা মেয়েদের জীবনসর্ব্বস্ব, কিন্তু পুরুষদের জীবনের ভগ্নাংশমাত্র। জীবনের আনন্দযজ্ঞে তাঁরা কেবল হোতা, মেয়েরাই যজ্ঞকর্ত্রী। এই সকল কারণে স্ত্রীপুরুষের সামাজিক মেলামেশার ক্ষেত্রে নিদেন মেয়েদের খাতিরে দেশকালপাত্রোপযোগী আনুষ্ঠানিক রীতিনীতি রক্ষা করে' চলাই ভাল। আত্মীয় বা

অনাত্মীয় অতিথি-অভ্যাগতের সঙ্গে সময়োচিত দুটো শিষ্ট কথা না বলা বড়ই দৃষ্টিকটু—তা অন্যমনস্কতাবশতঃই হোক, সঙ্কোচবশতঃই হোক, আর অপ্রবৃত্তিবশতঃই হোক্। ভদ্রব্যবহার এমন যন্ত্রবৎ অভ্যস্ত হওয়া উচিত যে এরূপ অনবধান বা ত্রুটি কোনমতেই সম্ভব না হয়। আমাদের নব্য-সমাজ রাজা হরিশ্চন্দ্রের মত এখনো সেকাল ও একালের মধ্যে দোদুল্যমান বলে' এ সব বিষয় একটা দু'তরফা ডিক্রী করা আবশ্যক হয়ে পড়েছে। কোন একটি উচ্চপদস্থা স্বদেশিনী একবার আমাকে বলেছিলেন যে, আমাদের বর্ত্তমান সমাজ-নীতি বিধি-বদ্ধ করে ফেলা উচিত। কিন্তু সে বিধান গড়বেই বা কে, আর মানবেই বা কে? সামাজিক আইন জারি করবার জন্য যখন কোন উপর আদালত নেই, তখন এ সকল নিয়ম আবশ্যকের চাকে এবং সুরুচির হাতে আপনি গড়ে উঠতে দেওয়াই ভাল। তবে মেয়েদেরই প্রধানতঃ এ কাজে হাত লাগাতে হবে। কারণ অন্যত্র যাই হোক্, সামাজিক ক্ষেত্রে তাদেরই বিধান শিরোধার্য্য।

(৬)

আত্মীয়ের সঙ্গে ব্যবহারের নিয়মের অভাব আমাদের নেই, কিন্তু সে গণ্ডির বাইরে গেলেই যেন জলে পড়তে হয়, কারণ মেয়েদের তার বাইরে যাবার হুকুম সেকালে ছিল না। একালে যখন তা' হয়েছে, এবং সখ ও আবশ্যকমত পরিচিত অপরিচিত, স্বদেশী বিদেশী সকল রকম সমাজেই আমাদের মেয়েদের অল্পবিস্তর মিশতে হচ্ছে, তখন লোকব্যবহারের কতকগুলি অলিখিত নিয়ম মেনে চলা নিতান্তই দরকার। সেগুলি দেশব্যাপী হওয়া, বা সকল সমাজে গ্রাহ্য হওয়া

যদিও এখনি আশা না করা যায়, তবুও স্বসমাজে, অন্ততঃপক্ষে স্বপরিবারে চালাবার চেষ্টা করা যেতে পাবে, এবং অনেকস্থলে করা হয়েও থাকে। যথা—কারো কারো মতে যে-পরিবারের মেয়েরা বেরোন না, সে পরিবারের পুরুষদের সামনে অন্য পরিবারের মেয়েদের বেরোনো উচিত নয়। এ সম্বন্ধে মতভেদ থাকতে পারে, এবং আছে; কিন্তু যাঁরা এই মত অনুসারে চলেন, তাঁরা ভেবেচিন্তে নিদেন একটা কোন সঙ্গত সামাজিক নিয়ম বের করেছেন, এটা মানতেই হবে। নিয়ম থাকাও চাই, অথচ এতটুকু নমনীয় হওয়া চাই যাতে অবস্থাভেদে ভেঙ্গে গড়া যেতে পারে,—উন্নতিশীল সমাজের এই লক্ষণ। যদিও নতুন নিয়ম গড়া নয়, পরন্তু গঠিত নিয়ম মেনে চলাই হিসেবমত ভদ্রতার কাজ। কারণ ভদ্রতার একটি প্রধান উপকরণ হচ্ছে সহজ ভাব। কষ্টকল্পনা বা সাধ্যসাধনা এসে পড়লেই যেন তার স্বাভাবিক শ্রী নষ্ট হয়ে যায়। এবং এই সহজ ভাবটি একমাত্র অভ্যাসের দ্বারাই লভ্য। বস্তুতঃ সহজ হওয়া যে কত শক্ত, তা' সামাজিক অভিজ্ঞতা না থাকলে বোঝা যায় না। স্ত্রী-স্বাধীনতা স্ত্রী-শিক্ষারই অগ্রবর্ত্তী উত্তরাধিকারী। এই অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনা না করে' মেয়েদের অকাল-স্বাধীনতা দেওয়ার কোন সুফল আমি ত দেখতে পাই নে। অনভ্যাসের সঙ্কোচে যে ন-যযৌ-ন-তস্থৌ ভাব হয়, সেটা বড়ই অশোভন। নিয়মের অভাবে শিক্ষিত মেয়েদেরই অনেক সময় কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় বোধ হয় ত অন্যে পরে কা কথা। যদি বিয়ের আগে পর্য্যন্ত আমার মেয়েকে ঘরে বন্ধ করেই রাখলুম, তাহলে স্বগৃহের গৃহিণী হওয়ামাত্র হঠাৎ কি করে' সে ব্যাপকতর সামাজিক ভদ্রতা রক্ষা করে' চল্‌বে? সহজ মেলামেশবার ক্ষমতা আয়ত্ত করাবার প্রশস্ত উপায় ছেলেবেলা থেকে

মেলামেশার অভ্যাস করানো। ইংরাজরা ছেলেদের আদবকায়দা বিষয়ে খুব সচেষ্ট ও সজাগ। আমরা তা নই বলে আমাদের অধিকাংশ ছেলে বাইরের লোক সম্বন্ধে হয় বেশী বাচাল ও বেচাল কিম্বা বেশী সঙ্কুচিত ও ভীত হয়। বড়রাও যে সে দোষমুক্ত, তা' নয়। এ সব কেবল অনভ্যাসের ফল,—এবং তার প্রতিবিধান বাপমায়েরই হাতে। লোকসমাজে স্বায় সন্তানগণ যাতে সহজ, সদয়, সুরুচিপূর্ণ সংযত ও স্বদেশীভাবানুমোদিত ব্যবহার করতে শেখে, এই পঞ্চ 'স'কারের দিকে তাঁদের বিশেষ দৃষ্টি রাখা কর্ত্তব্য। ইংরাজীতে 'lady' ও 'gentleman' শব্দে ভদ্রব্যবহারের যে উচ্চ আদর্শ সূচিত করে, তা' রক্ষা করে' চল্‌তে পারলে নৈতিক উপদেষ্টার আর বড় কিছু বল্‌বার বাকি থাকে না।

আমাদের দেশে রাজদরবার ছিল না বলে', কিম্বা যে কারণেই হোক্,—ভারতবর্ষের অন্যান্য প্রদেশের তুলনায় বাঙ্গলাদেশে সামাজিক আচার-অনুষ্ঠানের কি একটু অভাব লক্ষিত হয়?—উচ্চনীচ সম্বন্ধ ব্যতীত সমকক্ষ মেলামেশার সকল অবয়ব যেন এখানে সম্পূর্ণ নয়। ব্রাহ্মণ ভিন্ন অপর জাতের সঙ্গে দেখা হলে সাধারণ অভিবাদনের কোন নির্দ্দিষ্ট রীতি নেই; আত্মীয়া ভিন্ন অপর স্ত্রীলোককে সম্বোধন করবার কোন শিষ্ট প্রথা নেই। কিম্বা আগে থাকলেও, এখন লোপ পেয়েছে। এ সকল অভাবমোচন বা ক্ষতিপূরণের চেষ্টা একালের মেয়েদের একটি কর্ত্তব্য কাজ। অন্যান্য বিষয়েও যেমন, এ সব বিষয়েও তেমনি আমরা দায়ে পড়ে ইংরাজী সভ্যতার শরণাপন্ন হয়েছি। কিন্তু প্রত্যেক খুঁটিনাটি বিষয়ে ইংরাজদের নকল করাটা—বিশেষতঃ সামাজিক ক্ষেত্রে,—মোটেই শোভন বা বাঞ্ছনীয় নয়। অবশ্য এতদূর এগিয়ে এসে হঠাৎ বেশী পিছিয়ে যাওয়া সম্ভব নয়। আমি একলা ঘরে বসে' একটা

মন-গড়া নিয়ম মানলেই ত যথেষ্ট হ'ল না। দশজনকে যদি সঙ্গে নিতে চাই ত, সাময়িক অবস্থা বুঝে যা' রয় সয় এমন নিয়মই চালাবার চেষ্টা করতে হয়। যা' কালের অতল বিস্মৃতিসাগরে চিরবিলুপ্ত, তীরে বসে' বসে' তা'কে পুনরুদ্ধার করবার বৃথা চেষ্টায় সময় নষ্ট না করে—এখনো যেটুকু দেশীয়তা প্রচলিত আছে, সেটুকু যা'তে নব্যভাবের সঙ্গে জড়িত হয়ে স্থায়িত্ব লাভ করে, সেইদিকেই লক্ষ্য রাখা উচিত। যথা :— ব্রাহ্মণের প্রাপ্য অভিবাদন সব জাতেই যেন সমানভাবে পায়, 'শ্রীমতী' ও 'দেবী' প্রভৃতি সম্মানার্থক সম্বোধনই যা'তে সমাজে প্রচলিত হয়, ইত্যাদি।

আত্মীয়তার বাইরেই ভদ্রতার পূর্ণ প্রকাশ ও প্রয়োজনীয়তা যেমন উপলব্ধি করা গেল, তেমনি সেই বাইরের সমাজে আবার কথোপ-কথনের ক্ষেত্রেই তার চরম বিকাশ লক্ষিত হয়; কারণ ক্ষণিক মেলা-মেশার সঙ্কীর্ণ অবকাশে পরস্পরের জন্য হাতেকলমে বিশেষ কিছু করবার সুযোগ কমই পাওয়া যায়। স্ত্রীলোককে পুরুষমানুষে যে ছোট-খাটো সাহায্যগুলি করতে পারে ও করলে ভাল দেখায়, পুরুষসমাজে পরস্পরের মধ্যে তাও বিশেষ আবশ্যক হয় না,—অবশ্য বয়সের বেশি তফাৎ না থাকলে। কিন্তু সমবয়সী ও সমকক্ষ পুরুষসমাজের কথোপ-কথনস্থলেও আমাদের কতকগুলি জাতীয় দোষ প্রকাশ পায়, যা' সংশোধন করতে পারলেই ভাল। মেয়েরাও সে দোষবর্জ্জিত নন। প্রথমতঃ, আমরা প্রায় সকলেই বেশি চেঁচিয়ে কথা কই; দ্বিতীয়তঃ, তর্ক-স্থলে আমরা অধিকাংশ লোকেই চটে গিয়ে কূটতর্ক, জিদ বা ব্যক্তিগত খোঁটার আশ্রয় নিই; তৃতীয়তঃ, আমরা অন্যের কথা শেষ হওয়া পর্য্যন্ত অপেক্ষা না করে অধীরভাবে মাঝে বাধা দিয়ে কথা বলি—(হিত অথচ

মনোহারী ব্যক্যের চেয়ে কি মনোযোগী অথচ সমঝদার শ্রোতা বেশী দুর্লভ নয়?); চতুর্থতঃ, আমরা নিজের উপস্থিত ইচ্ছামত কথা বলে' যাই, শ্রোতা বুঝে কথার বিষয় এবং মাত্রা নির্দ্ধারণ করিনে। আমার শরীরের অসুখ বা আমার মনের ভাবনার বিস্তারিত বিবরণ যে সকলের রুচিকর না বোধ হতে পারে সে কথা ভুলে যাই, এবং অন্যকে কথা বলবার বা মতামত ব্যক্ত করবার অবসর দিই নে। ফলে দাঁড়ায় এই যে, আমাদের গল্পগোষ্ঠী হয় একটা গোলে-হরিবোলে পরিণত হয়, যেখানে সকলেই একসঙ্গে বলে, কিন্তু কেউ শোনে না;—কিম্বা ইংরাজীতে যাকে বলে 'one-man-show' তাই হয়, অর্থাৎ একজন মাত্র বক্তা, আর সকলে শ্রোতা। যদিও সর্ব্বাঙ্গীন আলোচনা বা সমালোচনাই সামাজিক মেলামেশার প্রধান সুখ ও সুফল। পঞ্চমতঃ, আমরা জেনেশুনে এমন প্রসঙ্গ উত্থাপন করি যা' উপস্থিত লোকের পক্ষে অপ্রীতিকর, অথবা এমন করে কথা বলি যা'তে তাদের কারো মনে লাগতে পারে—ভাষায় যা'কে বলে "ঠেস দিয়ে কথা বলা"। —দরকার কি? ভদ্রতা যদি নীতি না হয় ত ভদ্রসমাজও নীতি-উপদেশ বা শাসনদণ্ডের স্থান নয়। বেশী শাসন করতে চাও সমাজ থেকে তাড়াও; কিন্তু যে যতক্ষণ সমাজে আছে তার সঙ্গে ভদ্র ব্যবহার কর। অভদ্রতা না করেও বোধহয় একজনকে বোঝানো যায় যে তাকে আমার বড় পছন্দ নয়, এবং সময়ে সময়ে তা বোঝানো আবশ্যকও হয়ে পড়ে; কিন্তু এগুলি ভদ্রতার ব্যতিক্রম মাত্র, নিয়ম নয়। কবিতা যদি "কি-যেন-কি"র উপর প্রতিষ্ঠিত হয় ত সমাজকে মনে কর "যেন"র উপর প্রতিষ্ঠিত; মনে মনে যার যাই থাক্, লোকসমাজে এমন ভাবে চল যেন সকলের সঙ্গে সব সম্পর্ক ঠিক আছে, যেন তোমাকে দেখে আমি ভারি

খুসি হয়েছি, যেন তোমার জন্যে এ কাজটুকু করে দিতে পারায় তোমার নয়, আমারই লাভ। আর ভেবে দেখতে গেলে সেটা এমনই বা শক্ত কি? কেনই বা শুধু মৌখিক হবে? আত্মীয়তাস্থলে ভালবাসার অভাব ভদ্রতায় পূর্ণ করা শক্ত বটে; কিন্তু অনাত্মীয়ক্ষেত্রে ভদ্রতা, বিনয়, নম্রতা প্রভৃতি সদ্‌গুণে ক্ষণকালের জন্যেও ভূষিত হওয়া ত সহজ বলেই বোধ হয়। পর যখন এত অল্পেতেই সন্তুষ্ট হয়, তখন সেটুকু তার জন্য না করাটাই আশ্চর্য্য, করায় কিছু বাহাদুরী নেই। অর্থ বা মানের দম্ভে যাঁরা ধরাকে সরাজ্ঞান করেন ও মানুষকে মানুষজ্ঞান করেন না, তাঁরা ভুলে যান যে মানুষ নইলে মানুষের একদিনও চলে না এবং চিরদিন কারো সমান যায় না।

পরিশেষে আবার বলি যে ভদ্রতা সর্ব্বরোগের মহৌষধ না হলেও, এবং তার প্রসার বা গভীরতা বেশী না থাকলেও তা' ঘরে বাইরে অতি আবশ্যকীয় উপাদেয় জিনিস, এবং ছেলেমেয়েদের শিক্ষা দেওয়া অবশ্য-কর্ত্তব্য,—শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ। এক দিনের জন্যেও যদি ভদ্রতা সমাজ থেকে ছুটি নেয়, তাহলে কি ভীষণ অরাজকতা উপস্থিত হয়, তা' মনে করতেও কি হৃৎকম্প হয় না? এক হিসেবে ভদ্রসমাজের সকলেই যেন একটি পাৎলা বরফখণ্ডের উপর নৃত্য করে' বেড়াচ্ছে,—পায়ের তলায় একটু ভাঙ্গলেই অতল জলে মজ্জমান হবার সম্ভাবনা;—কিন্তু ভাগ্য-ক্রমে সহজে ভাঙ্গে না!—এই ধূলিম্লান পৃথিবীর রুক্ষতাকে মোলায়েম করে' এনে দৈনিক জীবনযাত্রার যা'তে একটু শ্রীসম্পাদন করতে পারি, সকলেরই কি সেই চেষ্টা করা উচিত নয়? যদি কেউ এর আনুষ্ঠানিক কর্ত্তব্য থেকে রেহাই পেতে পারে ত সে কেবল সেই সকল অসাধারণ লোক, যাঁরা এমন কোন বৃহৎ কাজ বা মহৎ চিন্তায়

লিপ্ত আছেন যা'তে সমাজের ছোটখাটো আদেশ পালন করবার সময় পাওয়া অসম্ভব এবং সর্ব্বদাই অন্যমনস্ক থাকতে হয়;—যাঁরা সংসারে থেকেও সংসার ও সমাজকে অতিক্রম করেছেন। বড় কাজ কিছু শুধু ভদ্রতার দ্বারা হবে না সত্য, কিন্তু ছোট ।নয়েই ত আমাদের অধিকাংশের অধিকাংশ জীবনের কারবার,—ছোট কাজ, ছোট কর্ত্তব্য, ছোট সুখ, ছোট দুঃখ। আমাদের বড় বড় ঋষিরাও ত প্রার্থনা করেছিলেন—যদ্ভদ্রং তন্ন আসুব। যাহা ভদ্র, যাহা কল্যাণ, তাহাই আমাদের মধ্যে প্রেরণ কর।

শ্রীইন্দিরা দেবী চৌধুরাণী।

লাভালাভ।

——:০:——

কবিরা যে আহাম্মক, তারা যে নিজেদের মঙ্গল নিজেরাই বোঝে না, তারা যে সকল কাজের মধ্যেই কেবল অবিবেচনার পরিচয় দেয় এমনিতর অনেক কথা বুদ্ধিমান লোকেদের কাছ থেকে প্রায়ই শুনতে পাওয়া যায়। শুধু তাই নয় কবিরা নিজেরাই অনেক সময় এমন এক একটা কথা বলে বসেন যা থেকে এইটেই কেবল মনে হয় যে তাদের কোন কাজের মধ্যেই যুক্তি বা বিবেচনার লেশমাত্র নেই; যেমন রবিবাবু এক জায়গায় বলেছেন, "তরী সেই সাগরে ভাসায় ও যার কুল সে নাই জানে।" উক্ত বুদ্ধিমান লোকেরা একথা শুনে বলে উঠবেন, "যে-সাগরের কুল পাওয়া যাবে না তাতে তরী ভাসাতে কে মাথার দিব্যি দিচ্ছে, যার কুলই পাওয়া যাবে না তাতে তরী ভাসিয়ে লাভ কি? এই "লাভ কি"র উপরেই সমস্ত ব্যাপারটা নির্ভর করছে।

উদ্দেশ্য হিসাবে মানুষের লাভালাভ ভিন্ন রূপ ধারণ করে। চাক্‌রে বাবু যখন ছুটি পেয়ে দেশে যাবার জন্যে ট্রেণে ওঠেন তখন তিনি ক্রমাগতক এই কথাটাই ভাবতে থাকেন যে কতক্ষণে পথ ফুরবে যে তিনি বাড়ী গিয়ে পৌঁছুতে পারবেন। এখানে পথটা তাঁর উদ্দেশ্য নয় এটা কেবল তাঁর ঈপ্সিত বস্তুর কাছে নিয়ে যাবার উপায় মাত্র, কাজেই সেটার দিকে তাঁর দৃষ্টি নেই, সেটাকে তিনি ধর্ত্তব্যের মধ্যেই আনতে পারেন না; কিন্তু যাঁরা ট্রেণে চড়েন বেড়াবার জন্যে,

দুধারের ধানের ক্ষেত আর সবুজ গাছপালার সৌন্দর্য্য উপভোগ করবার জন্যে তাঁরা ভাবেন পথ না ফুরুলেই বাঁচি। ট্রেণ যতক্ষণ চলে ততক্ষণই যে তাঁদের লাভ। এখানে পথটাকে উপভোগ করাই যে তাঁদের উদ্দেশ্য কাজেই পথ যত না ফুরোয় ততই তাঁদের লাভ। এইখানেই কবি আর সাংসারিক লোকের তফাত। সাংসারিক লোকদের উদ্দেশ্য বাড়ী পৌঁছান, কাজেই পথ যত শীঘ্র কেটে যায় ততই ভাল আর কবির উদ্দেশ্য হচ্ছে ওপারে যাবার পথটাকে উপভোগ করা কাজেই পথটাকে ফুরুতে দেওয়াটা তাঁর ইচ্ছে নয় কাজেই কবি ত সেই সাগরেই তরী ভাসাবে "যার কুল সে নাহি জানে।"

পথ হাঁটাটাই যে কবির সুখ। সেই অজানার পিছনে পিছনে ছোটাটাই, সেই অকুলের কুল পানে তরী ভাসানটাই যে তার আনন্দ; যদি কুলই পায় তা হলে তরী ভাসান যে তার বন্ধ হয়ে যাবে তাই সে "তরী সেই সাগরে ভাসায় ও যার কুল সে নাহি জানে।" সে যে চিরকাল এমন সাগরে তরী ভাসিয়ে এসেছে যার কুল-কিনারা পাবার সম্ভাবনা নেই এবং সে যে এমনি অকুলের মধ্যেই তরী ভাসাবে। যদি কুলই সে পায় তবে কুলের জিনিস, কুলের গাছপালা, কুলের আকাশ সবই যে কুহেলিমুক্ত, পরিষ্কার হয়ে যাবে তাহলে সে যে স্বপ্ন-রাজ্যের সীমা ছাড়িয়ে বাস্তবের গণ্ডীর মধ্যে এসে পড়বে। যা পাই, যা পাওয়ার মধ্যে বাধা নেই সে ত কবির জিনিস নয়; যা পাই তার মধ্যে যে মাদকতা নেই, তা নিয়ে যে বিভোর হওয়া যায় না। যা না পাই সে যে ঐ না-পাওয়ার ভিতর দিয়ে অনেক পাওয়াকে পাইয়ে দেয়। যে-টাকে ইচ্ছে করলেই পেতে পারি তাকে নিয়ে মানুষ ক'দিন বাঁচতে পারে? এটা পাগলামীর কথা নয়, এটা খুব সত্য কথা। এ ভাবটা

প্রত্যেক মানুষের মধ্যে অল্পবিস্তর ভাবে আছেই আছে। কোন্ ব্যক্তি না, পুরাতন কোন সহর বা পুরাতন কোন নগরের ভগ্নাবশেষ দেখতে ভালবাসেন? কেন ভালবাসেন এ প্রশ্ন যদি তাঁরা নিজেদের মনকে কোন দিন জিজ্ঞাসা করেন তা হলে মনের খুব অনেক দূর থেকে একটা অস্পষ্ট আওয়াজ বলবেই বলবে যে, "ওহে! সেখানে গেলে কল্পনা যে নিজের কাজ পায়। সেখানে যে অনেক এমন জিনিস দেখতে পাওয়া যায় যার মধ্যে গোপনতা আছে তার মধ্যে "কি যেন আছে, কি যেন নাই" এমনি একটা ভাব প্রকাশ পাচ্ছে। নূতন সহর দেখলুম, সে তার সমস্ত অন্তরখানাকে বার করে রেখেছে, মেলিয়ে রেখেছে; আমরা দেখলুম, চলে এলুম, ফুরিয়ে গেল; আসবার সময় বলে এলুম, "এই ত।" কিন্তু ধ্বংসের মধ্যে "এই ত" বলে হাঁফ ছাড়বার জো নেই; সে যে অর্দ্ধেকটা লুকিয়ে রেখে দিয়ে বল্‌ছে, "ওহে দর্শক সবটা তোমাকে দেখাব কেন, যেটুকু দেখলে তাই থেকে ভেবে নাও আমি কি ছিলুম।" মানুষের ধর্ম্মই হচ্ছে এই যে তারা সেইটার মধ্যেই মাদকতা পায় যেখানে তাদের মন খাটবার মতন খানিকটা অবসর পায়।

কবি আব্‌ছায়াকেই চায়, সে অকূলের মাঝখানে তরী নিয়ে গিয়ে দাঁড়াবে, চারিদিকে চেয়ে দেখবে, সুমুখে কূল নেই, পিছনে কূল নেই, আশে পাশে ও তাই; সবই ধোঁয়ায় ঢাকা, তবে ত তার আনন্দ। তবে ত সে ওপারের জন্য পাগল হয়ে উঠবে, তবে ত সে ওপারের পাড়ির বন্দোবস্ত করবে। ওপারে কি আছে তা না জানতে পারাটাই যে তাকে ক্রমাগতক ডাকছে, "আয় আয়"। ঐ অজানার মধ্যেই যে তার ঈপ্সিতের বাসভূমি, ঐ অজানার মধ্যেই যে তার অপরিচিতের আহ্বান।

শ্রীবিশ্বপতি চৌধুরী।

"ঘরে-বাইরে"।

——:*:——

আমি রবিবাবুর উপর্য্যুক্ত নামধেয় পুস্তকখানির সমালোচনা করিতে বসি নাই, সর্ব্বাগ্রেই এই কথা বলিয়া লইয়া, আমার যাহা বলিবার তাহা বলিব।

হইতে পারে কারও কারও কাছে বইখানি খুব মন্দ, আবার এমন লোকও থাকিতে পারেন, যাঁহার কাছে উহা বাঙ্গালা-সাহিত্যে একখানি অপূর্ব্ব গ্রন্থ। অবশ্য একথাও বলা যায়, যে যাহা অপূর্ব্ব তাহাই সর্ব্বোৎকৃষ্ট হইতে বাধ্য নয়, এবং উৎকৃষ্ট জিনিস চাই কি অপূর্ব্ব নাও হইতে পারে!

আমি বলিতে চাই, ভারতবর্ষটা নিতান্ত কুনো। ভারতবর্ষের লোক নিতান্ত গৃহবদ্ধ, নিতান্ত আত্মসর্ব্বস্ব! ঘরের বাহিরে আর কোনও ভাল জিনিস আছে কি না, এ খোঁজ লওয়া যাঁহাদের শাস্ত্রবিরুদ্ধ, তাঁহারা "আপভালা" হইতে পারেন, "জগৎ" তাহাদের কাছে ভাল

আর সেই যে "আপভালা" তাহাও নিজের কাছে এবং নিতান্ত গায়ের জোরে। "যাহা নাই ভারতে তাহা নাই ভারতে" যাঁহারা বলেন, তাঁহারা ভারতকেও চেনেন না, জগৎকেও চেনেন না। একটা বাঁধিগৎ আওড়ান মাত্র।

বাঁধিগৎ আওড়ানো বিষয়ে ভারতবর্ষের লোক ঠিক টিয়াপাখী। ভারতবর্ষটা কতকগুলো টিয়াপাখীর একটা বৃহৎ খাঁচা ছাড়া আর কি? এই টিয়াপাখীগুলির নিজেদের খাঁচার বাহিরে যাওয়ার ভ-

ক্ষমতা নাই-ই, অন্য কাহাকেও যাইতে দেখিলেও অমনি বাঁধিগৎ-শাস্ত্রের দোহাই! সমুদ্রযাত্রা নাকি শাস্ত্রনিষিদ্ধ। হাঁচি টিকটিকির মত এই শাস্ত্রবাক্য আমাদের পদে পদে বাধা।

কিন্তু আমরা বাহিরের সংবাদ পাইয়াছি—আমরা বাহিরে যাইতে চাই! গৃহবদ্ধ শিশু রবীন্দ্রের মুক্তির আকাঙ্ক্ষা আমাদের জাতির প্রাণে জাগিয়া উঠিয়াছে—আমরা বাহিরের বাঁশী শুনিয়াছি—আমরা আকুল হইয়াছি! আকাশের নিলীমা, বাতাসের গন্ধ, প্রান্তরের শ্যাম-শোভা, গগনের আলো আমাদিগকে ডাকিতেছে—দ্বরজা খুলিয়া দাও আমরা বাহির হইব। কেন এ বন্দীত্ব, কেন এ প্রাণান্তকারী অবরোধ।

ধরিয়া লওয়া যাউক এ ঘর খুব ভাল; কিন্তু বাহিরের জন্য যে ক্ষুধা সে ক্ষুধা ত আমার ঘরে মিটিবে না! বাহিরে বিপদ থাকিতে পারে ঘরেও ত কম নাই। বাহির হইলে মরিব কিন্তু ঘরে বসিয়া চিরায়ু হইব এ গ্যারাণ্টি কেহ দিতে পারে? অনেক দিন তো বাঁচিয়া আছি, বাহিরে গিয়া না হয় একটু মরিয়াই দেখি, বাহিরে কি কেবল শ্মশান? কেবল শ্মশানই যদি হয়, ওরে নাস্তিক, শ্মশানের পর কি আর কিছু নাই?

কিন্তু বাহিরটা তো শ্মশান নয়, ওখানে ও অনেকে জন্মিয়াছে, ওখানে ও অনেকে বাঁচিয়া আছে। ঘরেও তোমার সেক্সপিয়ার হেগেলের মত লোক ভূরি ভূরি জন্মে নাই! বাহিরেও কবির অভাব নাই, রাজনীতিকের অভাব নাই, জ্যোতির্ব্বিদ-গণিৎবিদের অভাব নাই, দার্শনিকের অভাব নাই, জ্ঞানের অভাব নাই, ভক্তের অভাব নাই, বৈরাগ্যের অভাব নাই, ধর্ম্মের ও ধার্ম্মিকের অভাব নাই; কৃষ্ণের অভাব নাই, রামের অভাব নাই! আর তোমার ঘরের সবই যে পরের

সবের চেয়ে শ্রেষ্ঠ; বাহিরের সঙ্গে তুলনা না করিয়া কেমন ক রয়া বুঝিব। তোমার নিষেধ বাক্যেই সন্তুষ্ট থাকিতে হইবে?

ঘরের বিমলা যদি বাহিরের সন্দীপের প্র।ত আকৃষ্ট হইয়া থাকে, দাও তাকে আকৃষ্ট হইতে! সন্দীপ যদি নিতান্তই মন্দ হয়, তোমার ঘরের বিমলাকে কি তুমি এতটুকু শিক্ষাও দেও নাই যাহাতে সে ফিরিয়া আসিতে পারে? যদি না ফিরিয়া আসে? এতটুকু ভরসা যার উপরে তুমি রাখ নাই, তাহাকে লইয়া ঘর করিবে কেমন করিয়া? নিষেধে? শাসনে? গঞ্জনায়? এইরূপে একটি জাতিকে ঠিক রাখিবে? সম্ভব হয় রাখ। শাসন করিয়া, নিষেধ করিয়া, ভয় দেখাইয়া কে কাহাকে বশে রাখিতে পারে? একটা জাতিকে? পাগল! যে জাতি উন্মুক্ত উদার বাহিরের স্বাদ পাইয়াছে, তাহাকে ঘরের মধ্যে পুরিয়া রাখিবে? চেষ্টা কর।

কিন্তু ঠিক জানিও, বিমলার স্বামী নিখিলেশ হইলেই তবে বিমলা ঘরে ফেরে, নহিলে বিমলা ফিরিলেও পাতিতা হয়! অমন বিমলাও! আর মনে রাখিও, যদি দেশের উন্নতি সম্ভবপর হয়, তুমি সমাজ, বিলাত-ফেরৎ বলিয়া যাহাদিগকে ত্যাগ করিয়াছ, তাহাদের দ্বারাই হইবে। তোমার তাম্রকূটধ্বংশপরায়ণ চণ্ডীমণ্ডপাধিষ্ঠিত আর্য্যবংশ-ধরদিগের দ্বারা নয়! আর বাহিরকে অগ্রাহ্য কর তুমি, যাহার দৌলতে তুমি বাঁচিয়া আছ, যাহার বস্ত্রে তুমি লজ্জা নিবারণ কর, যাহার আলোয় তোমার দীপ জ্বলে।

রবীন্দ্রনাথ কবি,—তাঁহাকে ঋষি না বল তোমার ঋষিরা শাস্ত্র লইয়া বাঁচিয়া থাকুন—তিনি মহাপ্রাণ ব্যক্তি; বঙ্গদেশকে বিধাতার এক অমূল্য দান, বাল্যে যাঁহার চিত্ত বাহিরের জন্য আকুল হইয়া-

ছিল, এবং যিনি সেই বাহিরের আলো-বাতাসের সংবাদ তোমার অচলায়তনের রুদ্ধ দ্বারের কাছে আজীবন গাহিয়াছেন, তুমি তাঁহার সঙ্গীত বুঝিতেছ না, তাঁহাকে দূরে রাখিতেছ! ইচ্ছা করিয়া যদি প্রতারিত হইতে চাও, হও; সেও ভাল,—যদি কোনও দিন অনু-তাপের দিন আসে! অহমিকার বিষে জর্জ্জরিত তোমরা, এই কাবকে চিনিলে না!

৺দ্বিজেন্দ্রলালকে তোমরা বাহবা দিয়াছ, অথচ তাঁহার কথা তোমরা বোঝ নাই! আর ইঁহার কথাও তোমরা বুঝিতেছ না। মুক্তির বাণী কি তোমাদের কাছে এতই দুর্ব্বোধ্য! নিজের পায়ের শিকল চিনিতেও কি তোমাদের এত দেরী হয়? সত্যই তাহা হইলে, দাসত্বের জন্য এমন উপযুক্ত জাতি পৃথিবীতে আর দ্বিতীয় নাই।

যদি স্বাধীনতার অর্থ বুঝিতে, তাহার অভাব বোধ করিতে, তাহা হইলে কবির "কর্ত্তার ইচ্ছায় কর্ম্ম" দেশের বালক-বৃদ্ধের হাতে দেখিতাম! কেবল ঐ একটি প্রবন্ধ হাতে লইয়া একটি জাতি মুক্ত হইতে পারে,—যদি সে মুক্তি চায়! কিন্তু দেশের এমনি অদৃষ্ট, ঐ প্রবন্ধেরও বিরুদ্ধ সমালোচনা হইতেছে! ঐ প্রবন্ধের লেখকের মস্তিষ্ক সম্বন্ধেও কেহ কেহ গভীর সংশয় প্রকাশ করিতেছেন! দুর্ভাগ্য আর কাহাকে বলে?

শ্রীঅরবিন্দ সেন।

———•

মাঘ, ১৩২৪

সবুজ পত্র

সম্পাদক

শ্রীপ্রমথ চৌধুরী

বার্ষিক মূল্য দুই টাকা ছয় আনা।

সবুজ পত্র কার্য্যালয়, ৩ নং হেষ্টিংস্ ষ্ট্রীট,

কলিকাতা।

৭৪

কলিকাতা।
৩ নং হেষ্টিংস্ ষ্ট্রীট।
শ্রীপ্রমথ চৌধুরী এম্, এ, বার-য়্যাট-ল কর্ত্তৃক
প্রকাশিত।

কলিকাতা।
উইক্‌লী নোট্‌স প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্,
৩ নং হেষ্টিংস্ ষ্ট্রীট্।
শ্রীসারদা প্রসাদ দাস দ্বারা মুদ্রিত।

শক্তিমানের ধর্ম্ম।

—ঃ০ঃ—

"সদর বড় না অন্দর বড় ?"—"মানুষের বাহিরটা বড় না তার ভিতরটা বড় ?"—এই হচ্ছে "কর্ত্তার ইচ্ছায় কর্ম্ম" আর "বুদ্ধিমানের কর্ম্ম" এই দুটোর মধ্যে আসল তর্কটা। হিন্দুর পক্ষে কি তার রাষ্ট্রীয় অবস্থা, কি তার সামাজিক ব্যবস্থা এ দুটোর কোনটাই যে বর্ত্তমানে তেমন মোলায়েম নয় তা রবীন্দ্রনাথও বলেন আর বিপিন বাবুও মানেন—কিন্তু যত মতভেদ সে শুধু এর কার্য্য-কারণ সম্বন্ধ নিয়ে—cause ও affect নিয়ে। রবীন্দ্রনাথ বল্‌ছেন—সমাজটা হচ্ছে ঘোড়া আর রাষ্ট্রটা হচ্ছে গাড়ী। এই সমাজ-ঘোড়া বলিষ্ঠ ও মুক্ত না হলে' সে ঐ রাষ্ট্র-গাড়ীকে টান্‌তে পারবে না। বিপিন বাবু বল্‌ছেন—Oh no, I beg your pardon that is—রাষ্ট্রটাই হচ্ছে ঘোড়া আর সমাজটা হচ্ছে গাড়ী—রাষ্ট্র-ঘোড়া শক্ত না হলে সমাজ-গাড়ী চিরকাল তক্তা হ'য়েই কাল কাটাবে।

রাষ্ট্রের তুলনায় মানুষের সমাজটা তার অন্দর। আবার সমাজের তুলনায় মানুষের মনটা তার অন্দর। রবীন্দ্রনাথ বল্‌ছেন—এই মন-অন্দরের উপরে আমরা শত সহস্র নিষেধের ঘোমটা টেনে দিয়ে, অক্ষমতার সুতোয় বোনা এমনি কালো পুরু আরামের পর্দা টাঙিয়ে দিয়েছি যে রাষ্ট্রের মুক্ত হাওয়া আর সেখানে আস্‌তে পারছে না। বিপিন বাবু বল্‌ছেন—Fiddlesticks—বাজে কথা। রাষ্ট্রের হাওয়াটা এসে পড়ুক ও ঘোম্‌টা টোম্‌টা কোথায় উড়িয়ে নিয়ে যাবে।

এই মতভেদের মূলে একটা philosophy-র ভেদ আছে। রবীন্দ্রনাথ বল্‌ছেন—মানুষের ভিতরটা দিয়ে তার বাহিরটা নিয়ন্ত্রিত হয়। আর বিপিন বাবু বল্‌ছেন—মানুষের বাহিরটা দিয়েই তার ভিতরটা গড়ে' ওঠে। অর্থাৎ রবীন্দ্রনাথের মতে আমাদের আত্মাটা আমাদের দেহটাকে গড়ে' তুলেছে। অপরপক্ষে বিপিন বাবুর মতে আমাদের দেহটাই আমাদের আত্মার জন্ম দিয়েছে। এ মত শুনে হিন্দু-দর্শনের প্রতি যার কিছুমাত্র শ্রদ্ধা আছে তারই চক্ষুস্থির হবে নিশ্চয়। কিন্তু "কর্ত্তার ইচ্ছায় কর্ম্ম" আর "বুদ্ধিমানের কর্ম্ম" এ দুটোর আসল অমিলটা হচ্ছে ঐ গোড়ার কথায়।

রবীন্দ্রনাথ আমরা আজ যে অবস্থায় এসে পৌঁছেছি তার জন্যে দায়ী কর্‌তে চান আমাদের নিজেকে। আর বিপিন বাবু তার জন্যে দোষী করতে চান মহম্মদ গজনি সাহেব ও জন্ কোম্পানীকে। এই নিয়েই ত তর্ক।

শ্রীযুক্ত প্রমথ চৌধুরী গত শ্রাবণের "সবুজ পত্রে" "প্রাণের কথা" প্রবন্ধে লিখেছিলেন যে উদ্ভিদ পশু আর মানুষ এ তিনের তিনটী পৃথক বিশেষ-ধর্ম্ম আছে। উদ্ভিদের স্থিতি—পশুর গতি—আর মানুষের মতি। উদ্ভিদসম্বন্ধে তিনি লিখেছিলেন যে, "উদ্ভিদ নিশ্চল অতএব তা পারিপার্শ্বিক অবস্থার একান্ত অধীন। প্রকৃতি যদি তাকে জল না জোগায় ত সে ঠায় দাঁড়িয়ে নির্জ্জলা একাদশী করে' শুকিয়ে মরতে বাধ্য।" বিপিন বাবু আমাদের এই উদ্ভিদের ক্যাটিগরিতে ফেলতে চান। এতে আশা করি নব্য বাংলার অন্ততঃ নবীন ও তরুণ যাঁরা তাঁদের অনেকেই মনে মনে আপত্তি করবেন।

(২)

বিপিন বাবু একজন সুতার্কিক। কিন্তু তিনি তাঁর মতের সত্যতা প্রতিপন্ন করবার জন্যে যে-সব প্রমাণ দাখিল করেন সে-সব প্রমাণের আড়াল থেকে অনেক সময় একটা unconscious humour উঁকি মারতে থাকে। কারণ তিনি যে-সব প্রমাণ দিয়ে যে-সব সিদ্ধান্ত প্রতিপন্ন করতে চান—ঠিক সেই সব প্রমাণ দিয়ে তার উল্‌টো সিদ্ধান্তটাও সমর্থন করা যায়। কারণ প্রমাণের আসল মজাটা ত প্রমাণের মধ্যে নেই—সেটা আছে তার প্রয়োগের বাহাদুরীতে। বিশেষতঃ প্রমাণ জিনিসটীর মতো মুক্তজীব এ জগতে আর দুটী নেই। প্রমাণ ঐতিহাসিক ঘটনার পোষাক পরে' ভারী ভারী বড় বড় চিন্তার আশা-শোটা কাঁধে চড়িয়ে যে-কোন সত্য-মহারাজের পাছে পাছে একই রকম গাম্ভীর্য্যের সঙ্গে চলে—আজকার সত্য-মহারাজ যদি কালকার সত্য মহারাজের ঘোর বিরুদ্ধও হয়, প্রমাণ-আরদালীর তার প্রতিও সমান খাতির। তাই বুদ্ধের নির্ব্বাণতত্ত্বের পিছনেও প্রমাণ, শঙ্করের মায়াবাদের পিছনেও প্রমাণ, আবার চৈতন্যের ভক্তিবাদের পিছনেও প্রমাণ। এই প্রমাণের যখন এমনি জোর তখন আমরা বিপিন বাবুরই দেওয়া প্রমাণ দিয়ে তাঁর বিরুদ্ধ মতটাও যে কি করে' সমর্থন করা যায় তার একটা উদাহরণ এখানে দিচ্ছি।

বিপিন বাবু লিখছেন—সে লেখার ক্রিয়াপদগুলোর রূপান্তর ঘটিয়ে ও জায়গায় জায়গায় দু একটী শব্দ বসিয়ে হুবহু তুলে দিচ্ছি—বিপিন বাবু লিখছেন যে—

চৈতন্যদেব স্পষ্টভাবে ভগবান ভাষ্যকারের বিবর্ত্তবাদ খণ্ডন করে' পরিণামবাদ স্থাপন করেন। এই পরিণামবাদে জগৎ ও জীবকে পরিণামী নিত্য বলে'

প্রতিষ্ঠা করা হ'ল। অথচ মহাপ্রভুর প্রবর্ত্তিত গৌড়ীয় বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ও সংসার-জীবনে এই মারাত্মক মায়ার হাত থেকে এড়িয়ে যেতে পারলেন না। লোকে বৈষ্ণব-মন্ত্রে দীক্ষা নিলে, বৈষ্ণবগুরু করল, বৈষ্ণব-শাস্ত্র পড়ল; কিন্তু এই জগৎকে ও জগতের বিবিধ সম্বন্ধকে সত্যবোধে ধর্ম্মের প্রেরণায়, মুক্তি কামনায়, পরমার্থ দৃষ্টিতে দেখে আঁকড়িয়ে ধরতে পারল না। এরা ভগবান মান্‌ল; ভগবতীলীলার কথা কইতে লাগল; ক্ষণজন্মা সাধু মহাজনেরা ভগবতী-তনু লাভ করে' ইহজীবনে ও ইহলোকেই সেই নিত্য ভগবতীলীলার অনুসরণ করতে পারেন এও বিশ্বাস করল; কিন্তু তবু এই সংসারের প্রত্যক্ষ সেবার, প্রেমের রসের সম্বন্ধের মধ্যেই যে দেশকালের রঙ্গমঞ্চে ভগবানের নিত্যলীলার নিত্য অভিনয় হচ্ছে * * * * এ সব কথা ধর্‌তে ও বুঝতে পারল না।"

তারা আবার ঘুরে ফিরে "মায়াবাদী বৈদান্তিক যে ভাবে এই সংসারকে মায়িক বা অলীক বলে' উপেক্ষা করে' আসছিলেন" ঠিক তেমনি করতে লাগল।

এই কি একটা মস্ত প্রমাণ নয় যে সত্য কাউকে হজম করিয়ে দেওয়ার শক্তি মহাপুরুষেরও নেই, যদি না তার সে সত্যকে হজম করবার শক্তি থাকে? যে সত্য মানুষের অন্তরে সত্য হ'য়ে না উঠেছে সে সত্য তার বাহিরে ব্যর্থ হবেই? কিন্তু বিপিন বাবু বল্‌ছেন যে রাষ্ট্রীয়-জীবনে তখন আত্মপ্রতিষ্ঠার পথ একরূপ বন্ধ হয়ে গিয়েছিল বলেই অন্তরের ঐ সত্য বাহিরে আপনাকে সার্থক করে' তুল্‌তে পারে নি। সত্যের এক নূতন মূর্ত্তি বটে! যে সত্য শত সহস্র বাধা বিঘ্ন ভেঙে শত সহস্র বিপদ আপদের মাঝ দিয়ে আপনাকে প্রতিষ্ঠা করতে না পারে সে সত্য কেমন সত্য? যে সত্য কাজীর ভয়েই মূর্চ্ছা যায় সে সত্য কেমন সত্য? সত্যকে কি আমরা

এই রকম বলেই জানি! মানুষের রক্ত মাংস ত্বকের চাইতে—মানুষের জীবনের চাইতে যে মানুষের সত্য বড়—এটা ত জগতের শত সহস্র সত্যসন্ধ লোকের জীবনে কত শতবার প্রমাণ হয়ে গিয়েছে। অথচ বিপিন বাবু বল্‌ছেন যে বৈষ্ণবদের ভিতরের সত্য বাহিরের চাপে আর ফোটারই সুযোগ পেলে না। আসল কথাটা কি এই নয় যে—বৈষ্ণবদের অন্তরে চৈতন্যদেবের শিক্ষা সত্য হয়ে উঠলে বাহিরের চাপে সেটা আরও দীপ্ত হয়ে উঠ্‌ত সুপ্ত হয়ে পড়্‌ত না কিছুতেই। সত্য কথা এই যে চৈতন্যদেব গৌড়ীয় বৈষ্ণব-সম্প্রদায়কে পরিণাম-বাদের যে শিক্ষাই দিন না কেন তা তাঁদের অন্তরে সত্য হয়ে ওঠে নি—সে শিক্ষার মন্ত্র মুখে আওড়ালেও অন্তরে তাঁরা সেই শঙ্করের মায়াবাদেরই জের টেনে চলেছিলেন। কাজীর চাপ একটা excuse মাত্র—এই excuse-কে নিমিত্ত, করে' যেটা ছিল তাঁদের পক্ষে আসল সত্য, মায়াবাদ, সেইটেই তাঁদের জীবনটাকে নিয়ন্ত্রিত করেছিল। এই excuse-এর উদাহরণ ইতিহাসে ভুরি ভুরি মেলে। যেমন সেরাজেভোর হত্যাকাণ্ড বর্ত্তমান ইয়োরোপীয় সমরের একটা excuse।

বিপিন বাবু রাষ্ট্রীয়-জীবনে আত্মপ্রতিষ্ঠার পথের কথা তুলেছেন—কিন্তু ভিতরের পথ সত্য হয়ে না উঠলে যে বাহিরের পথ অপথই থেকে যায় তার উদাহরণ আছে সিরাজদ্দৌলার ইতিহাসে। রাষ্ট্রীয়-জীবনে ত তখন আত্মপ্রতিষ্ঠার পথ দিব্যি পরিষ্কার হয়েছিল—কিন্তু হিন্দুরা সে পথ ধরে' চল্‌ল না কেন? কারণ হিন্দুদের অন্তরে আত্মপ্রতিষ্ঠা সত্য হয় নি বলে'। কিন্তু বিপিন বাবুর সিদ্ধান্ত অনুসারে অবশ্য ইংরাজই সব মাটী করেছে—ইংরাজ না থাকলে

নিশ্চয়ই হিন্দুরা আপনার অধিকার পেয়ে যেত। এ হচ্ছে সেই ছেলের মত কথা যে বাপকে এসে বলেছিল—"বাবা আমি পরীক্ষায় সেকেণ্ড হয়েছি।" ছেলের তীক্ষ্ণ বুদ্ধিসম্বন্ধে পিতার চির-দিনই একটু সন্দেহ ছিল তাই জিজ্ঞেস কর্‌লেন—"ক্লাসে ছেলে ক'জন রে?" ছেলে প্রসন্নমুখে উত্তর দিল—"দু'জন।" কিন্তু সত্যকথা এই নয় কি যে ইংরাজ না থাকলে বাংলার মসনদ অধিকার করে বসত ফরাসীরা,—ফরাসীরা না হলে পর্ত্তুগীজরা, পর্ত্তুগীজ না হলে, দিনেমার ওলন্দাজ আলেমান, যে হোক্ আর কেউ, বস্‌ত না কিছুতেই যারা, সে হচ্ছে উমিচাঁদ, রাজবল্লভ কিম্বা কৃষ্ণচন্দ্র।

বিপিন বাবু বল্‌ছেন যে ফরাসী-বিপ্লবের পর যখন রাষ্ট্রে গনতন্ত্রতার প্রভাব বৃদ্ধি হল তখন থেকে ইয়োরোপে জীবনের সকল ক্ষেত্রে মানুষ মানুষ হ'য়ে ওঠ্‌বার চেষ্টা কর্‌তে আরম্ভ করেছে। একেই ইংরেজিতে বলে—Putting the cart before the horse, আসল কথা হচ্ছে যে মানুষ কতকটা অন্তরে মানুষ হ'য়ে উঠেছিল বলেই, মানব-সভ্যতার নবযুগ ইয়োরোপের মনে আগে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল বলেই, পরে তা ইয়োরোপের জীবনে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। "Liberté, egalité, fraternité" সাম্য মৈত্রী-স্বাধীনতার মন্ত্র ফরাসীজাতির অন্তরে সত্য হ'য়ে উঠেছিল বলে'—এ মন্ত্রের বলে' এ সত্যের পরিপন্থী অভিজাতবর্গ ও পুরোহিতসম্প্রদায় ভেসে গেল। এই হ'চ্ছে ও-ব্যাপারের আসল psychology—অন্ততঃ আমার ত সেইরকমই মনে হয়। কারণ আমি সর্ব্বান্তঃকরণে বিশ্বাস করি যে আত্মাটাই মানুষের দেহটাকে গড়ে তুলেছে। আর আজ এই Capital ও Labour-এর মারামারির দিনে এই সত্যটা মনে রাখা ভাল। বিশেষতঃ যখন বীজ আগে না বৃক্ষ আগে—

ডিম আগে না মুরগী আগে—গৌড়ীয় ভাষায় "পাত্রাধার তৈল কিম্বা তৈলধার পাত্র" এ তর্কের শেষ এ জগতে কোন দিন হবার আশা নেই।

(৩)

প্রকৃত ঘটনা এই যে, বুদ্ধিমানের কর্ম্মে আর শক্তিমানের ধর্ম্মে একটা আকাশ পাতাল প্রভেদ আছে। এদের দুজনের চলার ভঙ্গীই আলাদা। বুদ্ধিমান চলে পিঠ বেঁকিয়ে—আর শক্তিমান চলে বুক ফুলিয়ে। তার কারণ হচ্ছে এই যে এই দুজন এ জগতটাকে দেখে দুরকম। দুজন ত একই জগতে বাস কর্‌ছে। তারপর যদি কেউ বুদ্ধিমান আর শক্তিমানের চোখ পরীক্ষা করে' দেখেন তবে দেখ্‌তে পাবেন যে তাদের দু'জনের চোখ এক রকম উপাদান দিয়েই তৈরী। এ সত্ত্বেও দু'জন একই জিনিসকে দু'রকম দেখে কেন? কারণ তাদের দু'জনের মন দু'রকম। অর্থাৎ তাদের ভিতরটা এক নয় বলে'। আর বাহিরটা ভিতরটারই প্রতিবিম্ব—অর্থাৎ Reflection.

বুদ্ধিমান মনে করে যে সে যে বেঁচে আছে সেটা কেবল তার বুদ্ধির জোরে, নইলে আকাশের মঘা থেকে আরম্ভ করে' দেয়ালের টিক্‌টিকীটা পর্য্যন্ত ত তাকে মারবার ফন্দিতেই ফিরছে! তাই তার সারা জীবনটা মরণটাকে ফাঁকি দেবার ফিকির কর্‌তেই কেটে যায়। আর শক্তিমান মনে করে যে একবার যখন সে জন্মেছে তখন বেঁচে থাকাটা তার হক্ Birth-right, আর বলে যে—যদ্দিন বেঁচে আছি তদ্দিন পৃথিবীটাকে কসে' বুঝিয়ে দেব যে বেঁচে আছি। শক্তিমান বলে—মঘা টিক্‌টিকী আমাকে মার্‌তে পারে কিন্তু আমাকে ছোট কর্‌তে পারে না। তাই

শক্তিমান সহস্রবার মর্‌তে রাজি কিন্তু একটী বারও ছোট হ’তে রাজি নয়।

তাই বুদ্ধিমানের নৌকা যখন ডুব্‌ল তখন সে প্রচুর গবেষনা করে বের কর্‌লে যে মঘা-নক্ষত্রে নৌকো ছাড়া হয়েছিল বলেই তার নৌকো ডুব্‌ল। তারপর থেকে সে নৌকো ছাড়্‌তে লাগ্‌ল মঘাকে পেরিয়ে। শক্তিমান বল্‌লে যে—মঘা যদি আমার নৌকো ডুবিয়ে থাকে তবে এমন নৌকো তৈরী কর্‌ব যে অন্ততঃ চার শ’ মঘার দরকার হবে সে নৌকাকে ডোবাতে। তাই বুদ্ধিমানের নৌকো আজও পাল তুলেই আর গুণ টেনেই চলছে—কিন্তু শক্তিমানের নৌকো আজ যা দাঁড়িয়েছে তার সঙ্গে তার পিতৃপিতামহের নৌকোর প্রকারগত সাদৃশ্য থাক্‌লেও আকারগত সাদৃশ্যও নেই আচারগত সাদৃশ্যও নেই।

যখন প্রথম এরোপ্লেন নিয়ে experiment আরম্ভ হয় তখন ফ্রান্সে যে সেই ব্যাপারে কত লোক মরেছে তার ঠিক নেই। কেউ বা দু’শ হাত কেউ বা চার শ’ হাত—কেউ বা হাজার ফিট দু’হাজর ফিট চার হাজার ফিট ওঠে—তারপর এঞ্জিন খারাপ হয়ে যায়—সঙ্গে সঙ্গে এরোপ্লেন সমেত মানুষ ধরাশায়ী—তারপর মৃত্যু—বিশ্রী রকমের সে মৃত্যু। ফ্রান্স যদি অতিরিক্ত পরিমাণে বুদ্ধিমানের দেশ হ’ত তবে ঐ রকমের দু’এক জনের মৃত্যুর পর নিশ্চয় এরোপ্লেনকে নিজের পাততাড়ি গুটিয়ে অন্যত্র যাবার চেষ্টা দেখ্‌তে হত। সঙ্গে সঙ্গে এমন শ্লোকও রচনা হ’য়ে যেত, যাতে স্পষ্ট করে’ লেখা থাক্‌ত যে আকাশে ওঠাটা আধ্যাত্মিক জীবন লাভের পরিপন্থী—এবং সঙ্গে সঙ্গে তার এমন ভাষ্য-কারেরও আমদানী হ’ত, যিনি স্পষ্টতর করে’ বলে দিতেন যে ঐ শ্লোকের অর্থই হচ্ছে এই যে যে-কেউ আকাশে উঠ্‌বে তার ঊর্দ্ধতন

সাড়ে সাতাত্তর পুরুষের গতি হবে রৌরবে—আর বুদ্ধিমান স্পষ্টতম করে' দেখ্‌তে পেত যে তাদের মতো বুদ্ধিমান আর দুনিয়ায় দুটী নেই। কেবল তাই নয়। কেউ কেউ আবার যৌগিক বলে সূক্ষ্মদৃষ্টি লাভ করে' এ পর্য্যন্ত দেখ্‌তে পেত যে আকাশে একটা প্রকাণ্ড দৈত্য বসে' রয়েছে, যে-কেউ আকাশে উঠ্‌বে তার ঘাড় মট্‌কাবার জন্যে। আর তারপর যদি ঐ উপরি-উক্ত শ্লোকটী অনুষ্টুপ ছন্দে রচিত হয়—তবে ত পোয়াবার। বুদ্ধিমান তখন পুত্র-পৌত্রাদিক্রমে দিব্যি আরামে ঐ শ্লোক আওড়িয়ে সেই বিরাট দৈত্যকে একটা ভরাট নৈবেদ্য দিয়ে পূজা কর্‌তে লেগে যেত। আর সঙ্গে সঙ্গে ভাব্‌ত যে এ পৃথিবীতে সূক্ষ্মদৃষ্টিটা তাদের কপালেই খালি মিলেছে।

কিন্তু ফ্রান্স শক্তিমানের দেশ। তারা দু'দশ জনের মরণটাকে কেয়ারই কর্‌লে না। ক্রমে ক্রমে দেখা গেল যে যত দিন যেতে লাগ্‌ল সেই দৈত্যটার মানুষের ঘাড় মটকাবার ক্ষমতাটা তত কমে আস্‌তে লাগ্‌ল। অবশেষে যখন শ'চার পাঁচেক মানুষের জীবন দিয়ে এরো-প্লেন্‌টার পূর্ণ প্রাণ প্রতিষ্ঠা হয়ে গেল তখন দৈত্যটাও একেবারে অদৃশ্য হ'য়ে গেল। চার শ' ফরাসী মরে' চার কোটী ফরাসীকে বাঁচিয়ে গেল। মানুষ মর্‌ল বটে কিন্তু মনুষ্যত্ব বেঁচে গেল।

এখন বুদ্ধিমানের হাজার সূক্ষ্মদৃষ্টি সত্ত্বেও যে জিনিসটা সে কিছুতেই বুঝে উঠ্‌তে পারে না সেটা হচ্ছে এই যে, ঐ যে চার পাঁচ শ' লোক মর্‌ল ওরা ও-রকম গোঁয়ার্ত্তুমি করে' মর্‌তে গেল কেন? তাতে তাদের কি লাভ? উত্তরমেরু আবিষ্কার নাই বা হ'ল?—তার আসল কেন্দ্রটা জ্যামিতিক ম্যাপের হিসেবে ঠিক নাই বা জান্‌লেম—তাতে ক্ষতিটা কি? এ কি রকম মানুষের আজগুবি সখ! এই যে বুদ্ধিমান

শক্তিমানকে বুঝ্‌তে পারে না তার কারণ হচ্ছে যে তাদের দু'জনের অন্তর এক নয়। শক্তিমান নিজের অন্তরে যে প্রাণের স্পন্দন অদম্য বেগে পাচ্ছে, বুদ্ধিমান তা পাচ্ছে না। অন্তরের এই পার্থক্যের জন্যই তাদের বাহিরেও কর্ম্মের এই পার্থক্য দাঁড়িয়ে যায়। কারণ মানুষের বাহিরের কর্ম্ম তার অন্তরের ধর্ম্মেরই অনুবাদ—অর্থাৎ translation.

বুদ্ধিমান ও শক্তিমানের অন্তরে এই যে পার্থক্য—এ পার্থক্যের আসল নিগূঢ়তম কারণটা কি? এ সম্বন্ধে যা বুঝি সেটা বল্‌ছি।

(৪)

সৎ, চিৎ, আনন্দ—এটা হচ্ছে মানুষের কথা। ভগবান যদি দর্শন লিখ্‌তে বসে' যেতেন তবে তিনি ঐ ফরমূলাকে উল্‌টে দিয়ে লিখ্‌তেন—আনন্দ, চিৎ, সৎ। কারণ গোড়ার কথা আনন্দ—তারপর শক্তি—তারপর সৃষ্টি। আনন্দ থেকে প্রকাশ হয়েছে শক্তি—শক্তি থেকে উদ্ভূত হয়েছে সৃষ্টি। এই হচ্ছে সৃজনলীলার মূলতত্ত্ব। আর মানুষের জীবনেও এই তত্ত্বই কার্য্যকারী হ'য়ে রয়েছে। শক্তিমান ও বুদ্ধিমানের নিগূঢ়তম প্রভেদটা হচ্ছে ঐ আনন্দ নিয়ে। শক্তিমানের অন্তরে আনন্দ আছে—বুদ্ধিমানের তা নেই। অন্তরে ঐ আনন্দ আছে বলে' শক্তিমান তার বেঁচে থাকার মধ্যে অমৃত পায়। বুদ্ধি-মানের ঐ আনন্দ নেই বলে' সে তার বেঁচে থাকার মধ্যে খুঁজে বেড়ায় আরাম। এই যে জীবনের আনন্দ—বেঁচে থাকার আনন্দ—এই আনন্দের রীতিই হচ্ছে গতিতে—বিষয় থেকে বিষয়ান্তরে—রূপ থেকে রূপান্তরে—রস থেকে রসান্তরে—এক কথায় এই আনন্দের

ধর্ম্ম হচ্ছে Multiplication—Subtraction নয়। সেই জন্যে এই আনন্দ প্রাণে প্রাণে অন্তরে অন্তরে অনুভব করে' শক্তিমানের যে মানসিক ভাব দাঁড়ায় সেটা বাংলায় তর্জ্জমা করলে কতকটা দাঁড়ায় এই রকম—

সব কাজে হাত লাগাই মোরা সব কাজেই।
বাঁধা বাঁধন নেই গো নেই।
দেখি, খুঁজি, বুঝি,
কেবল ভাঙি, গড়ি, যুঝি,
মোরা সব দেশেতেই বেড়াই ঘুরে সব সাজেই।
পারি, নাই বা পারি,
না হয় জিতি কিম্বা হারি,
যদি অমনিতে হাল ছাড়ি মরি সেই লাজেই।
আপন হাতের জোরে
আমরা তুলি সৃজন করে,
আমরা প্রাণ দিয়ে ঘর বাঁধি, থাকি তার মাঝেই।

এই যে, দেখা, খোঁজা—তাতে শক্তিমান যাই পাক্, এই যে ভাঙা গড়া তাতে শক্তিমান যাই গড়ে' তুলুক—তাইই তাকে সার্থকতা মিলিয়ে দেয়—কারণ জিনিসের সার্থকতা ত জিনিসের মধ্যে নেই আছে তা মানুষের অন্তরে। বেঁচে থাকার এই আনন্দের জন্যই শক্তিমান উত্তর-মেরু আবিষ্কার করতে ছোটে—এমন কি নিশ্চিত মরণও তাকে ঠেকিয়ে রাখ্‌তে পারে না। কারণ আনন্দ যেখানে আছে মরণও সেখানে অমৃতময় হ'য়ে ওঠে। ঠিক এই কারণেই ইয়োরোপ অদম্য ভোগের স্রোতে আপনাকে ভাসিয়ে দিয়েও মরতে ভয় পায় না—কিন্তু আমরা

জীবনটা নশ্বর নশ্বর করে' কাটিয়েও টিক্‌টিকিটীকে পর্য্যন্ত সমিহ করে' চলি। অন্তরে এই আনন্দ আছে বলে' শক্তিমান এরোপ্লেন নিয়ে আকাশে ওঠে। তা সে মরুকই আর বাঁচুকই। এই যে সে এরো-প্লেনে ওঠে সেটা সে কর্ত্তব্য বোধে করে না—তার জাতীয় জীবনের পক্ষে শ্রেয় বলে' করে না। ও-সব হচ্ছে পাটোয়ারী বুদ্ধির লাভ ক্ষতির হিসেব। লাভ ক্ষতি একটা accident মাত্র। আসল কথা হচ্ছে তার অন্তরের ঐ আনন্দ। কর্ত্তব্য-বোধে শ্রেয় জ্ঞানে মানুষ যা করে তা সে দু'দিন করতে পারে, কিন্তু চিরকাল পারে না। কারণ যেখানে শুধু কর্ত্তব্য সেখানে কেবল দাসত্ব। যতদিন না শ্রেয়টা মানুষের জীবনে প্রেয় হ'য়ে উঠেছে, যতদিন না মানুষের কর্ত্তব্য তার অন্তরের আনন্দ নিয়ে অমৃতময় হয়ে উঠেছে—ততদিন মানুষের জীবন ব্যর্থ ই হবে—তার ভিতরেও বাহিরেও। এই জন্যই বুদ্ধিমান শক্তি-মানের উত্তরমেরু আবিষ্কার বুঝ্‌তে পারে না। তার "গোঁয়ার্ত্তুমি" "আজ্‌গুবি" সখের" মানে অভিধান খুলেও পায় না—পঞ্জিকা খুঁজেও পায় না।

এই যে আনন্দ—এটা মানুষের অতি সহজলভ্য। তেমনি সহজ-লভ্য যেমন সহজলভ্য তার নিশ্বাস নেবার বাতাস। ভগবানের সঙ্গে মানুষের সর্ত্তই হচ্ছে এই যে, সে ভগবানের জগত-লীলায় সঙ্গী হয়ে থাক্‌বে যদি ভগবান তার অন্তরের জীবন-দেবতাকে আনন্দময় করে' রাখে। মানুষ যখন তার এই অন্তরের আনন্দ থেকে বঞ্চিত হয় তখন ভগবানকে সে নোটিশ দেয়—বলে—ভগবান চল্লেম আমি তোমার এই জগৎ থেকে। তখন সে মায়াবাদ প্রচার করতে লেগে যায়—নির্ব্বাণ মুক্তির পথ খুঁজে বেড়ায়। কেউ কেউ আবার কতগুলো

অস্বাভাবিক প্রক্রিয়াদ্বারা এই আনন্দকে ধর্‌তে চায়। এই অস্বাভাবিক প্রক্রিয়াগুলোরই আমরা নাম দিয়েছি—হঠযোগ, রাজযোগ ইত্যাদি। কিন্তু কথা হচ্ছে স্বাভাবিক স্বাস্থ্যের জোরে ফুর্ত্তি করে' বেড়ান এক কথা আর বোতল বোতল "এসেন্স অফ নিম" খেয়ে স্বাস্থ্য রক্ষা আর এককথা।

এই হচ্ছে বুদ্ধিমান ও শক্তিমানের অন্তরের পার্থক্যের নিগূঢ়তম কারণ। শক্তিমানের জীবনে বেঁচে থাকার যে স্বাভাবিক সহজলভ্য আনন্দ তা আছে—বুদ্ধিমানের তার অভাব। ঐ আনন্দ থেকে বঞ্চিত হ'য়ে বুদ্ধিমান বুদ্ধিমান হয়েছে—আর ঐ আনন্দকে বুকে করে' শক্তিমান শক্তিমান। বলা বাহুল্য আমরা এই বুদ্ধিমানের দলের লোক—আর বর্ত্তমান ইয়োরোপ শক্তিমান লোকের দেশ।

(৫)

এখন আমাদের এই গোড়া থেকে আরম্ভ কর্‌তে হবে, আগা থেকে নয়। কারণ কেউ কোনকালে ছাদ থেকে আরম্ভ করে' কোন ইমারত খাড়া করে' তুলেছে এ-খবর কোন দেশের বা কোন জাতির ইতিহাসেই আমরা পাই নি। যতদিন না আমাদের জীবন-দেবতার মন্দিরে বেঁচে থাকার আনন্দ প্রতিষ্ঠা হয়ে উঠবে ততদিন আমরা আমাদের বাহিরের কিছুকেই সত্য করে' পাব না—আর যেটাকে সত্য করে' পাব না সেটা আমাদের বোঝা হয়েই উঠ্‌বে। আর আমরা যে যে-কোন বোঝাকে মন্ত্র পড়ে' শূন্য দিয়ে গুণ করে' নির্ব্বাণ পাইয়ে দিতে পারি তার প্রমাণ আমাদের জাতীয় জীবনের "অপ্রাচীন দার্শনিক যুগে"র দর্শনের পৃষ্ঠায় স্পষ্ট করে' লেখা আছে।

তাই প্রথমে আমাদের মানুষকে গড়ে' তুল্‌তে হবে। মানুষের মন

তৈরী করতে হবে—রাজনীতিকে নয়। কারণ মানুষই রাজনীতি গড়ে' তোলে—রাজনীতি মানুষ তৈরী করে না। নইলে ঘটনাক্রমে যদি বা আমরা স্বায়ত্ব-শাসন পেয়েই যাই তবে আমরা সেই গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের মতোই করব। হয়ত আমরা দু'দিন বাদে আমাদের ব্যবস্থাপক-সভার মজলিসে খোল করতাল নিয়ে হরিসংকীর্ত্তনের আখড়া খুলে বসব।

অবশ্য বিপিন বাবু আশ্বাস দিয়েছিলেন যে হিন্দুর যখন নৌবাহিনী গড়ে' উঠবে তখন আর সমুদ্রযাত্রা নিষিদ্ধ হয়ে থাকবে না। যেন সমুদ্রযাত্রাটা কেবল জলযুদ্ধ করবার জন্যেই দরকার—যেন এর আর কোন প্রয়োজন নেই। উপরন্তু যেটা নিষ্প্রয়োজনে করবার হুকুম নেই—মানুষ চিরজীবন ভরে' যেটা এড়িয়ে চলেছে—সেটা যে একদিন সে প্রয়োজনের তাগিদে এক লাফে করে' ফেলবে—তা খালি রূপ-কথার দেশেই সম্ভব—রক্তমাংসের দেশেও সম্ভব নয়—জ্ঞান-বিজ্ঞানের দেশেও সম্ভব নয়। কিন্তু যা হোক্ এখনও বাংলার সুদূর পল্লীতে পল্লীতে এমন অনেক গোঁড়া হিন্দু আছেন যাঁদের অন্তর বিপিন বাবুর ঐ আশ্বাস-বাণী শুনে চম্‌কে উঠবে। তাঁদের সান্ত্বনার জন্যে বল্‌ছি যে তাঁরা নিশ্চিন্ত থাকুন। যতদিন সমুদ্রযাত্রার নাম শুনে তাঁদের অন্তর এমনি চম্‌কে উঠবে ততদিন হিন্দুর নৌবাহিনী গড়ে' ওঠবার কোন সম্ভাবনারও সম্ভাবনা নেই। আর যদি বা জন কয়েক স্বধর্ম্মদ্রোহী স্বেচ্ছাচারী কাণ্ডজ্ঞানহীনের বিশ্বাসঘাতকতায় কোন নৌ-বাহিনী সত্য-সত্যই গড়ে' ওঠে তবে সে জন কয়েকের ছাপ্পান্ন পুরুষের সাধ্য হবে না যে তাঁদের মধ্যে কাউকে সেই নৌ-বাহিনীর 'এ্যাড্‌মিরালের পদে অভিষিক্ত করা।

শ্রীসুরেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী।

স্বর ও তাল।

——:*:——

"সঙ্গীতের মুক্তিতে" আনাড়ি-গায়কদলের রাস্তা যখন খুলে দেওয়া হল, তখন ভেবে দেখা উচিত ছিল যে অবশেষে তাল সামলে ওঠা দায় না হয়ে পড়ে। রাস্তা যখন খুলেছে, তখন আর তারা বাগ মানে না। ওস্তাদ-ভীতিটা এতদিন বুকের উপর ঠাণ্ডা পাথরের মত চেপে ছিল;—আনন্দের দু' একটা তপ্ত উচ্ছ্বাস বের হবামাত্র সে পাথরের সংস্পর্শে এসে condensed হয়ে ফিরে আসত। পাথর যখন অপসারিত হল, তখন উচ্ছ্বাসগুলি বাধামুক্ত; তপ্ত বলেই তাতে কোনো ভয় নেই, কেননা আধুনিক স্বাস্থ্যতত্ত্ব অনুসারে তপ্ত জিনিস disinfected।

ওস্তাদী গানকে তুচ্ছতাচ্ছিল্য করা এ প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নয়, কারণ কলা হিসাবে ওর সার্থকতা থাকুক বা না থাকুক,—কৌশল হিসাবে যে রয়েছে, তা স্পষ্টই স্বীকার করা হয়েছে। লেখকের ভাগ্যে যে দু' একজন বড় ওস্তাদ-দর্শন ঘটেছে, তা হতে, তাঁরা যে অসামান্য অত্যাশ্চর্য্য নিপুণতা দেখিয়েছেন, সে সম্বন্ধে নিঃসঙ্কোচে সাক্ষ্য দিতে পারি। "ওস্তাদ-দর্শন" বাক্যটি বাধ্য হয়েই লিখতে হল; তার কারণ, তাঁদের গানের চেয়ে অঙ্গচালনা তাঁদিগকে কম বিশিষ্টতা প্রদান করে না। উৎকটধ্বনি নির্গমনের নিষ্ফল চেষ্টায় হস্তের সঙ্গে কর্ণের ঘনিষ্ঠতার পরিচয় এঁরা বেশ উদগ্রভাবেই দিয়ে থাকেন; তা হতে এরূপ

অনুমান করা সম্ভবত নিতান্ত অসঙ্গত হবে না যে, কর্ণরন্ধ্র বন্ধ হবার অনুপাতে গীতিকৌশল স্ফূর্ত্তি লাভ করে। এতদ্ব্যতীত বৃদ্ধাঙ্গুলি ও তর্জ্জনীর মিলন, মুখ-গহ্বরের আকুঞ্চন, গ্রীবা সঞ্চালন প্রভৃতি—অর্থাৎ মুদ্রাদোষ—ওস্তাদের শাশ্বতরূপ বল্লেই হয়। কিন্তু ওস্তাদের কাছে আসল ভয়টা হচ্ছে তালকাটার ভয়। হাঁটুতে আর আকাশে চপেটাঘাত করে করে কাল কাটালেও, তালকাটা হতে অব্যাহতি লাভ ঘটে উঠতে চায় না।

সঙ্গীতসম্বন্ধে কিছু বলার পূর্ব্বে, তাল জিনিসটা কি, তা সংক্ষেপে একটু বুঝিয়ে বলা আবশ্যক। যাঁর সঙ্গীতের সঙ্গে কিছু পরিচয় আছে, তিনি জানেন যে কাওয়ালি তিন ঠেকা এক ফাঁকের তাল। আবার একতালাও তিন ঠেকা এক ফাঁকের তাল। এতৎ সত্ত্বেও যে দুটিকে দুটি বিভিন্ন নামে অভিহিত করা হয়, তার কারণ তাদের মাত্রা। কাওয়ালী ষোল মাত্রা এবং একতালা বারো মাত্রার তাল। দৃষ্টান্ত দিলে কথাটা পরিষ্কার হবে।

কাওয়ালী।

২ ৩ ০
জা নি | জা ০ নি ০ | কো ন্ আ দি | কা ০ ল হ |

১ ২ ৩ ০
| তে ০ ভা সা | লে ০ আ মা | রে ০ জ গ | তে ০ র স্রো | তে ০

ইত্যাদি।

একতালা।

১ ২ ৩ ০ ১
আ ॥ মার এ ই | যা ০ ত্রা | হ ল ০ | সু রু ০ | ০ এ খন |

ইত্যাদি।

দেখা যাচ্ছে যে কাওয়ালীতে প্রত্যেকটি টুকরা চার মাত্রা এবং একতালায় তিন মাত্রায় বিভক্ত।

অতঃপর লয়। তালের মারপ্যাঁচ "লয়" জিনিসটি নিয়ে। কোনো বিশেষ মাত্রা আপেক্ষিক ভাবে বিলম্বিত বা দ্রুত হবার উপর লয় নির্ভর করে।

বলা বাহুল্য তাল জিনিসটা সম্পূর্ণরূপে সুর-নিরপেক্ষ। যেমন তালে পা ফেলা চলে, এমন কি তালে কথা বলা, কান্নাও সম্ভবে। গ্রামোফোনে সাহেবের যে উৎকট হাসিটা প্রায়ই শোনা যায়, তাও তালেই হাসা হয়েছে।

তাল যে শুধু সুর-নিরপেক্ষ, তা নয়—ধ্বনি-নিরপেক্ষও বটে। গানের বৈঠকে সমজ্‌দারদিগকে চক্ষু মুদ্রিত করে গ্রীবা সঞ্চালন দ্বারা তাল দিতে প্রায়ই দেখা যায়। হস্তচালনা দ্বারাও তাল দেওয়া চলে। এক কথায় তালের জন্য গতি আবশ্যক। তাল ও সুরের সম্বন্ধ বিচার করাই আমার উদ্দেশ্য।

(২)

রাগিণী ও সুর—এ দুটি শব্দ সঙ্গীতে ভিন্ন অর্থে ব্যবহার করা উচিত। মানুষের মুখাবয়বের সঙ্গে মুখভাবের যে সম্বন্ধ, রাগিণী এবং সুরেতেও সেই সম্পর্ক। রাগিণীকে গানের আকৃতি এবং সুরকে তার প্রকৃতি বলা যেতে পারে। রাগিণীর সাহায্যে দশজনের ভিতরে গানের মুখ চিনে নিতে পারি, আর সুরের সাহায্যে বুঝতে পারি তার বেদনা--পুলক-বেদনা, ব্যথা-বেদনা, কিম্বা অন্য কোন বেদনা।

সেইজন্য সঙ্গীত-শাস্ত্রে রাগরাগিণীর ঠাট নির্দ্ধারণ করে দেওয়া সম্ভব হয়েছে; বর্জ্জনীয় অবর্জ্জনীয় পর্দ্দাগুলি এমনি কড়াক্কড়ভাবে স্থির করে দেওয়া হয়েছে যে, তার সীমা লঙ্ঘন করেছ কি গান 'মার্ডার' করেছ!

রাগিণী বেচারী বড়ই ভালমানুষ। সে যেন সঙ্গীত-রাজ্যের ভূগোল। সে জায়গার শুধু একটা নাম। অবশ্য প্রত্যেক জায়গার প্রত্যেক রাগিণীর একটা বিশেষ চেহারা আছে। কোনোটি পর্ব্বতে অরণ্যে বন্ধুর, কোনোটিতে শুধু একটানা রাস্তা; আবার কোনোটিতে প্রভাত তার স্বর্ণ-অর্ঘ্য নিয়ে প্রতিদিন এসে নিঃশব্দে দাঁড়ায়, কোনোটিতে বা সূর্য্যাস্তের বিচ্ছুরিত ম্লান স্বর্ণ আভা হৃদয়ের অন্তস্তলে অব্যক্ত বেদনা রেখে ধীরে ধীরে নিভে যায়।

দেশ ও কাল—এ দুয়ের মধ্যে আমাদের সঙ্গীত-শাস্ত্রকারেরা কালের সঙ্গে রাগরাগিণীর ঘনিষ্ঠতার কথা বারবার বলে গেছেন। বিহগের কাকলির সঙ্গে রামকেলী, মধ্যাহ্নে সারঙ্গ, সূর্য্যাস্তের সঙ্গে পূরবী, স্তব্ধরাত্রে বেহাগ। কিন্তু দেশের সঙ্গে গান যে একেবারে সম্পর্কশূন্য, এরূপ ত মনে হয় না। যেমন বাগেশ্রী;—গভীর অরণ্য-সমাকীর্ণ দিগন্তবিস্তৃত বন্ধুর পর্ব্বতশ্রেণী কিম্বা উচ্ছ্বসিত উদ্বেলিত দিগন্তব্যাপী সমুদ্রের কূলই বাগেশ্রীর প্রশস্ত ক্ষেত্র। বাগেশ্রীর উদাত্ত, অনুদাত্ত অভ্রভেদী স্বরিত যেন তরঙ্গিয়া চলিয়াছে—

> দুর্গম দুরূহ পথে কি জানি কি বাণীর সন্ধানে!
> দুঃসাধ্য উচ্ছ্বাস তার শেষপ্রান্তে উঠি আপনার,
> সহসা মুহূর্ত্তে যেন হারায়ে ফেলেছে কণ্ঠ তার।

আবার পূরবীর দেশে যখন 'নাম্‌ল ছায়া ধরণীতে', তখন ঘাটের বধূ বল্‌ছে—

জলধারার কলস্বরে সন্ধ্যা-গগন আকুল করে,
ওরে ডাকে আমায় পথের পরে সেই ধ্বনিতে।

* * * *

এখন বিজন পথে করে না কেউ আসা-যাওয়া,
ওরে প্রেমনদীতে উঠেছে ঢেউ, উতল হাওয়া।
জানিনা আর ফিরব কিনা, কার সাথে আজ হবে চিনা,
ঘাটে সেই অজানা বাজায় বীণা তরণীতে।

আর সজলমেঘভারাক্রান্ত আকাশের নীচে মল্লারের পুলক সেইখানে, যেখানে—

ব্যথিয়া উঠে নীপের বন পুলকভরা ফুলে,
উছলি উঠে কলরোদন নদীর কুলে কুলে।

কিন্তু আসল কথা হচ্ছে, দেশ ও কালের অতীত নয়,—কাল ও দেশের বাইরে নয়। শঙ্কা হচ্ছে কথায় কথায় category-র রাজ্যে গিয়ে পড়্‌ব। দর্শনশাস্ত্রে দেশ ও কাল—এই দুই category নিয়ে যে কিরূপ কুরুক্ষেত্র বেধে গেছে, তা দেখলে চক্ষু বিস্ফারিত হয়ে যায়। এ সম্বন্ধে গোটা গোটা কেতাব লেখা হয়ে গেছে! ইদানীং ফরাসী দার্শনিক Bergson, বর্ত্তমান, অতীত ও ভবিষ্যত-বোধের—অর্থাৎ সময়বোধের—কতকগুলি আশ্চর্য্য যুক্তিপুর্ণ কারণ দেখিয়ে সকলকে কিছু ঠাণ্ডা করেছেন। যাক্ ওসকল অবান্তর কথা। আমরা সাদা চক্ষু মেলে দেশ ও কালের দিকে তাকালে দেখতে পাই যে, দেশ ও কাল. পরস্পর পরস্পরকে আশ্রয় করেই রয়েছে। দেশের অস্তিত্বই

কালের লীলা সম্ভব করছে, এবং দেশের বৈচিত্র্যও কালেই সংঘটিত হচ্ছে। অতএব নীপের বনে যে মল্লারের পুলক, সেটা বর্ষাকাল বলেই হচ্ছে,—তা না হলে পুলকভরা ফুল ফুটত না। বস্তুতঃ, দেশই বল, কালই বল,—উভয়ের অস্তিত্বই সেই লোকে, যাকে নীতিশাস্ত্রে বলা হয়েছে "Universe of thought"; কেননা এই দৃশ্যমান জগতের উপর যে সঙ্গীত নির্ভর করে না, তা অন্ধের সঙ্গীতপটুতা হতেই বুঝা যায়। তার মানসলোকেও ভোরের তারা ফোটে, প্রভাতের অরুণোদয় হয়, সূর্য্যাস্তের ঘনঘটা সংঘটিত হয়।

অতএব চিত্তটা যদি অস্তরবির ছটার মোহে যথার্থই আচ্ছন্ন হয়ে থাকে, তবে ভোরে উঠে পূরবীর করুণ তান ধরলে দায়রা-সোপর্দ্দ করবার আবশ্যকতা নেই; কিম্বা উদীয়মান সূর্য্যের লোহিতরঙে যদি হৃদয়টা সত্যই রাঙা থাকে, তাহলে সন্ধ্যাবেলা ললিত ধরলে সৃষ্টি উল্‌টে যাবে না। কিন্তু ললিত ধরতে গিয়ে যদি অস্তাচলগামী সূর্য্যকে লক্ষ্য করে গাওয়া যায়—"অয়ি সুখময়ী উষে! কে তোমারে নিরমিল, বালার্ক সিন্দুর-ফোঁটা কে তোমার ভালে দিল,"—তবে অবশ্যই সৃষ্টিকে উল্‌টে ফেলা হবে।

(৩)

বস্তুর সঙ্গে আকাশের যে সম্বন্ধ, কথার সঙ্গে তার ব্যঞ্জনারও সেই সম্বন্ধ। বৃক্ষের চতুষ্পার্শ্বের আকাশ এবং পত্র ও শাখার মধ্যে বিক্ষিপ্ত খণ্ড-আকাশই বৃক্ষকে গঠন প্রদান করে;—এমন কি পত্রের বর্ণ, হিল্লোল, মর্ম্মরকলতান,—সমস্তই আকাশ হতে প্রাপ্ত। তেমনি

সঙ্গীতের সার্থকতা তার ব্যঞ্জনার আকাশে। সেখানে সে পরিব্যাপ্ত হয়ে মুহূর্ত্তকে অনন্তে ছড়িয়ে দেয়; মানুষকে অতি-মানুষে, ঘরকে বাইরে এবং বিশ্বকে বিশ্বাতীতে নিয়ে চলে। কথার ফাঁকে ফাঁকে সঙ্গীত মূর্ত্ত, পুলকিত হতে থাকে। সুরের মোচড়ে সৃষ্টির মর্ম্মস্থান নিগূঢ় ব্যথায় ব্যথিত হয়ে ওঠে, এবং সে বেদনা দূরে—আরো দূরে গিয়ে মিশে যায়।

সুতরাং সুরের বৈঠকে যখন সুরাসুরের সংগ্রাম বেধে যায়, তখন সঙ্গীত খুব জমে বটে, কিন্তু এতই নিরেট হয়ে জমে যে, তার ভিতর পল্লবের স্নিগ্ধ হিল্লোলটুকুর জন্যও একটু ফাঁকার সংস্থান হয় না,—কলা একেবারে কসরৎ হয়ে পড়ে।

সঙ্গীত-শাস্ত্র দূরের কথা, নাট্য-শাস্ত্রতেও যে কথার চেয়ে ইঙ্গিতের আবশ্যকতা ঢের বেশী—এটা ক্রমশঃ বর্ত্তমান যুগে স্বীকৃত হচ্ছে। সাহিত্যেও violence দিন দিন কমে আসছে। আত্মহত্যা, গুমখুন, এক লম্ফে প্রাকার ও পরিখা লঙ্ঘন প্রভৃতি উৎকট ব্যাপার সাহিত্য-ক্ষেত্র হতে একপ্রকার নির্ব্বাসিত হয়েছে। রঙ্গমঞ্চে লম্ফঝম্ফ দিয়ে বীরত্বের সে আস্ফালন আর নেই; ধূলায় বিলুণ্ঠিত হয়ে আর্ত্তনাদের সাহায্যে দুঃখপ্রকাশের প্রথা ঘুচে গেছে; আহ্লাদ জানাতে গিয়ে মুখ-গহ্বর আকর্ণ বিস্ফারিত করবার পদ্ধতি পরিত্যক্ত হয়েছে। দেহ-সঞ্চালনের চেয়ে কথার, কথার চেয়ে চাহনির, চাহনির চেয়ে আত্মার নিগূঢ় স্পন্দনের আভাস যে অনেক বেশী, সে বোধের পরিচয় বিশেষ করে বর্ত্তমান যুগেরই আর্টে পাওয়া যাচ্ছে। আধুনিক চিত্রকলাতেও গড়নের চেয়ে দেহভঙ্গির ব্যাকুলতার প্রতি বেশী মনোনিবেশ করা হচ্ছে; expression-এর কাছে anatomy পরাজয় স্বীকার করতে

বাধ্য হয়েছে। স্থিতির ভিতর গতি আশ্রয়-লাভ করে স্বীয় সুষমায় সুসম্বদ্ধ হচ্ছে।—এক কথায় আর্ট ক্রমেই static হচ্ছে।

বস্তুতঃ এ ক্ষেত্রে স্থিতি মানে গতির অভাব নয়,—গতির চরিতার্থতা। বৃত্তের ভিতর অঙ্কিত অসংখ্যভুজ ক্ষেত্র যেমন বৃত্তের পরিধির সঙ্গে মিশে যায়, তেমনি স্থিতির মধ্যে গতি লয়প্রাপ্ত হয়। এটা নির্ব্বাণ নয়,—পরিণতি।

সুতরাং যখন বেহাগে গাওয়া যায়—

জাগে নাথ জ্যোৎস্না রাতে
জাগরে অন্তরে জাগো।
তাঁহারি পানে চাহ মুগ্ধপ্রাণে
নিমেষহারা আঁখিপাতে।
নীরব চন্দ্রমা, নীরব তারা,
নীরব গীতরসে হল হারা।
জাগে বসুন্ধরা, অম্বর জাগেরে,
জাগেরে সুন্দর সাথে—

তখন ক্ষুদ্র বাক্যগুলির ব্যবধান বিলম্বিত হয়ে হয়ে বিশ্বের কোলাহলের উপর এমনি নিবিড় করে পর্দ্দার পর পর্দ্দা টেনে যেতে থাকে যে, সমগ্র সৃষ্টি একটা অখণ্ড নীরবতায় তর্জ্জমা হয়ে যায়, এবং এই ঘোর নিস্তব্ধতার ভিতর বিশ্ববিধাতার জাগ্রত সত্ত্বায় যেন নিখিল জগত ওতপ্রোত হয়ে পড়ে। বাক্যের ব্যবধানের মধ্যে সঙ্গীত লীলায়িত, তরঙ্গিত, স্পন্দিত হতে থাকে।

ওস্তাদেরা প্রত্যেক রাগিণীতে এমন একটা পর্দ্দা আবিষ্কার করেছেন, যাকে তাঁরা ঐ রাগিণীর "জান" (অর্থাৎ প্রাণ) বলে থাকেন। সেইটিই

নাকি রাগিণীর ব্যক্তিত্বের কেন্দ্র; রাগিণী তার সৌন্দর্য্য ঐ পর্দ্দাটি হতেই লাভ করে। সে পর্দ্দাটি কোন রাগিণীতে মধ্যম (মা), কোনোটিতে কড়ি মধ্যম (হ্মা) ইত্যাদি। তাঁদের এ আবিষ্কারের যে কোনই সার্থকতা নেই—এরূপ বলা যায় না। কিন্তু জীবের প্রাণকেন্দ্র হৃৎপিণ্ড—এ কথা যতখানি সত্য, তাঁদের মন্তব্য তার চেয়ে বেশী সত্য নয়। অর্থাৎ প্রাণলীলার প্রকাশ সমস্ত দেহের ভিতর দিয়ে,—সঙ্গীতের সৌন্দর্য্য তার সুরের সমগ্র ভঙ্গিমায়।

ভীমপলশ্রী ও মূলতান, গৌরী ও পূরবী, আশাবরী ও ভৈরবী—এগুলির ভিতর ঠাটের পার্থক্য নেই বল্লেই হয়, কিন্তু এদের ব্যঞ্জনার পার্থক্য এত বেশী যে, এরা বিচিত্রভাবে হৃদয়-তন্ত্রীকে আঘাত করে। এগুলি শুন্‌লে এই কথাটিই মনে হয় যে "সুর আপনারে ধরা দিতে চায় ছন্দে"—কিন্তু ধরা দেয় না। সঙ্গীত হচ্ছে লীলা, এবং লীলা কৌতুকময়ী। সাধ্য কি তাকে নির্দ্দিষ্ট সীমানার মধ্যে নির্দ্দিষ্ট নিয়মে চলতে বাধ্য করি। ব্যর্থ রাগিণী!

ইচ্ছাশক্তির দ্বারা জীব যেমন পারিপার্শ্বিক অবস্থার সঙ্গে নিজেকে খাপ খাইয়ে নেয়, তেমনি সঙ্গীতের সাহায্যে আত্মা অতীন্দ্রিয় জগতের সঙ্গে নিজেকে খাপ খাইয়ে নেয়। সঙ্গীতকে আত্মার ইচ্ছাশক্তি বলা যেতে পারে, কেননা সঙ্গীত, আত্মার নিজেকে জিইয়ে রাখবার চেষ্টা-বিশেষ; সুতরাং এর মধ্যে বরাবর একটা সুনির্দ্দিষ্ট নিয়ম থাকা সম্ভব হতে পারে না।

(৪)

লয়ের সাহায্যে তাল সুরকে ধরবার শেষ চেষ্টা করে;—ঐখানেই তাল ও সুরের মিলনক্ষেত্র। বাঁয়াতবলায় যারা হাত পাকায়, তারা

শুধু প্রাথমিক ঠেকা দিয়েই সন্তুষ্ট থাকে, কিন্তু হাত পেকে উঠলেই সুরের বৈচিত্র্যকে ছন্দে বেঁধে ফেলবার চেষ্টা করে। ভূকম্পন যতটুকু Seismometer-এ ধরা পড়ে, সুর তার চেয়ে খুব বেশী তালে ধরা পড়ে না। ভূকম্পন বিক্ষিপ্ততায় ও অস্পষ্টতায় যেমন ভীষণ, সুর ব্যাপকতায় ও অনির্দ্দিষ্টতায় তেমনি রমণীয়। সুরের অভ্যাস এই যে, সে রাগিণী-রাজ্যের সুন্দর জায়গাটা একটু দাঁড়িয়ে বেশ করে দেখে নেয়। কিন্তু তাল বেচারী সে রসে বঞ্চিত;—সে শুধু চলতেই জানে। বাস্তবজগতে ভ্রমণকালেও এরূপ বন্ধুদ্বয়ের সম্মিলন বিরল নয়। এমতাবস্থায় দুজনের সমানে পা ফেলে চলা সম্ভব নয়। কিন্তু এরূপ মিলনের একটা বড় সার্থকতা আছে,—সে হচ্ছে কেন্দ্রবিমুখ ও কেন্দ্রা-ভিমুখ শক্তির সংযোগ। সুর সঙ্গীতকে পরিধির দিকে ছুটিয়ে নিয়ে চলে, তাল তাকে কেন্দ্রের দিকে টেনে রাখে। কিন্তু এ অবস্থায়ও যে আমরা সগোল বৃত্ত প্রত্যাশা করতে পারিনে, তার প্রমাণ ভূমগুলের গতি। সম্ভবতঃ ভূমগুলের এ ছন্দঃপাত বিশ্বেশ্বর হাস্যমুখে উপভোগই করেন।

Maeterlinck-এর "Wisdom and Destiny" একখানা আশ্চর্য্য পুস্তক। মানব-জীবনের মাধুর্য্য অমন করে খুব কম লেখকই দেখাতে পেরেছেন। তিনি দেখিয়েছেন যে, যদিও আমরা বিচার বুদ্ধিকে (Reasoning) মানুষের শ্রেষ্ঠ সম্পদ বলে থাকি, ব্যবহারিক জীবনে Wisdom-এর তুলনায়—Dogmatism-এর তুলনায় নয়—তার স্থান অনেক নীচে। দয়া, প্রেম, স্নেহ প্রভৃতি কোমল বৃত্তিগুলি যে নিয়মে নিয়ন্ত্রিত হয়ে থাকে, তার মধ্যে যুক্তির নাম-গন্ধও থাকে না, কিন্তু (তিনি বলেন) তা বলে কি তারা অসত্য ?

সুরও নিজের প্রয়োজনে নিজেকে গড়ে নেয়, এবং তার প্রয়োজন

অনন্ত ও বিচিত্র; কারণ সুর হচ্ছে হৃদয়ের প্রকাশ। হৃদয়-বৃত্তিগুলির বৈচিত্র্যের ভিতরে নির্দ্দিষ্ট নিয়ম শুধু তাঁরাই আবিষ্কার করতে পেরেছেন, যাঁরা মানুষের ব্যক্তিত্ব দুহাত দিয়ে অস্বীকার করে থাকেন। কি রাষ্ট্রীয় ইতিহাসে, কি সামাজিক ইতিহাসে, এঁরা এমন সকল নিয়ম দেখতে পান যে, সেগুলির উপর দাঁড়িয়ে এঁরা অকুতোভয়ে ভবিষ্যদ্বাণী করে থাকেন। আজও Vitalists আর Mechanists-দের লড়াই প্রচণ্ডবেগেই চলছে। শুনা যায় "ঐতিহাসিক নিয়মের" একজন আবিষ্কর্ত্তা (জর্ম্মান-অধ্যাপক Niebuhr) ১৮৩২ খৃষ্টাব্দের জুলাই মাসের ফরাসীবিদ্রোহের পর ভগ্ন-হৃদয়ে ইহলীলা সম্বরণ করেন,—কারণ উক্ত বিদ্রোহ তাঁর "ঐতিহাসিক নিয়মের" বাইরে পড়ে গিয়েছিল!

সুতরাং প্রয়োজনে পড়ে রাগিণী 'বেপর্দ্দ' হয়ে গেলে, ওস্তাদমহোদয়গণ Niebuhr-এর পরিণামকে স্বচ্ছন্দে বাহবা দিতে পারেন, নয় তো সঙ্গীত-টিকে মিশ্ররাগিণীর কোঠায় ফেলে বীরদর্পে গোঁফে চাড়া দিতে পারেন।

মানব-ইতিহাসের অনেক ক্ষেত্রেই সৃষ্টি অপেক্ষা সৃষ্টিতত্ত্ব বড় হয়ে ওঠে। প্রাগৈতিহাসিক যুগেও মানুষের ধর্ম্ম ছিল, কিন্তু ধর্ম্ম-তত্ত্ব তখন লিখিত হয় নি। থিয়লজি বয়স হিসেবে রিলিজানের কাছে দুগ্ধপোষ্য শিশু হলেও, সে এখন তার বড়দাদা হয়েছে। চিত্রকলার চেয়ে চিত্রতত্ত্ব, কাব্যের চেয়ে কাব্যতত্ত্ব শ্রেষ্ঠ হয়ে উঠেছে। এই anachronism-এর গুরুত্ব সম্বন্ধে বেশী কিছু বলা অসম্ভব। আর্টের পক্ষে এটা যে কিরূপ প্রচণ্ড বাধা তা বুঝিয়ে বলা দুঃসাধ্য, এবং এর জবাব-দিহি—কি সাহিত্যে, কি শিল্পে, কি সামাজিক সমস্যায়—বাঙালীকে যে বেশ করেই দিতে হচ্ছে, তার প্রমাণ প্রবীণ ও নবীনদলের বর্ত্তমান লড়াই।

শ্রীশিশিরকুমার সেন।

গ্রীসে ভাষার লড়াই।
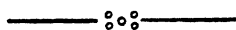
বাংলা সাহিত্যের আসর আজকাল ভাষার তর্কে সরগরম। কি রকম ভাষায় আমাদের সাহিত্য তৈরি হওয়া উচিত, এ বিষয়ে ছোট বড় মাঝারি নানা রকম সাহিত্যিকের নানা রকম মতের সংঘর্ষে তর্কটা বেশ একটু গরম হয়ে উঠেছে। অবস্থা আমাদের যতই গুরুতর হোক না কেন, একটা আশার কথা এই যে আমাদের ঝগড়াঝাঁটি কাগজে কলমে আবদ্ধ। গ্রীকেরা কিন্তু এ বিষয়ে আমাদের ছাড়িয়ে উঠেছিল। দাঙ্গা হাঙ্গামাতেও তারা পিছ্‌পাও হয়নি। সে ত বেশী দিনের কথা নয়, পনেরো ষোলো বছর হবে। গ্রীসের সেই ভাষা-যুদ্ধের একটা ছোট খাটো বিবরণ বাঙালী পাঠকদের কাছে উপস্থিত করছি।

বর্ত্তমান গ্রীসে দুটী ভাষা প্রচলিত আছে—একটী মুখের ভাষা, আর একটী লেখার ভাষা। শেষোক্তটীকে "পণ্ডিতি" (learned) বা "সাধু" (purist) ভাষা বলা হয়। অধিকাংশ লেখকই অবশ্য সাধুপন্থী। যা-কিছু সাধারণের নয়নগোচর করা হয়—যেমন খবরের কাগজ, বিজ্ঞাপন প্রভৃতি, সমস্তই এই ভাষায় লেখা। চিঠি-পত্রে স্কুলে-কলেজে, আফিসে-পার্লিয়ামেণ্টে, এ ভাষারই চলন আছে। এমন কি দু' একজন এহেন সাধু ব্যক্তিও আছেন, যাঁরা এ ভাষায় কথাবার্ত্তাও কয়ে থাকেন। প্রথমটীর নাম সাধারণ (ordinary)

বা অসাধু (vulgar) ভাষা। এ ভাষা কোথাও শেখানো হয় না কিন্তু সকল গ্রীকই এ ভাষা জানে ও অক্লেশে বলতে পারে। দু' চারটে সাধু শব্দের সহযোগে এই ভাষাই সাধারণতঃ এথেনীয় ভদ্র-সমাজে ব্যবহৃত হয়। এ দুই ভাষায় তফাৎ যথেষ্ট—কথা, উচ্চারণ, শব্দরূপ, বাক্যবিন্যাস, সকল বিষয়েই এ দুয়ের ভিতর স্পষ্ট প্রভেদ লক্ষিত হয়।

এই রকম ভাষার অনৈক্য হোমারীয় কবিতার প্রাচীনতম অংশ-গুলিতেও চোখে পড়ে। হোমারের সময় গ্রীসে কতকগুলি প্রাদেশিক ভাষা (dialects) মাত্র প্রচলিত ছিল। তাদের মধ্যে কতকগুলি সেইরূপই রয়ে গেল আর কতকগুলি সাহিত্যিক ভাষায় উন্নীত হোল। এই অপভাষাগুলিকে সাধারণতঃ দুভাগে ভাগ করা হয়—(১) আইওনিয় (২) অন-আইওনিয়। অ্যাটিক ভাষা—অর্থাৎ যে ভাষা শুধু এথেন্সে চল্‌ত ও যে ভাষায় প্লেটো ও থুকিডিডিস্ লিখতেন—তা এই আইওনিয় শ্রেণীর একটী বিশেষ বিভাগ।

মেডিক (medic) সমরের পর এথেন্সের গৌরব বেড়ে উঠ্‌ল। সঙ্গে সঙ্গে তার ভাষার পদও উপরে উঠে গেল। ফ্রান্সে যেমন Ile-de-france-এর প্রচলিত ভাষা সমস্ত দেশময় ছড়িয়ে গেল, গ্রীসেও তেমনি অ্যাটিক ভাষা সমুদয় গ্রীসদেশে প্রচলিত হোল। অন্যান্য প্রাদেশিক ভাষার সংস্পর্শে এসে কিছু কিছু পরিবর্ত্তিত হয়ে, এই ভাষাই গ্রীসের "সাধারণ ভাষা" হয়ে দাঁড়াল।

তারপর ক্রমে ক্রমে রোমীয়েরা, স্লাভেরা, ফ্রাঙ্কেরা ও তুর্কীরা গ্রীস জয় করেছে। তারা গ্রীক-ভাষার উপর নিজ নিজ ভাষার ছাপ রেখে গিয়েছে বটে কিন্তু তার নিজস্ব রূপটীকে কিছুতেই নষ্ট কর্ত্তে পারে

নি। যে ভাষা আজকালও এথেন্স ও অন্যান্য নগরে চল্‌ছে তার স্বরূপটী সেই আলেকজান্দারের সময় হতে প্রচলিত "সাধারণ ভাষা"তেই পাওয়া যায়। এই হচ্ছে বর্ত্তমান গ্রীসের মুখের ভাষার সংক্ষিপ্ত ইতিহাস।

(২)

কিন্তু মুখের ভাষা ছাড়াও গ্রীসে আর একটী লেখার ভাষা আছে।

প্রাচীনকালে এ দুটি ভাষা যেন সমান্তরালভাবে চলেছিল। হোমার থেকে প্লেটো এবং প্লেটো থেকে প্লুটার্ক পর্য্যন্ত মুখের ভাষাও যেমন বদ্‌লেছে, লেখার ভাষাও অনেকটা সেই রকম ভাবেই বদ্‌লেছে। মৌখিক ভাষার সঙ্গে লেখার ভাষার আসলে ছাড়াছাড়ি সুরু হ'ল কিন্তু বৈজান্তীয় (Byzantine) যুগে। তখন গ্রীসে কোনও জীবন্ত সাহিত্য না থাকায় লেখকেরা একমাত্র প্রাচীন যুগের সাহিত্যের চর্চ্চায় মনোনিবেশ কর্‌লেন। তাঁরা প্রাচীন সাহিত্য থেকে কেবল তাঁদের লিখবার বিষয় অনুকরণ করেই নিরস্ত হলেন না, তাঁদের লিখবার ভঙ্গীটি পর্য্যন্ত অনুকরণ কর্ত্তে লাগলেন। এই রকমে মুখের ভাষা যখন সামনের দিকে পুরোদমে এগিয়ে যেতে লাগল, লেখার ভাষা তখন প্রাচীন কথা ও শব্দ এবং প্রাচীন লিখবার ভঙ্গীর মধ্যে নিজেকে গণ্ডীবদ্ধ করে ফেল্‌তে আরম্ভ কর্‌লে।

কিন্তু এ রোগেরও ঔষধ আছে। তাই দ্বাদশ শতাব্দীতে, বা তার কাছাকাছি সময়ে সাহিত্যে একটী নূতন লিখন-ভঙ্গী দেখা গেল

যার ভিত্তি হচ্ছে মুখের ভাষা। ফ্রান্স, স্পেন ও ইটালীতে নূতন ভাষা পুরাতন ভাষাকে হটিয়ে দিয়ে তাড়িয়ে দিয়েছে। কিন্তু গ্রীসের বেলা তা হয় নি। না-হবার কারণ এ নয় যে সে ভাষায় উঁচুদরের পুস্তকাদি রচিত হয় নি। এর একটী বিশেষ কারণ ছিল, যা অন্য কোন দেশে দেখা যায় নি। শিক্ষিত গ্রীকেরা কলমের জোরে তাদের মৃত ভাষাটীকে আবার লেখায় সজীব ক'রে তোলবার চেষ্টা করেছিল। এই ভাষার মধ্যে তারা যেন প্রাচীনকালের সহিত তাদের একটী সুদৃঢ় বন্ধন দেখতে পেত ; এ ভাষা যেন নিশ্চয় ক'রে তাদের জানিয়ে দিত যে তারা সত্য সত্যই সেই পেরিক্লিসের বংশধর। গ্রীসের সেই গৌরবময় অতীতকাল যে তাদেরই অতীতকাল এ সান্ত্বনা তারা এই ভাষা ভিন্ন আর কোথাও পেত না। পতিত জাতির অতীতভক্তির আতিশয্যবশতঃই গ্রীসের মৌখিক ভাষা ফ্রান্স স্পেন ইটালি প্রভৃতির মৌখিক ভাষার মতো সাহিত্যে স্থান পেলে না।

(৩)

কিন্তু অবস্থা সঙ্গীন হয়ে উঠলো—ঊনবিংশ শতাব্দীতে। গ্রীস স্বাধীনতা লাভ কর্‌বার ঠিক আগেই গ্রীকদের মধ্যে একটী জাতীয়তার ভাবের পুনরাবির্ভাব হয়েছিল। সেই সময়ে এই প্রশ্ন উঠ্‌লো, যে সমস্ত জাতির পক্ষে ভাবপ্রকাশের জন্যে কোন ভাষা অবলম্বন করা কর্ত্তব্য। দুই বিভিন্ন দলের মুখপাত্র হয়ে অনেক লোকে অনেক লেখা লিখ্‌লেন। সে সব লেখা যে মাঝে মাঝে ভদ্রতার সীমা অতিক্রম করে নি তাও

বলা যায় না। ভিয়েনা, আমষ্টারডাম্, বুখারেষ্ট প্রভৃতি স্থান থেকে শিক্ষিত গ্রীকেরা পুস্তিকা রচনা ক'রে ছাপাতে লাগলেন। চারিদিকে একটা হৈ-চৈ পড়ে গেল। তারপর ১৮২১ সালে গ্রীসে স্বাধীনতার সমর জ্বলে উঠ্‌লো। সাত বছর ধরে সে যুদ্ধ চলে। সে সাত বছর অবশ্য এই ভাষার ঝগড়া-বন্ধ ছিল। তারপর Coray নামে একজন গ্রীক-পণ্ডিত সাহিত্যে একটি "মধ্যপথের" ব্যবস্থা কর্‌লেন; কিন্তু সে পথ কেউ অবলম্বন কর্‌লে না।

Roidis তাঁর "পুত্তলিকা" নামক গ্রন্থে এই মত প্রকাশ কর্‌লেন যে লেখার ভাষা থেকে তার প্রাচীন রূপগুলি একে একে পরিত্যাগ কর্‌লেই কালক্রমে লেখার ভাষা ও মুখের ভাষা এত কাছাকাছি এসে দাঁড়াবে যে তাদের মধ্যে বিশেষ কোন অনৈক্য থাক্‌বে না। তাঁর কথা যে কতটা সত্য তা ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগের গদ্যের সহিত প্রথম ভাগের গদ্যের তুলনা কর্‌লেই বুঝতে পারা যায়।

কিন্তু সমরধর্ম্মে তখন "স্যাক্‌রার ঠুক্‌ঠাক্" এর চেয়ে "কামারের এক ঘা" এর বেশী দরকার হয়েছিল। তখন বুঝিয়ে দেওয়ার দরকার হয়েছিল যে প্রাচীন গ্রীকই সাধু আর আধুনিক কথিত গ্রীক যে অসাধু, এ বিশ্বাসটী একটী মস্ত ভুল। এ কথা তখন কেউই মান্‌ত না যে এমন কোন ভাষা থাক্‌তে পারে না, যা স্বভাবতঃই দুর্ব্বল বা দরিদ্র, এবং শিল্পীর হাতে সব ভাষাই সমান খেলে। ফ্রান্সে ভিক্‌তর হ্যুগো যা করেছিলেন, গ্রীসে Psichari-ও তাই কল্লেন। ১৮৮৮ খৃঃ অব্দে তাঁর "আমার ভ্রমণ" গ্রন্থ সেই "কামারের ঘা" দিলে।

১৮৮৬ সালে Psichari, কনষ্টাণ্টিনোপল, কিওস ও এথেন্স বেড়াতে গিয়েছিলেন। এই ভ্রমণ-কাহিনীটিকে ভিত্তি করে তিনি

রঙ্গ-ব্যঙ্গ কারুণ্যপূর্ণ কবিত্বময় একখানি গ্রন্থ রচনা করেন। এতে গ্রীক্-জীবন ও জাতীয় অন্তরাত্মার সুন্দর প্রতিকৃতি ছিল; জাতীয় দোষগুলির বিশেষতঃ ভাষাবিষয়ে পাণ্ডিত্যাভিমানের উপর তীব্র শ্লেষ ছিল; আর সেই সঙ্গে ভাষার উন্নতি ও বিবর্ত্তন সম্বন্ধে বিজ্ঞানের নূতন নূতন তথ্যগুলি অতি নিপুণভাবে সন্নিবিষ্ট ও বিবৃত হয়েছিল। বইখানি মুখের ভাষায় লেখা—কিন্তু লেখার ভঙ্গীটী যেমন সুন্দর তেমনি মোলায়েম, তার কোনখানে খিচ নেই খুঁত নেই। বানানেরও কতকগুলি নূতন রীতি তিনি এই গ্রন্থে প্রচলিত করেন। এই রীতিগুলি তাঁর বহু বৎসরের ভাষাবিজ্ঞানচর্চ্চা ও বিস্তর গবেষণার ফল।

বইখানি প্রকাশিত হওয়ার পরই গ্রীসে বেশ একটু উত্তেজনার সাড়া পাওয়া গেল। দুঃখের বিষয় অতি অল্প লোকই এ গ্রন্থের পুরো মর্য্যাদা বুঝতে পেরেছিলেন। অনেকে আবার এর অন্য সমস্ত গুণ স্বীকার করে ভাষাসম্বন্ধে ভয়ানক আপত্তি জানাতে লাগলেন। সমালোচকগণ দু' চারখানা পাতা পড়েই তাঁদের বাঁধাবুলিতে গালা-গালি দিতে আরম্ভ কল্লেন। কাগজগুলির মধ্যে কেবল একখানি এর স্বপক্ষে ছিল এবং কেবল একজন লেখক, Roidis, এর উপর একটী অতি চমৎকার প্রবন্ধ লিখলেন। প্রবন্ধটী সাধুভাষায় লেখা, কিন্তু মৌখিক ভাষার পক্ষে এটী সকলের চেয়ে যুক্তিযুক্ত ওকালতী বলে গ্রীক্-সাহিত্যে স্থান পেয়েছে। তাতে তিনি দেখিয়ে দিলেন যে Psichari-র মতগুলি সত্য ও অভ্রান্ত। অনেকেই এই প্রবন্ধ পড়ে তাঁর মত অবলম্বন করেছিলেন।

(৪)

এইবার আমরা ভাষাবিপ্লব সংশ্লিষ্ট গ্রীসের সেই অদ্ভুত দাঙ্গাটীর কথা উল্লেখ কর্‌ব। Acropolis পত্রে Mr. Pallais, St. Malthew-র Gospel-এর অনুবাদ প্রকাশ কর্ত্তে আরম্ভ করেন। অনুবাদটী "অসাধু" ভাষায়। জনসাধারণ বিশেষতঃ ছাত্রের দল এতে বড়ই উত্তেজিত হয়ে উঠ্‌লো। স্কুলে তারা চিরকাল সাধু ভাষাতে বই পড়ায় অভ্যস্ত; মুখের কথা ছাপার অক্ষরে দেখে তাদের চোখ যেন জ্বলে গেল। এ ভাষায় ধর্ম্ম-পুস্তকের অনুবাদ তাদের কাছে ধর্ম্মের-ই অবমাননা বলে মনে হতে লাগলো। তারা সরকারের কাছে এই বলে আবেদন করে পাঠালে যে সমস্ত বাইবেল-অনুবাদকগুলিকে সমাজচ্যুত করা হোক্। সে আবেদন গ্রাহ্য হোল না। তারপর একদিন তারা Olympian Jupiter-এর স্তম্ভের চারিদিকে জড় হোল; ক্রোধ ও মদ তখন তাদের পেয়ে বসেছে। একজন ছাত্র উঠে এই বক্তৃতা দিলে যে শুধু অনুবাদকদেরই সমাজচ্যুত কর্‌লে যথেষ্ট হবে না। যারা ঐ রকম অনুবাদ পড়ে তাদেরও শাস্তি দেওয়া দরকার। আর যেখানে যেখানে ঐ অনুবাদ পাওয়া যাবে তা পুড়িয়ে ফেল্‌তে হবে। প্রধান মন্ত্রী তখন খোলা গাড়ীতে বেড়াতে যাচ্ছিলেন; অমনি তারা সেই গাড়ীর উপর গুলি বর্ষণ করতে লাগল। তিনি তাঁর বাড়ীতে ফিরে এলে সেই বাড়ীও তারা আক্রমণ করেছিল। সৈনিকেরা ভিড় ভেঙ্গে দিতে এলে তারা দু'চার জনকে মেরে ফেলতেও কুণ্ঠিত হয় নি। সে দিন সৈনিকেরা অতুলনীয় ধৈর্য্য দেখিয়েছিল। প্রাণ যায় তাও স্বীকার, তবু তারা স্বদেশবাসীর উপর গুলি চালায় নি, শুধু ফাঁকা আওয়াজ করেই ক্ষান্ত হয়েছিল। এতেও কিন্তু সাধুভক্তদের উত্তেজনা কমলো

না। এথেনীয় সংবাদ পত্রগুলি আবার সাধারণের এই রোষাগ্নিতে ঘৃতাহুতি দিতে লাগ্‌লো। সমস্ত ইয়োরোপ স্তম্ভিত হয়ে গ্রীসের এই অস্বাভাবিক চিত্তবিকার লক্ষ্য করতে লাগল।

ব্যাপারটা ইয়োরোপকে বোঝান শক্ত। এ কথা ইয়োরোপ জানে যে ভাষান্দোলনে কাগজের উপর কালির বান-ই ডাকে; তা নিয়ে যে তাজা মানুষের রক্তের রক্তগঙ্গা বইতে পারে এ তার স্বপ্নাতীত। ইয়োরোপের বিস্ময় দেখে গ্রীক্ পণ্ডিতসমাজ অত্যন্ত লজ্জিত হয়ে উঠলেন। ইয়োরোপকে বোঝাবার জন্যে তাঁরা একটা চলনসই কৈফিয়তের অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হলেন। কেউবা বল্লেন ধর্ম্মই এ হাঙ্গামার কারণ, কেউবা বল্লেন, রাজনীতি। কিন্তু Psichari ফ্রান্সের La Revue পত্রে একটি প্রবন্ধে স্পষ্ট করে প্রতিপন্ন করে দিলেন যে এই ব্যাপারের কারণ হচ্ছে একটা মাত্র—সেটা এই যে বর্ত্তমান অনুবাদটার ভাষা "অসাধু"। গ্রীকচার্চ্চ বাইবেলের অনুবাদের বিপক্ষে নহেন; এতদিন বরং তাঁরা অনুবাদ-প্রচারকে বিশেষ ভাবে উৎসাহিত করেই এসেছেন। এই অনুবাদটার উপর তাঁরা এত বিরক্ত কেন? শুধু মুখের ভাষায় লেখা বলে। Psichari-র কথায় ইয়োরোপ বুঝল ব্যাপারখানা কি।

(৫)

এখন জিজ্ঞাস্য এই যে মুখের ভাষার উপর এত রাগ কেন? এ নিয়ে গ্রীসে অনেক তর্ক-বিতর্ক হয়ে গেছে। আমরা এখন তার সারমর্ম্ম দেব।

গ্রীসের সাধুপন্থীরা বলেন—"অসাধু" ভাষা সাবেক্ গ্রীক্ ভাষার বিকৃত আকার।

প্রতিবাদীরা বলেন—যে ভাষা সমস্ত গ্রীক্ জনসাধারণ ব্যবহার করে, এমন কি শিক্ষিতেরাও লেখায় না হোক্, কথায় ব্যবহার করেন, সে ভাষা অসাধু হতে পারে না। তা ছাড়া এ ভাষা প্রাচীন গ্রীক্ ভাষার বিকার নয়—বিকাশ। যুগে যুগে ভাষার পরিবর্ত্তন হতেই হবে। ভাষা মানুষের চেষ্টার ফল। মানুষের যে সকল মনোবৃত্তির ক্রিয়ার ফলে ভাষা তার স্বরূপ প্রাপ্ত হয় সেগুলিও যখন পরিবর্ত্তন ও বিবর্ত্তনের অধীন তখন ভাষা যে চিরদিন এক থাক্‌তে পারে না তাতে আর আশ্চর্য্য হবার কি আছে? আর, যদি পূর্ব্ববর্ত্তী যুগের ভাষার তুলনায় পরবর্ত্তী যুগের ভাষা বিকৃত হয়, তা হলে প্লেটোর ভাষাও হোমারের তুলনায় বিকৃত, নিউ টেষ্টামেণ্টের ভাষাও প্লেটোর তুলনায় বিকৃত।

সাধুভাষীরা বলেন—অনেক দিন অধীনতা স্বীকার করায় মৌখিক গ্রীক্ ভাষার মধ্যে বহু বিদেশী কথা এসে পড়েছে এবং তাতে করে গ্রীক্ ভাষা বিকৃত হয়েছে ও তার পবিত্রতা নষ্ট হয়েছে।

প্রতিবাদীরা উত্তর দেন—এ যুক্তির কোন মূল্যই থাকে না যখন আমরা দেখতে পাই, কোন দেশের কোন ভাষাই বিদেশের প্রভাবমুক্ত নয়। যে সব বিদেশী কথা ভাষার সঙ্গে মিশে গিয়েছে, কোন দেশের কোন লোকই সে সব কথা পরিত্যাগের পক্ষপাতী নয়। তা ছাড়া ভাষা-বিজ্ঞানের দিক দিয়েও এই সমস্ত আমদানী-করা কথার একটা বিশেষ দাম আছে। এই রকম এক একটা কথার ভিতর দেশের ইতিহাসের এক একটা যুগ প্রচ্ছন্নভাবে পুঞ্জীভূত হয়ে থাকে। ইতি-হাসের এই সাক্ষীগুলিকে বিনষ্ট করবার অধিকার কারো নাই, কারো থাক্‌তে পারে না।

আর একটা আপত্তি সাধুপন্থীরা বার বার করে তুলে থাকেন—সাধারণ গ্রীক্ ভাষা বলে বাস্তবিক কোন ভাষা নেই। গ্রীসে মুখের ভাষা সব জায়গায় এক রকম নয়। দুটী বিভিন্ন গ্রামে কথা ও তার উচ্চারণ ভঙ্গী দুই-ই আলাদা। যদি প্রত্যেক গ্রামই নিজের নিজের ভাষায় লেখে তাহলে কেমন করে একটা সর্ব্বজনীন গ্রীক্ ভাষা তৈরি হওয়া সম্ভব?

প্রতিবাদীরা কথাটীর উত্তর দেন দু' রকমে। তাঁরা প্রথমতঃ বলেন—ধরে নেওয়া যাক্ দেশের অবস্থা এই রকম। তাহলে সাধু-ভাষাই বা কেমন করে এ স্বেচ্ছাচারিতা বন্ধ করবে। ব্যাকরণের উপর গড়ে তোলা একটা কেতাবিভাষা দেশের সমস্ত কথ্য ভাষাকে উপেক্ষা করে কি রকমে স্থায়ী হতে পারে তা আমরা বুঝতে পারি নে।

দ্বিতীয়তঃ তাঁরা বলেন—দেশের ভাষার সম্বন্ধে এ কথা আমরা মানিনে। প্লেটোর ভাষা অনেক সাধুপন্থীর আদর্শ এবং সকল গ্রীক্ই প্লেটোর ভাষা বুঝতে পারেন এ গর্ব্ব অনুভব করে থাকেন। কিন্তু সাধুভাষার পক্ষপাতীর দল এ কথা কি জানেন না যে, প্লেটো এমন একটী কথাও ব্যবহার করেন নি যা তাঁর সময়ের এথেন্সে মুখে মুখে প্রচলিত ছিল না। আমরা এ কথা খুব বিশ্বাস করি যে একজন এথেনীয় যদি তাঁর শিক্ষিত ঢঙটী ত্যাগ করে সাধারণ ভাবে কথা বলেন তবে গ্রীসের সকল ভাগের লোকই তাঁর কথা বুঝতে পারে। যদিই বা কোন প্রদেশের লোক তাঁর কথা বুঝতে না পারে তাতে ক'রে এমন কিছুই প্রমাণ হয় না যে গ্রীসে কোনও সাধারণ ভাষা নাই; শুধু এইটুকু প্রমাণ হয় যে সর্ব্বত্র এখনও সে ভাষা পুরো চালানো হয় নি। ফ্রান্সে একটা সাধারণ ভাষা নেই এ কথা বোধ হয় কেউই বলবেন না

অথচ এই ফ্রান্সেই ধর্ম্ম প্রচার কর্ত্তে গিয়ে জনসাধারণকে বোঝাতে গেলে অনেক জায়গায় স্থানীয় অপভাষা ব্যবহার কর্ত্তে হয়।

সাধু ভাষার দলের আর একটি আপত্তি এই যে অসাধু ভাষায় উচ্চ ভাব প্রকাশ করা যায় না। প্রতিবাদীরা উত্তরে বলেন, এ কথা যে কতদূর ভিত্তিহীন তা শুধু বর্ত্তমান গ্রীক্ সাহিত্যের দিকে চাইলেই বুঝতে পারা যায়। কবিতা ত এ ভাষাকে একেবারে একচেটে করে নিয়েছে। আধুনিক গ্রীসের দু'জন খুব উঁচু দরের কবি Solomos ও Valaority মুখের ভাষাতেই পদ্য রচনা করেছেন। গদ্যেও যে এ ভাষা কতদূর উপযোগী তা Psichari তাঁর "আমার ভ্রমণ" ও অন্যান্য গ্রন্থে দেখিয়ে দিয়েছেন। এ ভাষায় জ্যোতিষ, ইতিহাস অর্থনীতি প্রভৃতি বিষয়ে বই লেখা হচ্ছে। সুতরাং কেমন করে বলা যেতে পারে যে এ ভাষার সম্পদ্ কম আর এ ভাষা দিয়ে ভাব প্রকাশ করা যায় না।

একটা কথা প্রতিবাদীরা সকলকে মনে রাখতে বলেন। সাধারণ ভাষায় লিখ্তে হবে বলে সাধুভাষার কোন কথাই যে তাঁরা ব্যবহার কর্ত্তে পারেন না এ কথা যেন কেউই মনে আদৌ স্থান দেন না। শিক্ষিত লোকের ও অশিক্ষিত লোকের ভাষার মধ্যে ব্যবধান সব দেশেই থাকে এবং গ্রীসেও আছে। যদি কোন কথা সাধারণ ভাষায় না থাকে তবে লেখক অনায়াসে তা সাধুভাষা থেকে নিতে পারেন। কেবল কথাটীকে এমনি ভাবে নিতে হবে যে তা যেন আন্যান্য সাধারণ কথার সঙ্গে বে-মালুম ভাবে মিশে যায়, যেন তা তাদের সঙ্গে ছন্দ মিলিয়ে চলে যেতে পারে।

গ্রীসে এই ভাষা-সমস্যার আজও কোন সমাধান হয় নি। দুটী ভাষাই চল্‌ছে ; এখনও কোন ভাষাই একাধিপত্য স্থাপন কর্ত্তে পারে

নি। আমাদের দেশেও আজকাল ভাষান্দোলন প্রবল বেগে চল্‌ছে। গ্রীসের উদাহরণ আমাদের সত্যের আলোকের আভাস দেখিয়ে দিতে পারে এই ভরসায় এই প্রবন্ধের অবতারণা।

শ্রীনীরেন্দ্র নাথ রায় চৌধুরী।

পত্র।

(নববাণী হইতে উদ্ধৃত)

শ্রীমান্ অনুপকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

কল্যাণীয়েষু

তোমরা যখন "নববাণী" প্রচার কর্‌তে কৃত-সংকল্প হয়েছ, তখন আমাদের মেনে নিতেই হবে যে, সে বাণী কোনও পূর্ব্ববাণীর প্রতিধ্বনি হবে না, নচেৎ ও নামের কোনও সার্থকতা থাকে না, এবং ও নাম সার্থক করবার আজ প্রয়োজন আছে; কেননা দিন এসেছে। আমরা যে একটা নবযুগের সন্ধিস্থলে এসে পৌঁচেছি, তার পরিচয় ত ভারতবর্ষের সকলের কথায় এবং সকল কথায় পাওয়া যায়। আজকের দিনে আমাদের আশার ও ভাষার একমাত্র বিষয় হচ্ছে—স্বরাজ্য। এ বিষয়ে আমাদের আশা যে কি তা আমাদের ভাষা থেকে ঠিক ধরা না গেলেও, এটুকু বেশ বোঝা যায় যে, আজকের দিনে সমগ্র ভারতবাসীর মনের কথা এই যে—তে হি নো দিবসা গতাঃ। আগামী কল্য কি মূর্ত্তি ধারণ করে আস্‌বে, তা ঠিক না জানলেও, আমরা এটা ঠিক জানি যে গত কল্যের হাত থেকে আমরা মুক্তি লাভ করেছি,—অন্ততঃ মনে।

(২)

বাংলা দেশে যে-সাহিত্য ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে জন্ম লাভ করে, এবং গত একশ' বৎসর ধরে বাঙ্গালী যে সাহিত্যের পুষ্টি-সাধন করে আস্‌ছে—সে সাহিত্য হচ্ছে সেই দিনের সাহিত্য,—যে দিন, আমাদের মতে গত হয়েছে। সুতরাং এই আসন্ন নবযুগে নিশ্চয়ই একটি নব-সাহিত্যের সৃষ্টি হবে, যদি বাঙ্গালী স্বরাজ্যের মোহে মনোরাজ্যের দিকে পিঠ না ফেরায়। সে বিপদের সম্ভাবনা যে একেবারেই নেই তা নয়। আমাদের আগামী যুগ শুধু স্বরাজের নয়, "স্বদেশীর"ও যুগ হবে অর্থাৎ ভারতের লুপ্ত শিল্প বাণিজ্য এ যুগে পুনর্জ্জন্ম অথবা নব জন্ম লাভ কর্‌বে। সুতরাং বাঙ্গালীর মন অবস্থার গুণে কল-কারখানার দিকে সহজেই এতটা ঝুঁকবে যে, হয় ত সরস্বতীর বদলে বিশ্বকর্ম্মা হয়ে উঠ্‌বেন—এ দেশের একমাত্র উপাস্য দেবতা। বিশকরম পূজোর আমি বিরোধী নই;—তাই বলে এ কথাটাও আমি ভুলতে পারি নে যে, দোয়াত-কলম ছেড়ে শুধু যন্ত্রপূজা করে কোনও জাতি, উন্নতি পড়ে থাক্ অভ্যুদয় পর্য্যন্ত লাভ কর্‌তে পারে না। তবে আশার কথা এই যে, পৃথিবীর এই আগতপ্রায় যুগ, আর যাই হোক খুব সম্ভব যন্ত্রযুগ হবে না। মানুষ যন্ত্রবৎ চালিত এবং যন্ত্রচালিত হলে অবশেষে তার যে কি দুর্গতি হয়, তার প্রমাণ ত আজকের দিনে সকলের চোখের সুমুখে পড়ে রয়েছে। ইয়োরোপের নরমেধ-যজ্ঞ হতে, যে দেবতা বিশ্ব-মানবের উদ্ধারকল্পে দক্ষিণ হস্তে বর আর বামহস্তে অভয় নিয়ে আবির্ভূত হবেন, তাঁর প্রসাদ লাভ কর্‌বে শুধু তারা যারা জানে যে, মানুষের আত্মার শক্তিই হচ্ছে তার যথার্থ আত্মশক্তি। ভবিষ্যতে কোন জাতিই আর মনে কৃপণ হয়ে জীবনে

ধনী হতে পারবে না। সুতরাং এ অবস্থায় সরস্বতীর আসন টলা দূরে থাক্, ঊনবিংশ শতাব্দীর যত পাপ এই যুদ্ধের আগুনে পুড়ে ছাই হয়ে যাবার পর, মানব-সভ্যতার যে খাঁটি সোণা উদ্‌বর্ত্ত থাক্‌বে সেই সোণায় সরস্বতীর নব পদ্মাসন নয় নব সিংহাসন রচিত হবে। অন্ততঃ এই ত আমাদের আশা।

(৩)

আমার বিশ্বাস, আমাদের গত একশ' বৎসরের সাহিত্যের পরমায়ু শেষ হয়ে এসেছে। সুতরাং সে সাহিত্যের মতি-গতির প্রতি একবার দৃষ্টিপাত করা যাক্।

প্রথমেই নজরে পড়ে যে সে-সাহিত্য নিরানন্দ। আজ একশ' বৎসর ধরে আমরা আমাদের সকল লেখায় সকল কথায় প্রকাশ করে এসেছি—শুধু অসন্তোষ। এর কারণ—আমরা আমাদের রাজনৈতিক অবস্থা, আমাদের সামাজিক ব্যবস্থা, আমাদের সাংসারিক দৈন্য, আমাদের চরিত্রের দুর্ব্বলতা প্রভৃতি কোন জিনিসই সন্তুষ্টচিত্তে গ্রাহ্য করে নিতে পারি নি। শুধু তাই নয়, আমাদের জাতীয় জীবনের এই সর্ব্বাঙ্গীন হীনতা আমাদের বুকের ভিতর অষ্টপ্রহর কাঁটার মত বিঁধছে। তার ফলে আমাদের সাহিত্য হয়েছে শুধু আক্ষেপ ও আক্রোশের সাহিত্য। এ সাহিত্যে, আমরা এক চোখ লাল করেছি,—হয় কেঁদে, নয় রেগে; আর এক চোখ আলো করেছি, বিদ্রূপের হাসিতে—সেও হয় ক্ষোভে নয় ক্রোধে। এ সাহিত্যে অবশ্য বৈরাগ্যেরও অনেক কথা আছে, কিন্তু সে সব হয় মিছে, নয় ব্যঙ্গে।

যার দেহে রজোগুণ নেই, তার মনে সত্ত্বগুণ থাকতেই পারে না। যে আঙ্গুরের নাগাল পাওয়া যায় না, সে আঙ্গুরকে খাট্টা বলায়—কি আধ্যাত্মদর্শন কি ভৈষজ্যবিজ্ঞান কোনটিরই পরিচয় দেওয়া হয় না। কথামালার শৃগালকে আমরা ছাড়া আর কেউ ত্যাগী পুরুষ বলে মান্য করেনি।

এই বিলাপ ও প্রলাপের জমির উপর অবশ্য গুটিকয়েক এমন ফুল ফুটে উঠেছে যার বর্ণে সাহিত্য-গগন উজ্জ্বল আর যার গন্ধে সাহিত্য-জগৎ আমোদিত হয়ে উঠেছে। এর কারণ সাহিত্য-জগতের যাঁরা মহাপুরুষ, তাঁদের প্রতিভা যুগধর্ম্মের একান্ত অধীন নয়। তাই বলে কবি-প্রতিভা কিছু আর স্বকালের সম্পূর্ণ বহির্ভূতও নয়। উদাহরণস্বরূপ রবীন্দ্রনাথের কবিতা নেওয়া যাক্; এ কবির কাব্যের পর পর চারিটি বেশ স্পষ্ট পৃথক্ যুগ আছে। মোটামুটি হিসেবে, এ কবির প্রথম যুগের সুর আনন্দের, দ্বিতীয় যুগের বেদনার, তৃতীয় যুগের বিদ্রোহের এবং চতুর্থ যুগের মুক্তির। কিন্তু তাঁর প্রথম যুগের আনন্দও নিরাবিল নয়, তার অন্তরেও হয় বেদনা, নয় বিদ্রোহের সুর ঘনিষ্ঠভাবে জড়িয়ে রয়েছে। এতে আশ্চর্য্য হবার কিছু নেই—জাতীয় জীবনের নিৰ্জ্জীবতার প্রতি আর যিনিই হোন কবি কখনই উদাসীন হতে পা্রেন না; কেননা মহাপ্রাণতাই হচ্ছে কাব্যের প্রাণ।

(৪)

তার পর নজরে পড়ে যে এ সাহিত্য আর্টিষ্টিক নয়।

এর কারণ এ সাহিত্য মুখ্যতঃ এবং স্পষ্টতঃ উদ্দেশ্যমূলক এবং সে উদ্দেশ্য হচ্ছে জাতীয় জীবনের উন্নতি সাধন। গত একশত বৎসর

ধরে বাঙ্গালী জাতি সাহিত্যে একমাত্র অসন্তোষ প্রকাশ করেই সন্তুষ্ট থাকে নি। রাজা রামমোহন রায় থেকে সুরু করে রবীন্দ্রনাথ পর্য্যন্ত বঙ্গ-সাহিত্যের মহাজনেরা সকলেই স্বজাতিকে মনে ও চরিত্রে শক্তি-শালী করতে, রাষ্ট্রে ও সমাজে স্বপ্রতিষ্ঠ করতে, ধর্ম্মে ও কর্ম্মে সমৃদ্ধি-শালী করতে, কায়মনোবাক্যে চেষ্টা করেছেন। যাঁরা আমাদের জাতীয় সাহিত্য রচনা করেছেন, তাঁরাই যে আমাদের জাতীয় জীবন গঠন করেছেন, এ কথা বললে নেহাৎ বাজে কথা বলা হবে না। রাজা রামমোহন রায় এবং পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের, এ বিষয়ে প্রচেষ্টা ত সর্ব্বলোকবিদিত। তার পর বঙ্কিমচন্দ্র নিজ জবানিই কবুল করেছেন যে স্বজাতির উন্নতিকল্পেই তিনি লেখনী ধারণ করেন; অর্থাৎ লেখা জিনিসটে এঁদের সকলের কাছেই ছিল জাতি-গঠনের একটি প্রকৃষ্ট উপায়মাত্র। সাহিত্যকে এঁরা একটা means হিসেবেই দেখতেন, end হিসেবে নয়। বঙ্কিমচন্দ্রের লেখার মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল পরোপকার, গৌণ উদ্দেশ্য কাব্যসৃষ্টি। ফল যদি তার উল্টো হয়ে থাকে, অর্থাৎ তাঁর হাত থেকে যা বেরিয়েছে তা যদি মুখ্যতঃ সাহিত্য হয়ে থাকে ত, তার কারণ অনেক ক্ষেত্রেই দেখা যায় মানুষের অবাধ্য প্রতিভা তার সঙ্কীর্ণ সংকল্পকে অতিক্রম করে। বঙ্কিমের লেখারও তিনটে যুগ আছে। তাঁর মধ্য যুগের রচনাই যথার্থ কাব্য, আর তাঁর আদি ও অন্ত যুগের লেখা জাতীয় হিত-সাধনের সাহিত্য। দুর্গেশ-নন্দিনী ও মৃণালিনীর যুগে আর্ট তাঁর করায়ত্ত হয় নি, আর আনন্দমঠ দেবীচৌধুরাণীর যুগে আর্ট তাঁর করচ্যুত হয়েছিল। সুতরাং এ সকল গ্রন্থের যা কিছু মূল্য সে হচ্ছে জাতীয় শিক্ষাপুস্তক হিসেবে। যদি কেউ জিজ্ঞাসা করেন, দুর্গেশনন্দিনী প্রভৃতি কি শিক্ষা দেয়? তার উত্তর

পেট্রিয়টিজম। আনন্দমঠ প্রভৃতির শিক্ষাও ঐ। দুয়ের ভিতর প্রভেদ এই যে, এর প্রথমগুলি ইংরাজি সাহিত্যের প্রভাবে রচিত আর শেষগুলি সংস্কৃতের।—এ স্থলে বলা আবশ্যক যে, সাহিত্যের—পেট্রিয়টিজম এবং রাজনীতির পেট্রিয়টিজম এক বস্তু নয়; কেননা, সাহিত্যের উদ্দেশ্য মানুষের ভিতরের অবস্থা এবং রাজনীতির উদ্দেশ্য তার বাইরের ব্যবস্থা বদল করা।

আমি পূর্ব্বে বলেছি যে, জাতীয় জীবনের প্রত্যক্ষ দৈন্যের প্রতি অন্ধ হয়ে কাব্য রচনা করা মহাপ্রাণ ব্যক্তিদের পক্ষে অসম্ভব; কিন্তু এ কথাও সত্য যে সম্পূর্ণ আত্মগত না হতে পার্‌লেও আর্টিষ্টিক সাহিত্য রচনা করা যায় না। বিষয়বিশেষে অহৈতুকী প্রীতিই হচ্ছে আর্টের বীজ এবং সে বিষয়ে তন্ময় হতে না পার্‌লে সে বীজকে বৃক্ষে পরিণত কর্‌তে পারা যায় না। রবীন্দ্রনাথ কবিতায় আত্মপ্রকাশ করেন এবং সেই জন্যেই, অর্থাৎ তিনি আত্মগত ও আত্মায় তন্ময় হতে পারেন বলেই তাঁর কবিতায় চরম আর্টের সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। পদ্য হচ্ছে রবীন্দ্রনাথের গড়বার যন্ত্র আর গদ্য তাঁর ভাঙ্গবার অস্ত্র। তাঁর কবিতার ধর্ম্ম হচ্ছে সত্য শিবসুন্দরের প্রতিষ্ঠা করা আর তাঁর বিচারপ্রসঙ্গের ধর্ম্ম হচ্ছে অসত্য অশিব ও অসুন্দরের উচ্ছেদ করা। সুতরাং তাঁর প্রায় সকল গদ্য লেখাই উদ্দেশ্যমূলক, এবং তাঁর ছোট-বড় অনেক গল্পও একেবারে উদ্দেশ্যমুক্ত নয়। ম্যাথু আর্‌নল্‌ড যাকে Criticism of life বলেন,—রবীন্দ্রনাথের গল্প সাহিত্যে তা যথেষ্ট পরিমাণে আছে। কিন্তু কাব্য জীবনের শুধু শোধক নয়, জীবনের রসায়নও বটে। রবীন্দ্রনাথের গদ্য সাহিত্য যে কাব্যরসে পরিপুষ্ট, তার কারণ সে গদ্য কবির হাতের লেখা।

(৫)

এতক্ষণে বোধ হয় বুঝতে পার্‌ছ যে আমি বাংলার ভবিষ্যৎ সাহিত্যের দেহে কি রূপের ও অন্তরে কি গুণের সাক্ষাৎ লাভ কর্‌বার আশা মনে পোষণ করি। আমার বিশ্বাস, সে সাহিত্যে আনন্দ ও আর্ট দুই সমান ফুটে উঠবে—এ আশা করার কি বৈধ কারণ আছে, এখন সে বিষয়ে কিঞ্চিৎ আলোচনা করা যাক্।

১৯১৮ খৃষ্টাব্দের পয়লা জানুয়ারী তারিখে ইংরাজরাজ যে স্বরাজ্য আমাদের হাতে তুলে দেবেন, এ রকম বিশ্বাস কিংবা এ রকম আশা আমার মনের কোন কোণেও কোন দিন স্থান পায় নি; কেননা আমি সাহিত্যিক হলেও একেবারে বিষয়বুদ্ধিহীন নই। বৈষয়িক লোকেরাই যে আসলে বিষয়বুদ্ধিহীন তার প্রমাণ—আমাদের রাজ-নৈতিক দলের অনেক পাকা মাথার ভিতর এ আশা বাসা বেঁধেছে; অন্ততঃ এঁদের কথায় ত তাই মনে হয়। পরের কথায় নিজের মন কিংবা নিজের কথায় পরের মন ভোলানো আমার ব্যবসা নয়, সুতরাং এ কথা বল্‌তে আমি কিছুমাত্র কুণ্ঠিত নই যে, স্বরাজ্যে আমাদের পূর্ণাভিষেকের এখনও দেরি আছে—এখনও কিছুদিন ধরে আমাদের ইংলণ্ডের কাছে রাজনীতির শিক্ষানবীশি কর্‌তে হবে। তবে এমন কথাও শুন্‌তে পাই যে স্বরাজ্যের ঐ ষোল আনা দাবাটে হচ্ছে রাজনীতির প্রমারার তাড়া। হতে পারে যে আসলে ব্যাপারটা তাই—কিন্তু তাতে আমাদের লাভ কি? রাজনীতির জুয়োখেলে যখন রাজাধিরাজেরাই সর্ব্বস্বান্ত হয়ে পড়েন—তখন আমাদের পক্ষে সে খেলা খেল্‌তে যাওয়া বাতুলতা মাত্র। যদি রুষিয়া ও জার্ম্মণী পরস্পরকে প্রমারার তাড়া না মার্‌তেন তা হলে ইয়োরোপে এই আগুন জ্বলত না এবং তার ফলে এদের

সর্ব্বনাশও হত না। Czar ত ইতিমধ্যেই ফকির হয়েছেন এবং Kaiser ফতুর হবেন ;—দু'দিন পরে। আমাদের যখন কোন রকমে হাতের পাঁচ রাখা নিয়ে কথা, তখন আমাদের পক্ষে রাজনীতির বৈঠকে চিৎ-বিন্তি খেলাই বুদ্ধিমানের কর্ম্ম। যখন আমার বিশ্বাস যে, আকাশের চাঁদ খসে কাল আমাদের হাতে এসে পড়্‌বে না, তখন আমি আগামী যুগকে কেন নবযুগ বল্‌ছি সে কথাটা একটু পরিষ্কার করে বলবার চেষ্টা করা যাক্।

ভারতবর্ষ যদিও বর্ত্তমান যুগের রাত পোয়ালেই ক্যানেডা কিংবা অষ্ট্রেলিয়া হয়ে উঠ্‌বে না ; তবু তা এমন যায়গায় গিয়ে পৌঁছবে যেখানে আমরা নিজের শক্তিতে আমাদের স্বরাজ্য গড়ে তুল্‌তে পার্‌ব। এর চাইতে সু-খবর আর কি হতে পারে? আমরা এই মোটা কথাটা সদাই ভুলে যাই—যে স্বরাজ্য কিংবা স্বদেশ কোন জাতিই পড়ে পায় নি, সকল জাতিকেই তা নিজ হাতে গড়ে তুল্‌তে হয়েছে। দেশ বল্‌তে খানিকটা মাটি বোঝাতে পারে, কিন্তু সেই মাটিতে একমাত্র ভূমিষ্ঠ হবার কষ্ট স্বীকার কিংবা আরাম উপভোগ করে মানুষে সে দেশকে স্বদেশ করে তুল্‌তে পারে না। স্বদেশ বল্‌তে আমি বুঝি—সেই মহাবস্তু, দেশ নামক মাটির উপর, মানুষে মনপ্রাণ দিয়ে যা গড়ে তোলে। প্রথমটি হচ্ছে জড়-জগতের অন্তর্ভূত, দ্বিতীয়টি মনোজগতের একটা দেশের উপর একটা সমগ্র জাতে মিলে, নিজেদের দেহমনের বাসের জন্য যে ঘর বাঁধে, সেই ঘরই যথার্থ স্বদেশ। এ ঘরের উপকরণ হচ্ছে কৃষি, শিল্প, বেশভূষা, আচার ব্যবহার, কাব্যকলা, দর্শন, বিজ্ঞান ইত্যাদি ; অর্থাৎ এ সব উপকরণ মানুষকে নিজ মনে ও নিজ হাতে তৈরি করে নিতে হয়। এ বাসগৃহ একদিনে গড়া যায় না, এবং

একবার গড়ে তারপর চিরদিন আরামে ভোগ-দখলও করা যায় না। প্রতি যুগে এর জীর্ণ অঙ্গ ভাঙ্গতে হয়, আবার নূতন অঙ্গ গেঁথে তুলতে হয়। এবং সেই জাতিকেই মানুষে কৃতী বলে—যাদের হাতে মানুষের এই স্বহস্তরচিত গৃহের উদারতা ও উচ্চতা যুগের পর যুগে ক্রমে বেড়েই চলে। এক কথায় স্বদেশ জিওগ্রাফির নয়—হিষ্টিরির অধিকারভুক্ত। জিওগ্রাফি গড়ে প্রকৃতি, আর হিষ্টিরি গড়ে মানুষে।

এই হিষ্টিরি গড়বার স্বাধীনতাই মানুষের যথার্থ স্বাধীনতা। এ বিষয়ে উনবিংশ শতাব্দীতে ভারতবাসীর যে স্বাধীনতা ছিল, বিংশ-শতাব্দীতে তার চাইতে ঢের বেশী থাক্‌বে। লোকে যাকে রাজ-নৈতিক অধিকার বলে, সেটা হচ্ছে আসলে একটা জাতীয় দায়। আসছে যুগে স্বজাতির শাসন-সংরক্ষণের ভার কতটা জানি নে, কিন্তু অনেকটা ভারতবাসীর ঘাড়ে পড়্‌বে; এর ফলে আমাদের অপেক্ষা তোমাদের কাজের ক্ষেত্র ঢের বেশী বিস্তৃত ও বিচিত্র হবে। ভাগবান্ শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন, "কর্ম্মণ্যেবাধিকারস্তে"—জীবনের সকল ক্ষেত্রে তোমরা মানুষের সেই ভগবদ্দত্ত অধিকার লাভ করবে, অর্থাৎ তোমরা আবার মানুষ হবার অধিকার লাভ কর্‌বে।—এই লাভই ত মানুষের যথার্থ স্বরাজ্য লাভ।

এই বিশ্বাসের বলে আমি আশা করছি ভারতবর্ষের এই নব-যুগে তোমাদের জীবন নব-আনন্দে পূর্ণ হয়ে উঠ্‌বে; কেননা স্বাধীনভাবে কাজ কর্‌বার ভিতরই মানুষের আনন্দ, ভোগ কর্‌বার ভিতর আরাম থাক্‌তে পারে—আনন্দ নেই। কাব্য রচনা করে' কবি যে আনন্দ পান, কাব্য পাঠ করে পাঠক সে আনন্দ কখনই পেতে পারেন না। যে জাতি স্বদেশকে একটি মহাকাব্যের মত গড়ে তুল্‌তে ব্রতী হয়, সে

জাতি পায়ের নখ থেকে মাথার চুল পর্য্যন্ত একটা তীব্র আনন্দের প্রবাহ অনুভব করে। আমাদের নব-মহাভারতের আদিপর্ব্ব রচনার দায় তোমাদের উপরেই বর্ত্তাবে, অতএব তোমাদের জীবন কখনই নিরানন্দ হবে না, যদি না সে দায় তোমরা এড়াতে চেষ্টা করো। সুতরাং সে আনন্দ নবযুগের সাহিত্যে ব্যক্ত হতে বাধ্য। ·

তার পর তোমাদের পক্ষে, একাগ্রমনে আর্টের চর্চ্চা করাটা আবশ্যক; অতএব অবশ্য কর্ত্তব্য হয়ে পড়্‌বে। মানব-সভ্যতার প্রতি অবস্থারই কতকগুলি বিশেষ গুণ ও বিশেষ দোষ আছে, এবং জাতীয় সাহিত্যের সার্থকতা হচ্ছে, সেই গুণের অনুশীলনে ও সেই দোষের নিরাকরণে। যে ডিমোক্রাসির স্তুতিগানে দেশ আজ মুখরিত, সেই ডিমোক্রাসির অশেষ গুণের মধ্যে একটি মহা দোষ হচ্ছে তার ইতরতা। সাধারণতন্ত্র স্বাতন্ত্র্যের বিরোধী। সাম্যবাদীরা মানব-সমাজকে জীবনে সমবস্থ করে খুসী হন্ না, সেই সঙ্গে তাঁরা সকলকে মনেও সমধর্ম্মী করে তুল্‌তে চান; কেননা বৈচিত্রকে তাঁরা বৈষম্যজ্ঞানে নষ্ট কর্‌তে সদাই প্রস্তুত। মনোজগৎকে তাঁরা সমতল ভূমিতে পরিণত কর্‌তে চান,—তাঁদের ধারণা এ পৃথিবীটে গোচারণের মাঠ হলেই তা ভূ-স্বর্গ হয়ে উঠ্‌বে। পৃথিবীতে অবশ্য যা শ্রেষ্ঠ তাই অসাধারণ। ডিমোক্রাসি অসাধারণতার বিপক্ষ ব'লে, কাব্য ও কলার পরিপন্থী; কেননা কাব্য ও কলা হচ্ছে শ্রেষ্ঠ মনের সৃষ্টি। ডিমোক্রাসির ইতরতার একমাত্র কাটান হচ্ছে আর্ট; কেননা একমাত্র আর্টের সাহায্যে মানবজাতি তার ভাবের ও কর্ম্মের অভিজাত্য রক্ষা করতে পারে। সুতরাং নব-যুগের সাহিত্য তার অভিজাত্য রক্ষা কর্‌বার জন্য, সজ্ঞানে আর্টের চর্চ্চা কর্‌তে বাধ্য। আমি সজ্ঞানে বল্‌ছি এই কারণে যে, আমার বিশ্বাস এ যুগের

সাহিত্য গদ্যপ্রধান হয়ে উঠ্‌বে। গদ্য হচ্ছে ব্যবহারিক জীবনের ভাষা—সুতরাং সে ভাষার ইতর হয়ে পড়্‌বার দিকে একটা জন্ম-সুলভ ঝোঁক আছে—এ ঝোঁকের হাত থেকে তাকে বঁচা'বার জন্য লেখকদের সদাসর্বদা সতর্ক ও সচেতন থাক্‌তে হবে। ডিমোক্রাসির যুগ utilitarianism সাধারণের মনের উপর—রাজার মত প্রভুত্ব করে, সুতরাং সে যুগের মানবাত্মার মুক্তির বাণী হচ্ছে art for art's sake যেমন theocracy-র যুগে মুক্তির বাণী হচ্ছে truth for truth's sake. আশা করি তোমাদের "নববাণী" এই নব-যুগের আনন্দ ও আর্টের বাণী হবে। আমার শেষ কথা এই যে, "যোগস্থঃ কুরু কর্ম্মাণি সঙ্গং ত্যক্ত্বা ধনঞ্জয়"—গীতার এ আদেশ শুধু যুদ্ধক্ষেত্রে নয়, সাহিত্য-ক্ষেত্রেও শিরোধার্য্য; কেননা সিদ্ধিলাভের ঐ হচ্ছে একমাত্র উপায়।

রাঁচি
৮ই কার্ত্তিক, ১৩২৪।

শ্রীপ্রমথ চৌধুরী।

বালাই

—:০:—

মাঘ মাস—শীতটা কমে আসছিল এমন সময়ে বাদলা নামল। এমন দিনে কোথাও যাওয়া আসা করা আরামের না হলেও সেদিন ভোর ছটায় আমাকে গাড়ী ধরতে হ'ল—বাড়ী যেতে হবে। সুখের মধ্যে গাড়ীতে ভিড় ছিল না—একজন মাত্র কথা কবার লোক কামরায় ছিলেন।

লোকটী ইন্‌সিওরেন্সের দালাল। ক্রমে পরিচয় হ'ল ও কথায় কথায় অর্দ্ধেক পথ যে কোথা দিয়ে কেটে গেল তা বুঝতেও পারলাম না। বুঝতে পারলাম যখন নৈহাটী এসে গাড়ী থামল ও সশব্দে গাড়ীর দরজা খুলে একটী হ্যাটকোটধারী ভদ্রলোক সস্ত্রীক সবেগে গাড়ীতে উঠলেন।

লটবহর ওঠানর হাঙ্গামা ও মুটের সঙ্গে বকাবকিতে আমাদের আলাপ স্তম্ভিত হয়ে গেল। ইতিমধ্যে দোর দিয়ে হু হু করে বৃষ্টির ছাঁট ও শীতের হাওয়া গাড়ীর মধ্যে ঢুকছিল। ভদ্রলোকটী বীরের মত দোরের কাছে দাঁড়িয়ে ছিলেন—over coat-এর ওপর তাঁর বর্ষাতি মোড়া। ফুঁকো হাওয়া বা বাদলের ধারা তাঁকে একটুও টলাতে পারল না কিন্তু বর্ম্মচর্ম্মহীন আমার বুকটা গুরগুর করে উঠছিল।

গাড়ী ছাড়তে ছাড়তে দালাল বাবুটী নবাগতের সঙ্গে আলাপ সুরু করে দিলেন—"কোথায় যাবেন মশাই ?"

"চাঁদপুর।"

"বহুদূর যে!"

কথায় যোগ দেবার জন্য আমি বলে উঠলাম—"অনুপ্রাসের অট্টহাসি শোনা যাচ্চে", কিন্তু আমার রসিকতার চেষ্টা যে ব্যর্থ হয়েছে চোরা চাহনিতে সে খবরটা জানিয়ে, ভদ্রলোক তাঁর দালাল বন্ধুর দিকে চেয়ে একটু মুচকে হেসে বললেন—হাঁ একটু দূর বটে।

"কিন্তু এমন দিনে বেরোলেন যে? একে দূরের পথ তাতে এই দুর্য্যোগ আবার মেয়েছেলে সঙ্গে রয়েছেন"—

"কি করি মশাই ভাল দিনের জন্য আজ পাঁচ পাঁচ দিন এখানে বসে!"—ভদ্রলোকটীর প্রতি আমার মন প্রসন্ন হতে পারে নি। তাঁকে আঘাত করবার একটা সুযোগ তাই আমি অবহেলা করতে পারলাম না—বললাম "তাই বুঝি বেছে বেছে এই ত্রেস্পর্শ নিয়ে বেরোলেন?"

ত্রেস্পর্শ কি বলচেন মশাই!

"আমি বলচি নে—আপনার বন্ধুই বলচেন। দূর দুর্য্যোগ ও দয়িতা মিলে অঙ্কশাস্ত্রের নিয়মেই ত্রেস্পর্শ হয়েছে আমার কথায় হয় নি।"

ভদ্রলোক একটু মুরুব্বিয়ানা ভাবে হাসতে হাসতে বললেন—"কিন্তু মশাই কি জানেন যে যাত্রার এমন দিন সচরাচর পাওয়া যায় না?"

"না পাওয়া যাবারই কথা। শীতকালের দিনে এমন বাদলা কচিৎ দেখতে পাওয়া যায়। তবে এমন দিন যে যাত্রার পক্ষে এত উপাদেয় তা জানা ছিল না।"

"পাঁজিখানা দেখলে আর ওকথা বলতেন না"—

"না আমি পাঁজি দেখি নি। দরকার হল বেরিয়ে পড়লাম"—

"পাঁজি ফাঁজি দেখেন নি। তাই খামকা বলে দিলেন যে দিনটা খারাপ। নিজে দেখেছি ত পাঁজি, তবু কথাটা শুনে বুকটা ধড়াস্ করে উঠেছে। তেরস্পর্শ এমনি জিনিস।"

"পাঁজি দেখিনি বটে কিন্তু দিনটা সকাল থেকেই দেখে আসচি। জানা ছিল তেরস্পর্শ খুব খারাপ দিন তাই ভাবলাম যে আজ তেরস্পর্শ না হয়ে যায় না বিশেষ আপনার পক্ষে।"

ভদ্রলোক উত্তর করবার আগেই দালাল বাবুটী বললেন— "পাঁজিতে যখন যাত্রা লিখেছে তখন দিন ভাল হতেই হবে। কিন্তু আমি বলছিলাম কি, যে বারটা যেন একটু কেমন কেমন বোধ হচ্চে না দাদা?" মেয়েরা বলে রবিবারে—

আপনিও তাই বলেন নাকি? লেখাপড়া শিখেও ও-সব মেয়েলি শাস্ত্র মানেন আপনি?

দালাল বাবুটি আর কথা কইতে পারলেন না—একেবারে এতটুকু হ'য়ে গেলেন। তাঁর হ'য়ে একটা কথা তাই আমাকে বলতে হ'ল— "মেয়েলী শাস্তর না হয় আপনারা মানলেন না কিন্তু মেয়েরাও যদি পৌরুষী শাস্ত্র না মানেন?"

ভদ্রলোক পরম বিজ্ঞভাবে উত্তর করলেন—"তাতে সুবিধা নেই মশাই তাতে সুবিধা নেই। সুবিধা হচ্চে শাস্ত্র মেনে চলায়। মেয়েরা সেটা বেশ বোঝেন—তাই আমাদের চেয়ে শাস্ত্র তাঁরাই বেশী মানেন। আপনি কি বলেন মশাই?"

ভদ্রলোক তাঁকে এই মধ্যস্থ মানায়, দালাল বাবুটি নিতান্ত আপ্যায়িত হলেন বলে বোধ হল; তাই তিনি অত্যন্ত তাড়াতাড়ি বলে ফেল্লেন—"নিশ্চয়ই তা আর বলতে।"

"তা হতে পারে কিন্তু সুবিধার হিসাবে যে তাঁরা শাস্ত্র মানেন এ কথা বলা যায় কি?"

"তবে কি হিসেবে তাঁরা শাস্ত্র মানেন মনে করেন আপনি?"

"হিসেব ত পড়েই রয়েছে। এই ধরুন আপনার গায় জামাজোড়া যথেষ্ট রয়েছে দুর্য্যোগ আপনাকে পোয়াতে হচ্চে না, কিন্তু ভিজে শাল-খানি জড়িয়ে খালি পায়ে আপনার স্ত্রী দেখুন এখনো কাঁপচেন। সুবিধার হিসাব"—

আমার কথা শেষ করতে না দিয়ে দালাল বলে উঠলেন—না মশাই আপনি যদি আমাদের মেয়েদের জুতো মোজা পরাতে চান তবে আপনার সঙ্গে আমার মতের মিল নেইও হবেও না। পরে ভদ্র-লোকটীর দিকে ফিরে বললেন—"আমি কেবল বলছিলাম যে মেয়ে-ছেলেদের নিয়ে এই দুর্য্যোগ।"

ভদ্রলোক একটু বিরক্ত ভাবেই বলে উঠলেন—"দুর্য্যোগ কি বলচেন মশাই—গাড়ীর মধ্যে আবার দুর্য্যোগ কি? এ কি গরুর গাড়ী? আর রবিবার ফবিবার যা বলচেন স্বামীর সঙ্গে যেতে তা বাছতে হয় না।"

"ও: তাও ত বটে—ঠিকই ত। স্বামীর সঙ্গে যেতে ত ওসব কিছুই বাছতে হয় না—স্বামীর সঙ্গে সহমরণ পর্য্যন্ত যাওয়া যায় এ ত শুধু সহগমন।"

কথাটা শুনে লালাল হেসে ফেলছিলেন কিন্তু ভদ্রলোকটীকে হটাৎ গম হ'য়ে যেতে দেখে, শেষে এমনি গম্ভীর ভাবে তিনি টাইমটেবল দেখতে আরম্ভ করলেন যে তাঁর সঙ্গে কথা বলতে আমি সাহস করলাম না। অতঃপর রাণাঘাটে গাড়ী থামলে যখন আমি দু'জনকে নমস্কার জানিয়ে নেমে পড়লাম তখন দু'জনের কেউই আমায় তা ফিরিয়ে দিলেন না।

শ্রীপ্রবোধ ঘোষ।

তোতা কাহিনী।

——ঃ০ঃ——

(১)

এক যে ছিল পাখী। সে ছিল মূর্খ। সে গান গাহিত, শাস্ত্র পড়িত না। লাফাইত, উড়িত; জানিত না কায়দা কানুন কাকে বলে।

রাজা বলিলেন, "এমন পাখী ত কাজে লাগে না, অথচ বনের ফল খাইয়া রাজহাটে ফলের বাজারে লোকসান ঘটায়।"

মন্ত্রীকে ডাকিয়া বলিলেন, "পাখীটাকে শিক্ষা দাও!"

(২)

রাজার ভাগিনাদের উপর ভার পড়িল পাখীটাকে শিক্ষা দিবার।

পণ্ডিতেরা বসিয়া অনেক বিচার করিলেন। প্রশ্নটা এই, "উক্ত জীবের অবিদ্যার কারণ কি?"

সিদ্ধান্ত হইল, সামান্য খড়কুটা দিয়া পাখী যে-বাসা বাঁধে, সে-বাসায় বিদ্যা বেশী ধরে না। তাই সকলের আগে দরকার ভালো করিয়া খাঁচা বানাইয়া দেওয়া।

রাজপণ্ডিতেরা দক্ষিণা পাইয়া খুসি হইয়া বাসায় ফিরিলেন।

(৩)

স্যাকরা বসিল সোনার খাঁচা বানাইতে। খাঁচাটা হইল এমন আশ্চর্য্য যে, দেখিবার জন্য দেশ বিদেশের লোক ঝুঁকিয়া পড়িল। কেহ বলে, "শিক্ষার একেবারে হদ্দমুদ্দ!" কেহ বলে "শিক্ষা যদি নাও হয়, খাঁচা ত হইল। পাখীর কি কপাল!"

স্যাকরা থলি বোঝাই করিয়া বক্‌শিস্‌ পাইল। খুসি হইয়া সে তখনি পাড়ি দিল বাড়ির দিকে।

পণ্ডিত বসিলেন পাখীকে বিদ্যা শিখাইতে। নস্য লইয়া বলিলেন "অল্প পুঁথির কর্ম্ম নয়।"

ভাগিনা তখন পুঁথি-লিখকদের তলব করিলেন। তারা পুঁথির নকল করিয়া এবং নকলের নকল করিয়া পর্ব্বতপ্রমাণ করিয়া তুলিল। যে দেখিল সেই বলিল, "সাবাস! বিদ্যা আর ধরে না!"

লিপিকরের দল পারিতোষিক লইল বলদ বোঝাই করিয়া। তখনি ঘরের দিকে দৌড় দিল। তাদের সংসারে আর টানাটানি রহিল না।

অনেক দামের খাঁচাটার জন্য ভাগিনাদের খবরদারির সীমা নাই। মেরামত ত লাগিয়াই আছে। তারপরে ঝাড়া মোছা পালিস করার ঘটা দেখিয়া সকলেই বলিল, "উন্নতি হইতেছে!" লোক লাগিল বিস্তর এবং তাদের উপর নজর রাখিবার জন্য লোক লাগিল আরো বিস্তর। তারা মাস-মাস মুঠা-মুঠা তনখা পাইয়া সিন্ধুক বোঝাই করিল।

তারা এবং তাদের মামাতো খুড়তুতো মাসতুতো ভাইরা খুসি হইয়া কোঠা বালাখানায় গদি পাতিয়া বসিল।

(৪)

সংসারে অভাব অনেক আছে, কেবল নিন্দুক যথেষ্ট। তারা বলিল, "খাঁচাটার উন্নতি হইতেছে কিন্তু পাখীটার খবর কেহ রাখে না।"

কথাটা রাজার কানে গেল। তিনি ভাগিনাকে ডাকিয়া বলিলেন, "ভাগিনা, এ কি কথা শুনি ?"

ভাগিনা বলিল, "মহারাজ, সত্য কথা যদি শুনিবেন তবে ডাকুন স্যাক্‌রাদের, পণ্ডিতদের, লিপিকরদের, ডাকুন যারা মেরামত করে এবং মেরামত তদারক করিয়া বেড়ায়। নিন্দুকগুলো খাইতে পায় না বলিয়াই মন্দ কথা বলে।"

জবাব শুনিয়া রাজা অবস্থাটা পরিষ্কার বুঝিলেন আর তখনি ভাগিনার গলায় সোনার হার চড়িল।

(৫)

শিক্ষা যে কি ভয়ঙ্কর তেজে চলিতেছে রাজার ইচ্ছা হইল স্বয়ং দেখিবেন। একদিন তাই পাত্রমিত্র অমাত্য লইয়া শিক্ষাশালায় তিনি স্বয়ং আসিয়া উপস্থিত।

দেউড়ির কাছে অমনি বাজিল শাঁখ ঘণ্টা ঢাক ঢোল কাড়ানাকড়া তূরী ভেরি দামামা কাঁশি বাঁশি কাঁসর খোল করতাল মৃদঙ্গ জগঝম্প। পণ্ডিতেরা গলা ছাড়িয়া টিকি নাড়িয়া মন্ত্রপাঠে লাগিলেন। মিস্ত্রি মজুর স্যাকরা লিপিকর তদারকনবিশ আর মামাতো পিস্‌তুতো খুড়তুতো এবং মাস্‌তুতো ভাই জয়ধ্বনি তুলিল।

ভাগিনা বলিল, "মহারাজ, কাণ্ডটা দেখিতেছেন!"

মহারাজ বলিলেন, "আশ্চর্য্য! শব্দ কম নয়!"

ভাগিনা বলিল, "শুধু শব্দ নয় পিছনে অর্থও কম নাই।"

রাজা খুসি হইয়া দেউড়ি পার হইয়া যেই হাতিতে উঠিবেন এমন সময়, নিন্দুক ছিল ঝোপের মধ্যে গা-ঢাকা দিয়া, সে বলিয়া উঠিল, "মহারাজ, পাখীটাকে দেখিয়াছেন কি?"

রাজার চমক লাগিল, বলিলেন, "ঐ যা! মনে ত ছিল না! পাখীটাকে দেখা হয় নাই।"

ফিরিয়া আসিয়া পণ্ডিতকে বলিলেন, "পাখীকে তোমরা কেমন শেখাও তার কায়দাটা দেখা চাই!"

দেখা হইল। দেখিয়া বড় খুসি! কায়দাটা পাখীটার চেয়ে এত বেশি বড় যে, পাখীটাকে দেখাই যায় না, মনে হয় তাকে না দেখিলেও চলে। রাজা বুঝিলেন, আয়োজনের ত্রুটি নাই। খাঁচায় দানা নাই পানি নাই, কেবল রাশি রাশি পুঁথি হইতে রাশি রাশি পাতা ছিঁড়িয়া কলমের ডগা দিয়া পাখার মুখের মধ্যে ঠাসা হইতেছে। গান ত বন্ধই—চীৎকার করিবার ফাঁকটুকু পর্য্যন্ত বোজা। দেখিলে শরীরে রোমাঞ্চ হয়।

এবারে রাজা হাতিতে চড়িবার সময় কান-মলাবর্দ্দারকে বলিয়া দিলেন নিন্দুকের যেন আচ্ছা করিয়া কান মলিয়া দেওয়া হয়।

(৬)

পাখীটা দিনে দিনে ভদ্র দস্তুর মত আধমরা হইয়া আসিল। অভিভাবকেরা বুঝিল বেশ আশাজনক। তবু স্বভাবদোষে সকালবেলার

আলোর দিকে পাখী চায় আর অন্যায়রকমে পাখা ঝট্‌পট্‌ করে। এমন কি, এক-একদিন দেখা যায় সে তার রোগা ঠোঁট দিয়া খাঁচার শলা কাটিবার চেষ্টায় আছে।

কোতোয়াল বলিল, "একি বেয়াদবি!"

তখন শিক্ষামহালে হাপর হাতুড়ি আগুন লইয়া কামার আসিয়া হাজির। কি দমাদ্দম পিটানি! লোহার শিকল তৈরি হইল পাখীর ডানাও গেল কাটা।

রাজার সম্বন্ধীরা মুখ হাঁড়ি করিয়া মাথা নাড়িয়া বলিল, "এ রাজ্যে পাখীদের কেবল যে আক্কেল নাই তা নয়, কৃতজ্ঞতাও নাই।"

তখন পণ্ডিতেরা এক হাতে কলম এক হাতে সড়কি লইয়া এম্‌নি কাণ্ড করিল যাকে বলে শিক্ষা!

কামারের পসার বাড়িয়া কামার-গিন্নির গায়ে সোনাদানা চড়িল এবং কোতোয়ালের হুসিয়ারি দেখিয়া রাজা তাকে শিরোপা দিলেন।

(৭)

পাখীটা মরিল।

কোন্‌কালে যে কেউ তাঠাহর করিতে পারে নাই। নিন্দুক লক্ষ্মীছাড়া রটাইল, "পাখী মরিয়াছে।"

ভাগিনাকে ডাকিয়া রাজা বলিলেন, "ভাগিনা, এ কি কথা শুনি?"

ভাগিনা বলিল, "মহারাজ, পাখীটার শিক্ষা পুরো হইয়াছে।"

রাজা শুধাইলেন, "ও কি আর লাফায়?"

ভাগিনা বলিল, "আরে রাম!"

"আর কি ওড়ে ?"

"না।"

"আর কি গান গায় ?"

"না।"

"দানা না পাইলে আর কি চেঁচায় ?"

"না।"

রাজা বলিলেন, "একবার পাখীটাকে আন ত, দেখি।"

পাখী আসিল। সঙ্গে কোতোয়াল আসিল, পাইক আসিল, ঘোড়-সওয়ার আসিল। রাজা পাখীটাকে টিপিলেন। সে হাঁ করিল না, হুঁ করিল না। কেবল তার পেটের মধ্যে পুঁথির শুকনো পাতা খস্‌খস্ গজ্‌গজ্ করিতে লাগিল।

বাহিরে নববসন্তের দক্ষিণ হাওয়ায় কিশলয়গুলি দীর্ঘনিঃশ্বাসে মুকুলিত বনের আকাশ আকুল করিয়া দিল।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

ফাল্গুন, ১৩২৪

সবুজ পত্র

সম্পাদক

শ্রীপ্রমথ চৌধুরী

বার্ষিক মূল্য দুই টাকা ছয় আনা।
সবুজ পত্র কার্য্যালয়, ৩ নং হেষ্টিংস্ ষ্ট্রীট,
কলিকাতা।

কলিকাতা।
৩ নং হেষ্টিংস্ ষ্ট্রীট।
শ্রীপ্রমথ চৌধুরী এম্, এ, বার-য়্যাট-ল কর্ত্তৃক
প্রকাশিত।

কলিকাতা।
উইক্লী নোট্স প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্,
৩ নং হেষ্টিংস্ ষ্ট্রীট।
শ্রীসারদা প্রসাদ দাস দ্বারা মুদ্রিত।

বেহিসাবের নিকাশ।

—:o:—

সুখস্পৃহা জীবের পক্ষে যতই স্বাভাবিক হোক না কেন, সঞ্চয়-প্রবৃত্তি মানুষের সহজ কিনা—সে বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহের অবকাশ আছে। উক্ত প্রবৃত্তির প্রচারকল্পে পণ্ডিতেরা যখন মধুমক্ষিকা আর পিপীলিকার দৃষ্টান্ত দিয়ে বিমুখ বা সন্দিগ্ধ মনকে অনুপ্রাণিত করতে প্রয়াস পান তখন সঞ্চয়ী লোকের হুল এবং বিষ সম্বন্ধেও কারো কারো মনে স্বতঃই একটা অনুসন্ধিৎসা জেগে ওঠে।

প্রাণিজগতের ঐ সব স্বভাব-সঞ্চয়ী অধিবাসীবৃন্দের পদমর্য্যাদা মানুষের চেয়ে এত বেশী, আর তাদের সঙ্গে আমাদের প্রকৃতিগত এতই বৈষম্য যে, তাদের সংস্কারগত সঞ্চয়পটুতার অনুকরণপ্রয়াসে আমাদের পক্ষে সম্যক সফল-কাম হবার সম্ভাবনা অতি কম! জন্মান্তরীণ সংস্কারের বশে যদিই বা কেউ এ কার্য্যে কতকটা সফলতা লাভ করতে সমর্থ হন, তা হলেও সমাজের দিক দিয়ে তার মূল্য যে কেমনতর, আর কতটা—তা নিয়ে তর্ক উঠ্‌বার বিলক্ষণ সম্ভাবনা রয়েছে! হুলের ঘা মধুর প্রলেপে সারে কিনা—সমাজ-বৈদ্যগণ এখনও তা ঠিক করে উঠ্‌তে পারেন নি। সেইজন্যেই হয়ত এবেলা ওবেলা তাঁদের ব্যবস্থা বদ্‌লাচ্ছে। কখনো পিঠে হাত বুলিয়ে শিখাচ্ছেন—"সঞ্চয়ী লোক সুখে থাকে", আবার পরক্ষণেই কানে পাক্ দিয়ে বুঝিয়ে দিচ্ছেন—"অর্থই অনর্থের মূল! "সভাপর্ব্বের"

পরে "বনপর্ব্বের" অবতারণা করছেন ;—"অশ্বমেধের" ঘটার পরে "স্বর্গারোহণের" অন্তর্জ্জলীর ব্যবস্থা দিচ্ছেন !

এই সব অব্যবস্থিততা এবং অনবস্থিতি দেখে শুনে পণ্ডিতেরা সুখদুঃখময় সংসারটাকে চাকার সাথে উপমিত করে' নানান্ ভাষায় নানান্ ছাঁদে যে সব দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন, বলা বাহুল্য, মীমাংসা তাতে কিছুই এগোয় নি—বরং পিছিয়েছে। অপণ্ডিতেরা তর্ক তুলছে—চাকাই বা হতে গেল কেন ? নৌকাও ত হতে পারত ! তাহলে ত গড়্‌গড়িয়ে না গিয়ে দিব্যি তর্‌তরিয়ে সর্‌সরিয়ে চল্‌ত ! দুঃখের ধূলা-কাদায় অমন নাস্তানাবুদ হয়ত হত না !

মানুষের মনে সঞ্চয়-প্রবৃত্তিটার আরোপ নিশ্চয়ই আদিযুগের কোনো এক বিশ্বামিত্রের কাজ। এতে যদি ঈশ্বরের হাত থাক্‌ত তাহলে কি যুগে যুগে দেশে দেশে তাঁর যে সব ওয়ারীশ বা সরিক অবতীর্ণ হয়ে তাঁদের স্বত্ব প্রতিষ্ঠিত করে গেছেন—তাঁরা এর পরে এত বিরক্তি দেখাতে পারতেন ? মহর্ষির অভিপ্রায় সম্ভবতঃ মন্দ ছিল না ! কিন্তু যা শাশ্বত নয় কালের বশে তার প্রয়োজনের পরিবর্ত্তন হবেই হবে ! সভ্যতার উন্মেষ-উষায় যখন শীতের কাপড়ের চেয়ে শীতের কাঁপুনি অনেক গুণে বেশী ছিল—তখনকার দিনের রোদে পিঠ দিয়ে বসার সার্থকতা এখনকার সামাজিক মধ্যাহ্নে আর ত নেই ! তাতে এখন শুধু স্বাস্থ্যহানি আর বর্ণকালিই সার হবে ! এখন এই দীপ্ত মধ্যাহ্নে "সঞ্চয়ী লোক সুখে থাকে" এ মন্ত্রের পরিবর্ত্তন করে এমন কোনো মন্ত্রের প্রতিষ্ঠা কর্‌তে হবে যাতে এই প্রখর রশ্মিজ্বালা প্রত্যাহত হয়ে মৃদু আলোকমালায় পরিণত হতে পারে !

(২)

ভবিষ্যতের চিন্তা মানুষের পক্ষে অপরিহার্য্য, এবং সেদিক দিয়ে দেখতে গেলে ভবিষ্যতের জন্যে সংস্থান-প্রয়াসও যে অবশ্যকরণীয় সে বিষয়ে ত কোনো প্রশ্নই উঠ্‌তে পারে না! কিন্তু ব্যক্তিগত জীবনে সঞ্চয়-প্রবৃত্তির প্রশ্রয় দিলেই যে উক্ত সামাজিক সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে—এমন মনে না করবারও যথেষ্ট হেতু রয়েছে! আমরা প্রত্যেকেই যদি নিজের নিজের কোলে ঝোল টান্‌তে সুরু করি তাহলে, খুব সম্ভব, ঝোলে অচিরেই টান পড়বে। কারণ, বর্ত্তমানের ক্ষিদের চেয়ে ভবিষ্যতের লোভ অনেক বেশী। প্রত্যেকেই যদি আমরা স্বতন্ত্রভাবে আমাদের অন্ধকার ভবিষ্যৎকে রূপচাঁদের আভায় ফুট্‌ফুটে কর্‌তে প্রয়াস পাই তাহলে অনেকের ভাগ্যেই চিরকাল সর্‌ষের ফুল দর্শন অনিবার্য্য হয়ে উঠ্‌বে। কারণ সঞ্চয়ের প্রবৃত্তি এবং সুযোগের সম্মিলন আমাদের ভিতরে যাঁর ভাগ্যে জুটবে উক্ত লোভনীয় কার্য্যে "ইতি" দেবার প্রয়োজনীয়তা কখনো তিনি অনুভব কর্‌বেন না।

বর্ত্তমানের সম্ভোগ যতই বেহিসাবী হোক না তার একটা সীমা থাকবেই—পেটুকের পেট না ভরলেও তার চোয়াল ধরবে—কিন্তু ভবিষ্যতের সঞ্চয় হচ্ছে অনেকটা অদৃষ্টকে শৃঙ্খলিত করবার চেষ্টা; পুরুষপরম্পরাক্রমে করলেও কোনো দিনও তার পরিসমাপ্তির সম্ভাবনা নেই।

ব্যক্তিবিশেষের অপরিমিত অর্থসঞ্চয়-চেষ্টা যে জাতীয় ধনভাণ্ডার হতে চুরির প্রয়াস সে কথা একটু তলিয়ে দেখলেই বোঝা যাবে। সমাজের ডালপালা ছেঁটে, তার গলা চেঁচে সঞ্চয়ের হাঁড়ি ঝুলিয়ে দিলে

অনতিবিলম্বেই যে তা তাড়ি হয়ে উঠ্‌বে—সে ত অতি সুনিশ্চিত! হয়েছেও তাই! এ সামাজিক অকল্যাণ দূর কর্‌তে হলে ব্যক্তিগত জীবনকে তথাকথিত সঞ্চয়ের নেশা থেকে মুক্ত রাখা একান্ত প্রয়োজন। যত দিন না সঞ্চয়-প্রবৃত্তির একটা নবতর সংস্করণ সমাজে প্রতিষ্ঠিত হবে ততদিন "সঞ্চয়ী লোক সুখে থাকে" আর "চুরিবিদ্যা বড়বিদ্যা" এ দুটী কথায় সময়ে সময়ে বিশেষ কোনোই তফাৎ থাকবে না।

অনেক সময়ে শুন্‌তে পাওয়া যায় মানুষের মনে সঞ্চয়-প্রবৃত্তির আধিক্যের ফলেই শিল্প, বাণিজ্য, রাষ্ট্র আদি করে সর্ব্ব বিষয়েই মানুষ আজ এত উন্নত। একথা ঠিক নয়! পারিপার্শ্বিককে ছাড়িয়ে উঠবার একটা সহজ প্রেরণা জীবমাত্রেরই ভিতরে আছে। ঈশ্বরেচ্ছায় মানুষেতে এর চরম অভিব্যক্তি ঘটেছে। তারি উম্মাদনাতেই মানুষ নিজের মনুষ্যত্ব সব দিক দিয়ে প্রতিপন্ন না করে' স্থির থাক্‌তে পারে নি! মানব-সভ্যতার বস্তু আর ছন্দ দুইই নিতান্ত বেহিসাবের মধ্যে দিয়ে গড়ে উঠেছে। হিসাব মাঝে মাঝে তাতে সুর যোজনা করেছে মাত্র। (আর তা যে অধিকাংশ স্থলেই বেসুরো বাজ্‌ছে—সে কথা বুঝতে হলে হিসাবের কানমলা থেকে কান বাঁচিয়ে চলা নিতান্ত দরকার)—মানুষের স্বাভাবিক চয়ন-লীলার পরে একটা সুদীর্ঘ ষট্‌পদী হিসাবের উপসর্গ চেপেই সঞ্চয়লোলুপতার সৃষ্টি করেছে। চড়নদারকে ঘোড়ার মালিক বলে' মনে কর্‌লে অনেক সময়েই ভুলের সম্ভাবনা থাকে—এ ক্ষেত্রেও আমাদের তাই হয়েছে।

সঞ্চয়ের ধর্ম্মই হচ্ছে বর্ত্তমানের বিকাশ এবং ব্যাপ্তির যে মূল্য, যে পাথেয় তাই জমিয়ে ভবিষ্যতের জন্যে পথ্যের সংস্থান। এ যেন

শিশুর আটকড়াই থেকে খই চিড়ে তার ভাবী শ্মশান-বন্ধুদের জন্যে তুলে রাখবার ব্যবস্থা। বলা বাহুল্য, এমন হিসাবী অভিভাবকের হাতে পড়লে সমাজ-শিশুর ভবিষ্যৎ একটুও আশাপ্রদ হত না। কিন্তু সুখের বিষয় তা পড়ে নি। হিসাবী লোক কি কখনো "ঘরের খেয়ে বনের মহিষ" নিরর্থক তাড়াতে যায়? পুষ্করিণীর মৎস্য তার চেয়ে ঢের বেশী উপাদেয় এবং নিরাপদও বটে। আশু চক্রবৃদ্ধির আশা না থাক্‌লে হিসাবী লোক কোনো কাজে হস্তক্ষেপ করা যুক্তিযুক্ত মনে করে না। এমন কি রাঁধা-মাছ মার্‌তে পার্‌লে পুকুরের ধারেও যেতে চায় না। কাজেই এ হেন হিসাবী-তথা-সঞ্চয়ী লোকের কর্ম্ম-প্রচেষ্টার ফলেই মানব-সভ্যতার বিকাশ হয়েছে একথা অনেকটা কাকের ডাকাডাকিতেই ভোর এসেছে বলার মতই সুসঙ্গত।

(৩)

মানব-সভ্যতাটা অভাবের তাড়নায় গড়ে ওঠে নি—ওবস্তু স্বভাবের-প্রেরণাতেই ফুটে উঠেছে। অভাবই যদি কর্ম্মের পক্ষে যথেষ্ট উদ্দীপনা হ'তো তা' হ'লে খুব সম্ভব হাঁসেরা আজ পুকুর কাটতে শিখত; গরুরা কেবলি জাবর না কেটে মাঝে মাঝে আঁটি আঁটি ঘাসও হয়ত কাট্‌ত—আরো কত কি হ'তো! কিন্তু তা হয় নি—কারণ, ইতর জীবের অভাবের তাড়নার তুলনায় স্বভাবের প্রেরণা নিতান্তই অস্পষ্ট!—আর মানুষের অনেকটা তার বিপরীত। মানুষ শুধু অভাব মেটায় না নূতন নূতন সৃষ্টিও করে। এমন ধারা সৃষ্টি কার্য্যে তার যে খরচ তা' যে নিতান্তই বেহিসাবের বাজে খরচ সে কথা অস্বীকার করা চলে না!

মানব-সভ্যতার নব নব বিকাশশীলতা, নিত্যনব উদ্ভাবনপ্রবণতা ত' চিরদিনই এমনিধারা বেহিসাবের অমৃতে অভিষিক্ত হয়ে আসছে। হিসাবের উচ্ছিষ্টে নিশ্চয়ই তার পুষ্টি হয় নাই। ব্যক্তিগত হিসাব-প্রবৃত্তি আর সহজ সামাজিক বেহিসাবের দ্বন্দ্বে যখন হিসাব জয়ী হয়—মানুষের মনুষ্যত্ব স্বতঃই মলিন হয়ে পড়ে।—প্রাথমিক-শিক্ষার অবাধ প্রচলনের প্রস্তাবের সাথে সাথেই তখন চাকর মজুরের সম্ভাবিত দুর্ম্মূল্যতার আর রায়েত-জনের অবশ্যম্ভাবী অবাধ্যতার আশঙ্কা আসে। হিসাব ত' চিরদিনই সমাজের পকেট সংস্করণের জন্যেই আগ্রহ দেখিয়েছে।—সমাজের কপালে রাজার টীকা সে ত' বেহিসাবেরই আঙ্গুল-কাটা রক্তের টিপ্‌!

বেহিসাবের আতিশয্যের উত্তেজনায় যদি কেউ আঙ্গুল না কেটে নিজের গলাও কেটে বসে তাতে তার ব্যক্তিগত যতই ক্ষতি হোক না, সমাজের উন্নতি-স্রোতে তা' জলবিম্বের মতই নির্ব্বিবাদে মিশে যাবে। আর, বেহিসাবের প্রতি বীতরাগ হয়ে সমাজে যদি কেবলি সঞ্চয়-প্রবৃত্তির বীজ বপনের কাজ চল্‌তে থাকে তা' হ'লে খুব সম্ভব অদূর ভবিষ্যতে অনেকেই নিজের আঙ্গুল নিরাপদ করতে পরের গলায় ছুরি বসাবে। হত্যা আর আত্মহত্যা এতদুভয়ের কোনোটিই বরণীয় না হ'লেও দুটাই সমান দূষণীয় নয়। বেহিসাবের অবিবেচনার প্রশমন কল্পে সমাজে সঞ্চয়ের কার্পণ্যের পোষকতা কখনো পরিণামদর্শিতার পরিচায়ক বলে মেনে নেওয়া যেতে পারে না। অমিতব্যয়ী বেহিসাবীর যে দণ্ড তা' সেই বহন করে থাকে; আর অপরিমিত সঞ্চয়-লাল্‌সার নৈতিক আর্থিক পারমার্থিক সর্ব্ববিধ প্রায়শ্চিত্ত সমাজের ছোট বড় মাঝারি সবাইকেই কর্‌তে হয়!

তবু মানুষের সঞ্চয়ের নেশা ঘোচে না। নেশার ধরনই নাকি ঐ! নেশার ঝোঁকে মানুষ যখন পদে পদে ভূমিসাৎ-ড্রেনসাৎ হতে থাকে তখন তার সন্দেহ হয়—পৃথিবীর ভারকেন্দ্রের অচলতায় আর রাস্তার ধারের ঐ ড্রেনগুলোর স্থিতিশীলতায়।—এ ক্ষেত্রেও আমাদের তাই হয়েছে সংসারের বিকৃতিটাকেই আমরা তার প্রকৃতি বলে ধরে নিয়ে "জীবন এমন ভ্রম আগে কে জানিতরে" তারপরে ইত্যাকার সব করুণ সুরের সারি-গা-মা সাধ্ছি!—উচিত আমাদের জমাখরচের খাতা পুড়িয়ে ফেলে বেহিসাবের তরফ থেকে অর্থনীতি-শাস্ত্রের "পরিশোধিত সংস্করণ" বের করা।

মাঘ ১৩২৪। শ্রীবরদা চরণ গুপ্ত।

জাতীয়জীবনে সাহিত্যের উপযোগীতা।

(১)

নানা রকমের খেল্‌না সংগ্রহ করে শিশুরা বড় ঘরবাড়ীর বড় সংসারটির ভিতর তাদের আপ্‌নার ছোট্ট একটি সংসার পেতে বসে। সেইখানে তাদের পূরো স্বাধীনতা। বৃহৎ একটি সংসারের অভিজ্ঞতার উপর তাদের ক্ষুদ্র সংসারটির প্রতিষ্ঠা বটে; কিন্তু মোটেই তার শাসনাধীন নয়। সে সংসার তাদের আপনার সৃষ্টি। তার মূলে আছে তাদের শিশু-অন্তরের স্বাধীন কল্পনা।

মানুষ তেমনি ভগবানের সৃষ্টির মাঝখানে আপনার একটি পৃথক সৃষ্টি গড়ে তুলেছে। মানুষের মনুষ্যত্ব তার ঐ আপনার সৃষ্টিতে। আর ঐখানেই মানুষের পূর্ণ স্বাধীনতা। মানুষের সৃষ্টির মূলে যদিও বিশ্বপ্রকৃতির অভিজ্ঞতা আছে, প্রকৃতির শাসন সে সৃষ্টি মানে না। সে সৃষ্টির বীজ-কোষ মানুষের আপনার স্বাধীন ইচ্ছা এবং স্বাধীন চিন্তা।

বিশ্বসৃষ্টির সঙ্গে মানুষের সৃষ্টির একটি জায়গায় বেশ একটা মিল দেখা যায়। উভয় সৃষ্টিরই বাইরের একটা রূপ আছে, আর সে রূপের আড়ালে আছে একটা অরূপ শক্তি। বিশ্ব-সৃষ্টির বাইরের রূপ হচ্ছে বিশ্ব-বস্তু, আর তার আড়ালে আছে বিশ্ব-শক্তি। মানুষের সৃষ্টির রূপের পরিচয় মানব-জাতির সভ্যতার বাইরের নিদর্শনগুলোতে, আর সে সৃষ্টির অন্তরের যে শক্তি, সেটা হচ্ছে মানব-মনের চিন্তার ধারা।

ঐ চিন্তার ধারা,—বিশ্বমানব-মনের চিন্তার ধারাই মানুষের সাহিত্য। সাহিত্যের উপরই জাতীয়জীবনের প্রতিষ্ঠা; কেননা প্রত্যেক জাতির নূতন নূতন সৃষ্টিই জাতীয়জীবনের গতি এবং সমৃদ্ধির পরিচয়। ঐ সৃষ্টির ভিতরেই জাতির প্রাণের স্পন্দন।

মানুষের দেহটা যখন প্রাণশূন্য হয়ে পড়ে, ভিতরের একটা বিষাক্ত বাষ্পে মুহূর্ত্তের মধ্যে তার বিকৃতি ঘটে। ঐ দূষিত বাষ্প জাতির অন্তরেও জমে ওঠে, যখন জাতীয় মনের যে চিন্তার ধারা জাতির সাহিত্যে প্রবাহিত হয় তার গতি-বেগ প্রবল এবং অপ্রতিহত না থাকে। গতিই ত প্রাণ। গতি প্রতিহত হলেই প্রাণ বিনষ্ট হয়।

বিষাক্ত বাষ্পের উদ্ভব জীবন্ত দেহেও ঘটে, কিন্তু তার আভ্যন্তরীণ রক্ত-স্রোত বিশুদ্ধ রাখ্‌বার জন্য একটি অন্তর-অঙ্গ সর্ব্বদাই নিযুক্ত থাকে। যে রক্ত-স্রোত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের শিরা-উপশিরায় সঞ্চালিত হয়ে ক্ষণে ক্ষণে দূষিত হয়ে ওঠে; দেহের ঐ অন্তর-অঙ্গটি বাইরের উপাদান এনে প্রতিমুহূর্ত্তে সেই দূষিত রক্ত-ধারাকে শোধন করে। সাহিত্য-প্রতিভা জীবন্ত-জাতিদেহের ঐ রকমের একটি অন্তর-অঙ্গ বিশেষ। বিশ্ব-মনের সঙ্গে জাতীয় মনের যে একটা যোগ আছে বা থাকা দরকার, তা থেকে বিচ্ছিন্ন হলেই, সে জাতীয় মনের বদ্ধ আব্‌হাওয়া বিষিয়ে ওঠে। তখন প্রতিভাবান সাহিত্যিকেরাই সে জাতির অন্তরে বাইরের বিশুদ্ধ হাওয়া সঞ্চারিত করে জাতির জীবন রক্ষা করে। সাহিত্যিকেরাই জাতীয় রোগের প্রকৃত চিকিৎসক।

রোগ-চিকিৎসার একটা নূতন পদ্ধতি আমরা একালে দেখ্‌তে পাচ্ছি। ঐ নূতন প্রণালীতে যাঁরা চিকিৎসা করেন, তাঁদের মূল মন্ত্রটি হচ্ছে এই,—If you think diseased thoughts you attract disease, if

you think healthy thoughts you attract health. এঁরা দেহটাকে ছেড়ে দিয়ে দেহীকেই ধরে বসেন। এঁদের কথা, রোগের যে সব লক্ষণ মানুষের শরীরে প্রকাশ পায়, সেগুলো মনের রোগেরই বাইরের রূপ। এই কারণে চিকিৎসক সম্মোহন-বিদ্যার (hypnotism) বলে রোগীকে যাদু করে তার মন থেকে রোগ-বিভীষিকা তাড়িয়ে স্বাস্থ্যপ্রদ মনোভাব তার অন্তরে সঞ্চারিত করেন। এই প্রণালীর চিকিৎসা ব্যক্তির পক্ষে কতদূর ফলদায়ক তা ঠিক বল্‌তে পারিনে। কিন্তু এ কথা নিঃসন্দেহে বলা যেতে পারে, জাতীয়রোগের চিকিৎসার ঐ একমাত্র পদ্ধতি। জাতীয়জীবনে যখন নানা রকমের বিকৃতি-বীভৎসতা দেখা দেয়, তখন শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিকেরা বিচক্ষণ চিকিৎসকেরই মত বিচিত্র সৌন্দর্য্য-সৃষ্টির দ্বারা সমগ্র জাতীয়মনকে মুগ্ধ করে জাতির অন্তরে আপনার স্বাস্থ্যপ্রদ মনোভাবসকল সঞ্চালিত করতে এবং সমস্ত জাতিকে নব নব উচ্চতর আদর্শে গড়ে তুল্‌তে সমর্থ হন। আপনার মনের চিন্তাধারা সমস্ত জাতির অন্তরে প্রবাহিত করতে সাহিত্যিক যে রীতিটি অবলম্বন করেন, সেইটি হচ্ছে সাহিত্যের আর্ট। জাতীয়-জীবনের উপর সাহিত্যের আর্ট-বস্তুটির প্রভাব কতটা, এবং আর্টের সাহায্যে জাতীয়জীবনের কতদূর উৎকর্ষ-সাধন হয়েছে, সে আলোচনার পূর্ব্বে, আর্টের পরিচয় কি, তার সম্বন্ধে দু'একটি কথা বলা যা'ক।

ভিন্ন ভিন্ন সাহিত্যসমালোচক আর্ট সম্বন্ধে ভিন্ন ভিন্ন মত প্রকাশ করেছেন, তার মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য এই তিনটি,—জীবনের ব্যাখ্যা, The interpretation of life; জীবনের আলোচনা, The criticism of life; এবং জীবনের নব নব বিকাশ, The expression of life.

আর্টের একটি সার্থকতা তাহলে এই যে, তাতে আমরা দেখি, নব নব রূপে জীবনের প্রকাশ, অর্থাৎ জীবনের নূতন আদর্শের সৃষ্টি। নূতন আদর্শের প্রয়োজনটা কি, সে বিষয়ে কিঞ্চিৎ আলোচনা আবশ্যক। কালের শাসন যে কেবল মানুষের রক্তমাংসের দেহটাকে মেনে চলতে হয়, তা নয়, কালের হুকুমে মানুষের পুরোণো মনোভাব-গুলোকেও নতুনের পথ থেকে সরে দাঁড়াতে হয়। আর মানুষের মনের আইডিয়া যখন বদ্‌লে যায়, তখন জীবনের আইডিয়ালের পরিবর্ত্তন বিশেষ আবশ্যক। কেননা, মানুষের মনের আইডিয়ার অনুরূপ তার জীবনের আইডিয়াল যদি না হয়, তার অন্তরে বাহিরে একটা বিরোধ ঘটে। মানুষ এ অবস্থাতে আপনাতে আপনার বিশ্বাস হারায় এবং অপরের সঙ্গে ব্যবহারে কপটতা করে। এমনি ভাবে নানা রকমের বিকৃতি তার প্রকৃতিতে ঘটে। এতে করে তার আত্মশক্তি দিন দিন হ্রাস হয়ে আসে। ব্যক্তি ও জাতি উভয়ের পক্ষে ঐ একই কথা, কেননা, ব্যক্তির সমষ্টি নিয়েই ত জাতি।

In the course of life, the outer and the inner remain in incessant conflict and one must therefore arm himself to maintain the ever-renewed struggle,— Goethe নিজের জীবনের অভিজ্ঞতা দ্বারা এ কথাটি বুঝেছিলেন, এবং আপনার অন্তর-বাহিরের দ্বন্দ্ব নিষ্পত্তি করবার যে শক্তি তিনি নিজের জীবনে অর্জ্জন করেছিলেন, তাঁর সাহিত্যের ভিতর দিয়ে সমগ্র জর্ম্মাণ জাতিকে সেই শক্তি দান করে, জর্ম্মাণীর জাতীয়জীবনের অশেষ কল্যাণ সাধন তিনি করেছিলেন। Goethe-র জর্ম্মাণীতে জাতীয়জীবনের যে বিকৃতি ঘটেছিল, তার কারণ আইডিয়ার অভাব নয়, অশরীরী

আইডিয়ার জীবন্ত সাকার-মূর্ত্তির অভাব। নতুন নতুন আইডিয়াতে দেশের আকাশ ছেয়ে গিয়েছিল! কিন্তু জীবনের ক্ষেত্রে সেই আইডিয়াকে প্রয়োগের সময় জর্ম্মাণজাতির সঙ্কোচ এবং দুর্ব্বলতার অবধি ছিল না। ফরাসীদেশে নব ভাবের যে বান এসেছিল, তার তরঙ্গ-উচ্ছ্বাস সে দেশের সীমানা অতিক্রম করে জর্ম্মাণীতে এসে পৌঁছেছিল। জর্ম্মাণ-দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিকদের নূতন নূতন উদ্ভাবনের সঙ্গে সঙ্গে জাতির মনে একটা বিরাট পরিবর্ত্তন এসেছিল। জর্ম্মাণ-সমালোচকেরা পুরাতন আচার-বিচার, রীতি-নীতি-পদ্ধতির তীব্র সমালোচনা করতে সুরু করেছিল। নূতনের আক্রমণে জাতীয় মনের পুরাণো আইডিয়াগুলো অন্তর্হিত হয়েছিল। কিন্তু নূতন আদর্শের অভাবে জীবনের পুরাতন আদর্শের খোলসটা রয়েই গিয়েছিল। জাতির নবীন মন জীবনের পুরাতন আদর্শের বিধি-বিধানের শিকলে বাঁধা পড়েছিল। তাতে রুদ্ধগতি রক্তস্রোতের মত ঐ রুদ্ধমনের চিন্তাধারা দূষিত হয়ে উঠেছিল। এই অবস্থা থেকে জর্ম্মাণজাতিকে রক্ষা করেন Goethe, Schiller, Heine প্রভৃতি সাহিত্যিকেরাই। তাঁরা এই নতুন আইডিয়াগুলোকে পরিপূর্ণ স্বাধীনতা, আশ্চর্য্য স্পষ্টতা এবং অপূর্ব্ব মৌলিকতার সহিত সাহিত্যের মধ্যে প্রকাশিত করেন। এঁরা নতুন নতুন ভাব নিয়ে জীবনের নূতন আদর্শ সৃষ্টি করে জর্ম্মাণ-জাতির সুমুখে খাড়া করেন। Goethe-র অধিকাংশ চরিত্রই ত নিরাকার আইডিয়ার জীবন্ত সাকার রূপ।

দর্শন বিজ্ঞানের নতুন নতুন তথ্য আবিষ্কারের সঙ্গে সঙ্গে মানুষের মনের যে অভিব্যক্তি ঘটেছিল, তার অনুরূপ জীবনের নতুন আদর্শ যে জর্ম্মাণ-সাহিত্যে গড়ে উঠেছিল, সে সাহিত্য যে মঙ্গলের সৃষ্টি, তার

প্রমাণ Goethe-র এই বাক্যে,—It may now without arrogance be asserted that German Literature has effected much for humanity that a moral-psychological tendency pervades it, introducing not ascetic timidity, but a free culture with nature and in cheerful obedience to Law.

(৩)

একটি কারণ দেখানো গেল। নতুন ছাঁচে জীবনের আদর্শ গড়ে তোলবার প্রয়োজন আরো অনেক কারণে প্রত্যেক জাতির ভিতরেই দেখা যায়। পারিপার্শ্বিক ঘটনার সংঘাতে, অথবা ভিতরের অবস্থার পরিবর্ত্তনে, অনেক সময় জীবনের সনাতন পথটি রুদ্ধ হয়ে আসে, তখন জাতির কল্যাণ নতুন পথের সৃষ্টিতেই। কেননা, আত্মপ্রকাশের সহজ পথটি যখন নেই, তখন মানুষের পক্ষে চোরাগলির অনুসন্ধানে ফেরাটা বড় অস্বাভাবিক নয়। ঐ অবস্থাতে জাতির অন্তরে হীনতা এসে পড়ে। আর সেই হীনতা যাদের মন আছে তাদের মনকে পীড়া দেয়; মানুষের দুঃখ তাঁদের মনকে কষ্ট দেয়—কিন্তু তার চাইতে বেশী কষ্ট দেয় মানুষের অবনতি। প্রাণের ঐ বেদনা থেকেই সাহিত্যিকদের অন্তরে আসে সৃষ্টির তাগিদ। তাঁদের সৃষ্টি জাতির মঙ্গল সাধন করবেই, কেননা সে সৃষ্টির গোড়াতে আছে মায়ের প্রাণের মঙ্গল-কামনা।

যাঁদের অন্তরের সম্বল কেবল স্পর্দ্ধা, তাঁদের উপর সমাজের শাসন-ভারই অর্পিত হয়েছে, তাঁরা চান কেবল চোখ রাঙ্গিয়ে মানুষের

প্রাণটাকে দমন করতে। পরের দুঃখে তাঁদের অন্তরে ব্যথা বাজে না। বেদনা-বোধ তাঁদের নেই। অপরপক্ষে আত্মপ্রকাশের সনাতন পথগুলো রুদ্ধ হয়ে আসাতে, জাতির প্রাণটা যখন হাঁপিয়ে মরবার উপক্রম হয়, তখন যে মণীষীরা নতুন পথ গড়বার শ্রম স্বীকার করেন, সাহিত্যে যাঁরা জীবনের নতুন নতুন আদর্শ সৃষ্টি করেন, পরের দুঃখটা তাঁরা আপনারাই বোধ করেন। পরের অধোগতিতে তাঁরা নিজেদের অপদস্থ মনে করেন। সুতরাং তাঁদের সৃষ্ট সাহিত্য জাতীয় জীবনের হিতসাধন এবং জাতীয় মনের ঐশ্বর্য্যবর্দ্ধন যে করবে, এ ত ধরা কথা।

একটা উদাহরণের দ্বারা এ মতের সমর্থন করা যাক। য়ুরোপীয় সাহিত্যে জীবনের আইডিয়ালের একটা পরিচয় স্ত্রী-পুরুষের ভিতরে সখ্যভাবের (friendly comradeship) আদর্শে। যৌনসম্বন্ধ যখন এই নব আদর্শের প্রতিষ্ঠাভূমি নয়, তখন দেহের আকর্ষণ এই মিলনের কারণ হতে পারে না। মনের শক্তি সৌন্দর্য্যের আকর্ষণে মানব-মনের সঙ্গে মানব-মনের মিলনই হচ্ছে এই নব আদর্শের ভিত্তি। এখন এই আদর্শের কি প্রয়োজন, এবং এতে করে জাতীয় জীবনের কোন্ কল্যাণ সাধিত হয়েছে, তার সম্যক আলোচনা করবার সামর্থ্য আমার অবশ্য নেই, তবে মোটামুটি দু' চারটি কথা বলতে পারব, এ ভরসা আছে।

মানব-প্রকৃতি জড়-প্রকৃতির নিয়মাধীন, এই সিদ্ধান্তে আস্থাবান একজন জর্ম্মাণ জড়বাদী স্ত্রী-পুরুষের ভিতর যে প্রণয়, তাকে বিশ্লিষ্ট করে দেখিয়েছেন, অণু-পরমাণুতে যে কারণে রাসায়নিক যোগ সংঘটন হয়, ঐ প্রণয়ের মূলে সেই একই কারণ বর্ত্তমান। জর্ম্মাণ পণ্ডিতের মতটি আমি অগ্রাহ্য করিনে। কিন্তু এখানে আমার বলবার কথা এই

ভাস্কর তাঁর যে মানসী মূর্ত্তি পাথর খুদে বের করলেন, তার দিকে আমরা যখন চাই, পাথরটাই কি তার ভিতর আমাদের কাছে সত্য-বস্তু বলে মনে হয়, না ভাস্করের কল্পনাই সেখানে সত্যরূপ ধারণ করে? স্ত্রী-পুরুষের যে প্রণয়, তার মূলে যাই থাক, বর্ত্তমানে তার শোভা-সৌন্দর্য্য, ঐশ্বর্য্য-সম্পদ মানুষের মনের ক্রিয়ারই ফল। মূলে যার সৌন্দর্য্যের অভাব তাকে সুন্দর শোভন করে তুলবে, এ সামর্থ্য সাহিত্যের আছে। আমাদের ভিতর যেটা কুৎসিৎ, সেটাকে শ্রীযুক্ত করবার ভার সাহিত্যের উপরই ন্যস্ত। কারণ সাহিত্যের উদ্দেশ্যই হচ্ছে ইহলোকের মালমসলা নিয়েই আর একটি কল্পলোকের সৃষ্টি করা—যে লোক এই মাটির পৃথিবীর চাইতে ঢের বেশী সুন্দর ঢের বেশী সত্য এবং ঢের বেশী অক্ষয়।

সাহিত্য ব্যক্তির মনকে যে ঐশ্বর্য্য দান করেছে, তাতে জাতীয়-মনের সৌন্দর্য্য এবং সম্পদ বেড়েছে। এরপর গোটা জাতিটার উপরেও সাহিত্যের প্রভাব যথেষ্ট আছে। যে গণতন্ত্রীয় শাসন-প্রণালী, আজকের দিনে ইউরোপে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, সেই ইউ-রোপের এমন দিন ছিল, যখন তার কাছে ওটি স্বপ্নের চেয়েও অলীক ছিল। দরিদ্রজনসাধারণের কাছে সে দেশের ধনী জমিদার 'ধর্ম্মাবতার প্রবল প্রতাপান্বিত' ছিল। মানুষের সঙ্গে মানুষের এই অস্বাভাবিক ব্যবধান, ইউরোপের সাহিত্যিকেরাই দূর করেছেন। তাঁরাই সাম্য-বাদের উপর গণতন্ত্রের ভিত্তি স্থাপন করেছেন। তারপর মধুসূদন, হেমচন্দ্র, বঙ্কিমচন্দ্র, নবীনচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, দ্বিজেন্দ্রলাল প্রভৃতির সৃষ্ট সাহিত্য বিগত ৪০ বছরের মধ্যে আমাদের জাতীয়মনে যে পরিবর্ত্তন উপস্থিত করেছে, তা চোখ মেলে চাইলেই দেখতে পাওয়া যায়।

(৪)

সাহিত্যে পাওয়া যায় ভাবীজীবনের পূর্ব্বাভাষ। এমন একদল লোক সকলদেশেই আছেন, সাহিত্যের ঐ নূতন আইডিয়ালটাকে যাঁরা শনির অবতার মনে করেন। এঁদের সাধ বেশ আয়েস করে চিরপুরাতনের গুহায় ঘুম দেন। নতুনকে বরণ করে নেবার শ্রম-স্বীকার এঁদের ধাতে নেই। কিন্তু মানুষ আপনার খুসিতে যদি চলতে না শেখে, কালের কষাঘাতে একদিন তাকে নতুনের পথে এসে দাঁড়াতেই হয়। কালের ধর্ম্মে যেটা একদিন আস্‌বেই সাহিত্য তার পূর্ব্বপরিচয় যদি করে দেয় তাতে দোষ কি? বরং সুবিধেই আছে। নতুনের সঙ্গে যেদিন সাক্ষাৎ হবে, সেদিন তাকে আমরা সম্পূর্ণ অপরিচিত মনে করে ভয় পাব না, তার সঙ্গে যে আমাদের আগে থাক্‌তেই পরিচয় হয়ে গেছে এইটে দেখে খুসি হয়ে তাকে বরণ করতে পারব। সেই অনাগত বন্ধুর দ্বাররোধ করে নিজেদের কল্যাণকে বিমুখ করব না। আর কালের গতি যে বড়ই কুটিল, প্রতি কাজ-কর্ম্মে আমাদের এ অভিযোগ খাড়া করতে হবে না।

সমাজের প্রায় সকল-ক্ষেত্রেই ত দেখছি, নূতন-পুরাতনের একটা দ্বন্দ্ব চল্‌ছে। পিতা-পুত্রের শ্বাশুড়ী-বধূর আইডিয়ার গরমিল থাকাতে মনের অমিল ঘট্‌ছে। নবীন প্রাচীনের শাসন মান্‌ছে না। প্রাচীন নবীন প্রাণের আব্‌দার সইছে না। এতে করে সমাজের ভিতর অশান্তির সৃষ্টি হচ্ছে। আর দোষারোপ হচ্ছে কাল-বেচারীর উপর, যেহেতু তার একটা গতি আছে। চিরপুরাতনের মধ্যে সে আবদ্ধ থাক্‌তে পারে না। নূতন নূতন পথ বেয়ে তাকে চল্‌তে হয়। জাতীয়মনে নূতন-পুরাতনের বিরোধটা বড় বেশী সাঙ্ঘাতিক হয়ে উঠ্‌তে পারে না, যদি সাহিত্য পূর্ব্ব হতে এসে পুরাতনকে নব-মন্ত্রে দীক্ষিত করে।

অনেক ক্ষেত্রে সাহিত্যের বিরুদ্ধে এই একটি অভিযোগ উপস্থিত করা হয়, যে সাহিত্য জাতীয়জীবনে দুর্নীতির প্রশ্রয় দেয়। সকল স্থলেই অভিযোগটি যে একেবারে মিথ্যা, সে কথা অবশ্য বলিনে। তবে অধিকাংশ স্থলেই এ অভিযোগের মূলে কোন সত্য নিহিত থাকে না। যাঁদের এ অভিযোগ তাঁদের প্রকৃতি—যাঁরা চরিত্রের কলঙ্ক রট্‌বে এই আশঙ্কায় চিকিৎসকের কাছে আপনার ব্যাধি গোপন রাখেন, যে পর্য্যন্ত না ভীষণ আকারে তা দেখা দেয়,—ঠিক তাঁদেরই মত।

যাঁরা প্রতিভাবান সাহিত্যিক তাঁদের একটা গুণ, তাঁদের প্রাণের সরলতা। তাঁদের অন্তর-বাহির একেবারে স্বচ্ছ। মানুষ ভিতরের কলুষ গোপন রেখে, বাইরে সাধু সাজবে এ কপটতা তাঁদের চক্ষুঃশূল। তাই জাতিরও অন্তরের যে গলদ, সাহিত্যিক সেটাকে সমাজের সাম্নে ধরে তার আলোচনা করেন। কিন্তু অনেকেরই সাধ, আত্মগোপন করে, বাহিরে সাধু সাজেন।

তারপর সমাজ-কর্ত্তাদের সঙ্গে সাহিত্যিকদের একটা বিরোধ অনেক সময় দেখা দেয়। উভয়-পক্ষের উদ্দেশ্য এক হলেও, পথটা অনেক সময় বিভিন্ন। অজ্ঞতার অন্ধকারে মানুষের স্বভাবটাকে মানুষের কাছে গোপন রাখ্‌বে, এ সাহিত্যিকদের অভিপ্রায় নয়। তাঁদের কথা, আইডিয়ালের-বলে মানুষের অন্তরটাকে যখন ফুলিয়ে ফাঁপিয় তোলা যায়, তখনই মানুষ আপনার স্বাভাবিক দুর্ব্বলতা ছাড়িয়ে অনেক ঊর্দ্ধে উঠ্‌তে সক্ষম। সাহিত্যিক তাই, অসাধ্য-সাধনের ব্রতগ্রহণে মানুষের মনকে আহ্বান করেন। সাহিত্যিকদের কাছ থকে এর একটা উদাহরণ নেওয়া যাক।

Goethe তাঁর Affinities বইতে মানুষের প্রকৃতিকে যেন রাসায়নিক প্রণালীতে বিশ্লিষ্ট করে, তার ভিতরের হীনতা দুর্ব্বলতা

মানব-সমাজের সুমুখে ধরলেন। কিন্তু Goethe কি বাস্তবিকই সমাজে দুর্নীতি প্রচার করলেন? তিনি দেখালেন, মানুষ যখন আপনার প্রকৃতির দাসত্ব করে, তখন তার অধোগতি কতদূর সম্ভব, আর ইচ্ছাশক্তির বলে মানুষ আপনাকে ছাড়িয়ে কত ঊর্দ্ধে উঠতে পারে। Edward ছিল স্বীয় প্রকৃতির দাস, কিন্তু Edward ত Goethe-র আদর্শ-চরিত্র নয়। মানুষ আপনার প্রকৃতির দাসত্ব করবে, এ শিক্ষা Goethe কখনও দিতে পারেন না। কেননা, Goethe-র কথা,—Man alone

Can achieve the impossible.

Goethe-র শিক্ষা মানুষ তার ইচ্ছাশক্তির বলে, অসাধ্যসাধন করবে। ঐ অসাধ্যসাধনেই মানুষের মনুষ্যত্ব। Goethe-র যা শিক্ষা, সেই একই শিক্ষা বিভিন্ন দেশের সাহিত্যিকেরা দিয়েছেন। তাঁরাই মানুষকে আকাশ কুসুমের স্বপ্ন দেখিয়েছেন, আর সে আকাশ-কুসুম লাভ করবার উৎসাহ-উদ্দীপনা মানুষের অন্তরে জাগিয়েছেন। মানুষ ব্যক্তি বা জাতি হিসেবে যে উন্নত হয়েছে, সে তার আস্তা-কুঁড়ের দিকে নজর রেখে নয়, আকাশ-কুসুমে লক্ষ্য রেখে। আকাশের কুসুম হয়ত আকাশেই রয়ে গেছে, কিন্তু তার লাভের সাধনা থেকে মানুষ শক্তি পেয়েছে,—আপনার পশুত্বের সীমা অতিক্রম করে, দেবত্বের উচ্চতর লোকে অগ্রসর হতে।

It is the striving after, not the attaining of ideals, that is the motive-power behind human endeavour. Ideals recede farther and farther as we advance, but we rise towards the stars as we seek them—জর্ম্মাণজাতি

যখন আকাশ-কুসুমে বিশ্বাস হারিয়েছিল, Schiller তার কানে এই মন্ত্র দিয়েছিলেন।

(৫)

এতক্ষণ যে কথা বললুম, সেটা বিশেষ করে সাহিত্যের সৃষ্টির দিকটা নিয়ে, তার আর একটা দিক আছে, সেটি হচ্ছে ধ্বংসের দিক। Criticism of life, বা জীবনের সমালোচনা,—আর্টের এই লক্ষণটি বেশী স্পষ্ট হয়ে সাহিত্যের এই দিকটায় ফুটে ওঠে। জাতীয়-জীবনের সঙ্গে সাহিত্যের এই ধ্বংসের দিকটার কি সম্বন্ধ তার আলোচনা করা যাক।

মানুষের মনের সম্পাদ রক্ষা এবং বৃদ্ধি করবার ভার সাহিত্যের হাতে। তবু মানব মনকে সবল ও সুশ্রী করে গড়ে তুলতে হলে, মানুষের ভিতরের জীর্ণতাতে আঘাত করে, পুরাতনকে ধ্বংস করতে হয়। ওটি ভগবানেরই বিধান, কেননা তিনি তাঁর বিশ্বপ্রকৃতির সৌন্দর্য্য রক্ষা করবার জন্য কেবল যে সৃষ্টিকর্ত্তা হয়ে নতুনের সৃষ্টি করছেন তা ত নয়, পুরাতনকে ধ্বংস করবার জন্য সংহার মুর্ত্তিও ধারণ করছেন। সাহিত্যেও ঐ দেবতার আবির্ভাবের বিশেষ প্রয়োজন, কেননা পুরাতনকে ধ্বংস না করলে, সেখানে নতুনের সৃষ্টি জীর্ণ-বাড়ির নতুন রঙ্-ফেরানো মাত্র হবে।

বাহির থেকেই এ-সাহিত্য তার শক্তি-অর্জ্জন করে। জাতির আপনার গণ্ডির ভিতর, বদ্ধ এবং দূষিত আবহাওয়াতে এ সাহিত্য পুষ্ট এবং পরিবর্দ্ধিত নয়। বিশ্বের জ্ঞান এবং অভিজ্ঞতার উপাদানেই এ সাহিত্যের সৃষ্টি। এ সাহিত্যের উদ্দেশ্য দেশবাসীর মনোরঞ্জন করা

নয়, আঘাত করাই এ সাহিত্যের কাজ,—জাতির অন্তরে যেখানে হীনতা, কপটতা এবং সঙ্কীর্ণতা, সেইখানে আঘাত করা। এ সাহিত্য যাঁদের সৃষ্টি, তাঁদের বিরুদ্ধে সকল দেশই এই অভিযোগ খাড়া করা হয়, যে তাঁরা স্বদেশ-দ্রোহী, স্বজাতি-বিদ্বেষী। Goethe যখন তাঁর স্বজাতির মনে আঘাত করেছিলেন, তাঁর বিরুদ্ধেও ঐ অভিযোগ আনা হয়েছিল। Goethe তার যে জবাবটি দিয়েছিলেন, আমার মনে হয়, এঁদের সকলের পক্ষ হতে ঐ একই জবাব দেওয়া যেতে পারে,—What is meant by love of one's country? If the poet has employed life in battling with pernicious prejudices, in setting aside narrow veiws, in purifying the tastes of his countrymen, what better could he have done?

দেশের প্রতি অন্ধভক্তি যাঁদের আছে, তাঁরাই দেশের যথার্থ হিতসাধক নন। জাতির মঙ্গল-সাধন তাঁদের দ্বারা হয় না, যাঁরা জাতির অন্তরের যত কলুষ চাপা দিয়ে রেখে, শতমুখে তার প্রশংসা করেন। দেশবাসীর অন্তরের সঙ্কীর্ণতা দূর করবার, এবং জাতীয় মনের হীনতার উপর আঘাত করবার শক্তি যাঁদের আছে, তাঁরাই দেশের বা জাতির পরমমিত্র। আমার ত ধারণা, জাতীয়জীবনের Sanitation-বিভাগের কাজ-কর্ম্ম তখনই বেশ সুচারু-রূপে সম্পন্ন হতে পারে, যখন তার portfolio সাহিত্যের প্রলয়-দেবতা এসে হাতে নেন্। এ সিদ্ধান্ত আমার কোন যুক্তির বলে, তা নির্দ্দেশ করছি।

অনুসন্ধান করলে দেখা যায়, জ্ঞান-বিজ্ঞানের উৎকর্ষ-সাধনের সঙ্গে সঙ্গে প্রত্যেক জাতির ধর্ম্ম এবং সামাজিক জীবনের অনেক বিধি-বিধান এবং প্রথা-পদ্ধতির প্রাণ-বিনাশ হয়েছে, কিন্তু তাদের জায়গাটি জুড়ে

তাদের শব পড়েই রয়েছে। এর কারণ কি, তার উত্তর দেবে, যাঁরা মৃত-দেহের সংকার কখনও করেছেন, তাঁদের আপনার অভিজ্ঞতা। মানুষের মৃত্যুর পর, তার শবটার উপর তার আত্মীয়-স্বজনের মায়া বড় কম নয়। কিন্তু সে মায়াকে কাটিয়েও সে দেহের সংকার করাতেই গৃহের মঙ্গল।

যে সব সাহিত্যিক, জাতির মঙ্গলের জন্য জাতির অন্তরে আঘাত করেন, তাঁদের তুলনা,—যাঁরা মায়ের প্রাণে তীব্র বেদনা দিয়ে মায়ের কোল থেকে মৃতশিশুটিকে কেড়ে নিয়ে যান শ্মশানে তার সংকার করতে,—তাঁদেরই সঙ্গে। যখন দূষিত বাষ্পে জাতীয়মনের আব্‌হাওয়া বিষিয়ে ওঠে, তখন ঐ শ্রেণীর সাহিত্যিকেরাই জাতির মানস-পুত্র এবং মানস-কন্যাদের মৃতদেহের সংকার করে জাতীয়জীবনের মঙ্গল সাধন করতে সমর্থ।

(৬)

সাহিত্যে আর এক প্রকারের শ্রেণীবিভাগ আছে। মানব-প্রকৃতির যেমন দুটো দিক আছে, ভাবের এবং বুদ্ধির দিক। মানব-মনের সৃষ্টি, সাহিত্যেরও তেমনি দুটো দিক, একটি হচ্ছে তার ভাবের দিক, আর একটি হচ্ছে বুদ্ধির দিক।

ভাবের প্রাচুর্য্য যে সাহিত্যের ঐশ্বর্য্য—তার সম্বন্ধে দু চারটি কথা বলা আবশ্যক। একদল সমালোচক আছেন, ভাবপ্রধান সাহিত্যকে তাঁরা বাহুল্য-সৃষ্টি মনে করেন। তাঁদের মত, এ সাহিত্যের দ্বারা জাতীয়জীবনের কোন মঙ্গল সাধন হতে পারে না। এঁদের এই মতের সত্যাসত্য বিচার করে দেখা দরকার মনে করি।

ভগবানের এই বিশ্বসৃষ্টির সম্বন্ধে একটি মত প্রচলিত আছে, সেটিকে anthropocentric dogma বলে; যাঁরা ঐ ডগ্‌মাটি মেনে চলেন, তাঁদের ধারণা একমাত্র মানবজাতির জন্য ভগবান এই বিশ্ব-প্রকৃতি রচনা করেছেন। এই হেতু তাঁদের পক্ষে এটা খুব স্বাভাবিক হবে, যদি বিশ্বের যে-যে বস্তু মানবজাতির কোন কাজে না আসে, সেগুলোকে তাঁরা ভগবানের বাহুল্য-সৃষ্টি মনে করেন। ভগবানের বিরুদ্ধে ঐ বাহুল্য-সৃষ্টির অভিযোগ মানুষের অন্তরে আছে কিনা, তা জানিনে, প্রকাশ্যভাবে সে অভিযোগটি উপস্থিত করতে কেউ কোন দিন বোধ হয় সাহস করেন নি। কিন্তু কবি যে কাব্য লিখলেন, তা যদি কোন সমালোচকের অভিরুচির অনুরূপ সৃষ্টি না হয়, তখনই সে কবির বিরুদ্ধে সমালোচক অভিযোগ উপস্থিত করেন।

ধরুন, কোন কবির অন্তরে ভাবের খুব প্রাচুর্য্য। তিনি অন্তরের ভাবে বিভোর হয়ে প্রাণের কথা শোনালেন, যাঁদের প্রাণ আছে তাঁদের। আর সমালোচক,—যাঁর বুদ্ধির দিকটায় জোয়ার এসে থাকবে, কিন্তু ভাবের দিকটায় হয়ত ভাটা পড়েছে, কবির সঙ্গে প্রকৃতিগত অনৈক্য বা রুচির বৈষম্য ঘটায় কবির সৃষ্টিকে তিনি নিরর্থক মনে করলেন। কিন্তু একমাত্র মানবজাতির জন্য যেমন ভগবানের সৃষ্টি নয়, কবির সৃষ্টিও তেমনি কোন ব্যক্তিবিশেষের কিম্বা কোন উদ্দেশ্যবিশেষের জন্য নয়। সমালোচক, কবির যে সৃষ্টিকে নিরর্থক মনে করলেন, জাতির কাছে তার যদি কিছুমাত্র সার্থকতা থাকে, তাহলে তাকে বাহুল্য-সৃষ্টিমাত্র মনে করা সঙ্গত নয়।

জাতির দিক থেকে এইবার বিচার করা যাক। জাতি অর্থে ত ভিন্ন ভিন্ন প্রকৃতির ব্যক্তির সমষ্টিকে বোঝায়। ভিন্ন ভিন্ন প্রকৃতির

বল্লুম, কেননা, রুচি ও প্রকৃতির বৈচিত্র্য মানুষের ভিতর চিরদিনই আছে এবং ভবিষ্যতেও থাকবে। সমালোচকের যে প্রকৃতি ও ধর্ম্ম, তার সম্পূর্ণ বিপরীত প্রকৃতির এবং ভিন্নধর্ম্মী ব্যক্তি জাতির মধ্যে অনেকেই থাকবেন, এটা বড় আশ্চর্য্য কথা নয়। ভাবের দিকটাই যাঁদের অন্তরে প্রবল, ভাবের দিক থেকে যে সাহিত্যে সৃষ্টি, সেই সাহিত্যই তাঁদের পরম সম্পদ। কবির কাছে প্রাণের কথা না শুনলে এঁদের অন্তরাত্মা গুম্‌রে মরে। ভাবের প্রাবল্যহেতু কবির সৃষ্টিকে বাহুল্য-সৃষ্টি জ্ঞান করে দেশ থেকে কোনজাতি যদি তাকে নির্ব্বাসিত করে, তাহলে সে জাতির গড়ন কখন সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হতে পারে না। দেহের শ্রী তার প্রতি অঙ্গের সৌষ্ঠবে, একটি অঙ্গ যদি খর্ব্বাকৃতি হয়, তাতে সকল দেহের শ্রীহানি হয়। জাতীয়মনের একটা দিক যদি শুকিয়ে যায় আর একটা দিক যদি ফুলে ওঠে, তাহলে সে মনের চেহারা সুসঙ্গত এবং সুন্দর হতে পারে না। জাতির সভ্যতা তখনই পূর্ণাবয়ব হয়ে উঠ্‌বে, যখন তার সাহিত্যের সকল দিকের সমান উৎকর্ষ সাধিত হবে। সাহিত্যের সঙ্গে জাতীয়জীবনের সম্বন্ধ কোন একটা দিকের সম্বন্ধ ত নয়; জাতির রাষ্ট্র, ধর্ম্ম এবং সামাজিক জীবন, তার আভ্যন্তরীণ যে শক্তির বলে সুস্থ সুশ্রী এবং সবল হয়ে ওঠে, সাহিত্যই সেই শক্তির আধার।

শ্রীবীরেশ্বর মজুমদার।

হৈরা।

(মাণিকগঞ্জের মৌখিক ভাষায় লিখিত)

মা-বাপমরা ছোট ছাওয়ালটীরে যেদিন গায়ের একজন গিরস্ত লোক মাসির বাড়ীতে আইনা দিয়া গেল, সেইদিন থিকা তার মাসি সেই হাড্ডিসার ছোট ছাওয়ালটীর ক্যাবল যে আশ্রয়স্বরূপ হৈল তা না,—বেওয়া বিধবা মাসির অপায়া সংসারটাও য্যান একটা কিছু হাতের সাম্‌নে পায়্যা আস্তে ধীরে গুছায়্যা উঠব্যার্ লাইগ্‌ল। বাপ-মায় কি বৈলা যে ছাওয়ালটারে ডাইক্‌ত, আইনা-দেওয়া লোকটী তা কিছুই কইব্যার পারে নাই। দিন চাইরেক কোকন বৈলা ডাইক্‌ব্যার পরে মাসির মনে বইন্‌পুতের একটা নাম মন-উক্তেই জোয়ায়্যা উঠ্‌ল; সে বইন্‌পুতের নাম রাইখ্‌ল গয়ানাথ। ইস্তককাল গয়ার পিণ্ডির কথা মনে হৈতে মাসি তিনকুল বিচ্‌রায়্যা কাক প্রাণীডাও পাইত না, বৈতরণী পার হওয়নের কথা মনে হৈলে তার নিলক্ষের চক্ষু ভয়ে বুইজ্যা আইস্‌ত।

একেই ত বইন্‌পুৎ, তাতে আবার স্বগোত্তর কাজেই গয়ানাথের হাত দুইখানিরে রাইমণি ক্যাবল হাতই মনে কৈর্‌ত না, পিণ্ডির আধার বৈলা সে হাতে সোয়াগ্ কৈরা সোনার বয়লা পরায়্যা দিল। মান্‌ষে কইত্তেই কয় যে কোনতারই বাইড়্ ভাল না। ইক্ষেত্রে সে কথা হাতে হাতেই ফইল্‌ল। মাসির দিন রাইত আঢালা সোয়াগে গয়ানাথ খুব একজন আল্লাইদা ছাওয়াল হইয়্যা উঠ্‌ল। পাড়ার

ছাওয়ালগোরে যার হাতে যা দেখে মাসির কাছে কান্দন জুইড়্যা দিয়্যা তাইই আদায় কইর‍্যা নেয়। এই ভাবে পনর বচ্ছর পার হওয়নের পর সে যখন বেশ ডাঙর হইয়্যা উঠ্‌ল তখনো তার পড়া-শুনার নামগন্ধও তার নিজের কি তার মাসির কেউরই মনে উদয় হৈল না। ছাওয়াল-পাওয়ালের পড়ন-শুনন কোন কালেই আপন গরজে হয় না মুরুব্বির উর্যোগেই হইয়্যা থাকে। গয়ানাথের এক-মাত্র মুরুব্বি মাসি। তার ধারণা যে লেখন-পড়ন শিখন লাইগ্‌ব এক যারা বিধি-বিধান দেয় আর যারা চাকুরী কইর‍্যা খায়, মাত্র তাই গোরে। রাইমণির জোত জমার যা আয় তাতে তার সংসারে খরচ-পত্র ভালয়ালে কুলায়্যাও কিছু কিছু উবুর্‌ত। এই ভাবে ফি বচ্ছরের অল্পবিস্তর বাড়্‌তি রাইমণির হাতে জইম্‌তে জইম্‌তে তার একটু তেজারতি কার্‌বারও জাঁইক্যা উঠ্‌ছিল। সুতরাং বইন্‌পুতের লেখন পড়ন শিখানের কথা মাসির যে মনেই হইত না ইয়াতে আচম্বিৎ হওয়নের কারণ কিছুই নাই। কিন্তু তাই বৈলা ঘর-গিরস্তালির কামকাজ ও আওয়ৎ বিয়ৎ শিখান মাসির নজর একটুও এড়ায় নাই। নিজের স্বার্থ বুইঝ্যা নিতে রাইমণি অপটু আছিল না কিন্তু ক্ষ্যাণে ক্ষ্যাণে দেখা যায় বাশের থিকা কঞ্চি দর, গয়ানাথের সম্বন্ধে ই-কথাটা একিকালে কাপে কাপে খাইট্‌ত। মাসির শিক্ষাগুণে বইন্‌পুৎ আখরে অজ্ঞান থাইক্যাও আখেরের চুর‍্যান্ত জ্ঞানী হইয়্যা উঠ্‌ল—ঘরের খাইয়্যা বনের মইষ সে কোন কালেই খ্যাদায় নাই।

রাইমনির সংসারে এক মাত্র চাকর হৈরা। গয়ানাথ যখন ই-বাড়ীতে আইসে নাই তার আগের থিকা সে রাইমণির চাকর। এখন তার বয়েস হইচে বৈলা রাইমণি তারে বেশী কিছু ফর ফরমাইস্

পার্য্যমানে দিত না কিন্তু গয়ানাথের বুদ্ধি বাড়নের লগে যেমুন তার কর্ত্তাগিরি বাইরা উঠ্‌ব্যার লাইগ্‌ল, হৈরার খাটুন্নীও সেই সাথে সাথে কমনের বদলে দিনে দিনে বাইরাই চইল্‌ল। বইন্‌পুতের আইসনের আগে নিসন্তান রাইমণির একটু স্নেহ এই হৈরা দখল কই্‌রতে র‍্যাৎ করে নাই, তাই তারে অতিরিক্ত মেহানৎ কই্‌রতে দেইখ্‌লেই রাইমণির কাছে অসহ্য ঠেই্‌কত। কিন্তু গয়ানাথ হৈরার বিনাকামে বইসা থাকন একিব্যারেই দেইখার পাইর্‌ত না। এই অনুজরের চাকরটীরে নিয়া ই-দাইন্‌কে মাসি বইন্‌পুতের মধ্যে এক আধটু ঝগড়া ঝাটির সুরু হৈব্যার লাইগ্‌ল। হৈরা মানুষটা আছিল বুদ্ধিতে কিছু খাটো কিন্তু তার বুকের পাটাটা আছিল খুব বড় আর কৈল্‌জাটা খুব নরম। ধারে কাছে গিরস্তলোকের ফ্যারে অফ্যারে তার শীত গীরিষ্মি জ্ঞান থাইকৃত না।

যে কালের কথা কওয়ন হইতাছে সে আছিল ফাগুন মাস। গয়া-নাথের হুকুম মতে হৈরা ভোর বিয়ানে উইঠা চৈতালি ফসল বুইঝ্যা আইন্‌ব্যার জন্তে বর্‌গাদারের বাড়ী যাইব্যার লাইগ্‌ছিল—এমুন সুমে পথে মরা কান্দন শুইনা তার পাচ পরাণ ছ্যাৎ কইর‍্যা উঠ্‌ল। বর্‌গা-দারের বাড়ী আর তার যাওয়ন হৈল না, সে তাড়াতাড়ি গোশাই বাড়ীর দিগে ছুইটা গেল।

হৈরা যখন গোশাই বাড়ীর আঙ্গিনায় পাও দিছে তখন সে বাড়ীর মাঠাগেন আঙ্গিনায় বাইর-করা মরা ছাওয়ালের মুখে উপুর হইর‍্যা পইর‍্যা মাথা কুইটা কাইন্দব্যার লাগ্‌ছিল। রাধিকা গোশাইর মাঝারো ছাওয়ালটীর উপ্‌রে পোশু রাইতের শিকা ওলা দ্যাব্‌তার নজর হওনের কথা সে আগেই শুন্‌ছিল কিন্তু কোন ছুতায়ই গয়ানাথের কামকাজ

এরায়্যা একবার আইসা খোঁজটাও নিবার পারে নাই, তার দুই চইখ্ বাইয়্যা দরদরায়্যা জল পইর্‌ব্যার লাইগ্‌ল।

দুপুরের ঠিক যখন ঠাটাপরা রৈদ, সেই সুমে হৈরা মরা পুড়ান সারা কইর‍্যা পরণের কাপড় গায়ে শুকায়্যা ফিরা আইচে। তার পরাণ তখন খিদায় জর্ জর্, শরীর তেষ্টায় থর্ থর্ কইরব্যার লাইগ্‌ছিল বর্‌গাদারের বাড়ীর থিকা ফিরণের দেরি দেইখা গয়ানাথ যে তার সব কাণ্ড কারখানা মন্নে মনেই ঠাওয়র কইর‍্যা নিছে, বিন্‌হুকুমে পরের কামে যাওয়নে সে যে চাকরের উপ্‌রে রাইগা আগুন হইয়্যা বইসা রইছে, হৈরার তা বুইঝ্‌ব্যার বাকী আছিল না। সে তাই বাড়ীর সাম্‌নে দিয়া সরাসর না ঢুইকা কাঞ্চি কোনা ঘুইর‍্যা একিকালে মাঠা-গেনের হবিষ্যিঘরের আঙ্গিনায় যাইয়্যা খাওয়নের লাইগা হাজির হৈল। কিন্তু হৈরার নছিপের ফ্যারে গয়ানাথ তখন বাড়ীর মধ্যেই আছিল। হৈরার আওয়াজ শুননমাত্রই সে পায়ের খরম খুইলা এমনভাবে হৈরার উপ্‌রে রুইখা খারাইল যে সে ফ্যাল ফ্যালাইয়া রাইমণির দিগে তাকাইতে তাকাইতে ভয়ের চোটে দুই এক পাও কইর‍্যা না পাইছায়্যা থাক্‌ব্যার পাইর্‌লো না। গয়ানাথের ব্যবহার রাই-মণির কাছে আইজ ভারি অসহ্য ঠেইক্‌ল। সে রাগের মাথায়, তার বাড়ীর থিকা তারি চাকরেরে খেদায়্যা দেওয়ানের কোন একতারই যে গয়ানাথের নাই, এই ভাবের একটা কথা খুব রুঁইঠা সুরে কইয়্যা ফেলাই-ল।

এত বড় একটা খোটা সওয়নের মতন ম্যাজাজ গয়ানাথের কুষ্টিতেই লেখা নাই। সে যে পরের খায়্যা মানুষ, এই কথা সে সাক্ষাতে অসাক্ষাতে পারাপোর্শিগোরে মুখে যখন তখনই শুইনত,

আর তার কোনই শোধ না তুলব্যার পাইর‍্যা মনে মনে ইলাগাৎ আশ্রয়দাতারেই দোষী ঠাওরায়্যা আইস্‌ব্যার লাইগ্‌ছিল ; তার উপুরে আবার চাকরের মোকাবিলায় এই দারুণ অপমানের খোটা আইজ্ তারে রাগের মাথায় দুপুইরা চাড়াল কইর‍্যা তুইল্‌ল। সে হাতের খরম ফেলায়্যা চক্ষের পলকেই একটা পাইট্‌খেল কুড়ায়্যা আইন্‌ল, হৈরা যখন চিক্‌খইর দিয়া উঠ্‌ছে তখন গয়ানাথের জোরে ফেইকা দেওয়া পাইট্‌খেলের গুতায় রাইমণির মাথা খণ্ড বিখণ্ড হইয়্যা গেছে, তার নিসস্থিৎ শরীর রক্তে মাথাচোখা হৈয়া মাটিতে লুটাইবার লাইগ্‌ছে।

বেলা তলানের আগেই যার যার মতো কিছু কিঞ্চিৎ ট্যাকে গুইজা গায়ের যত মুরুব্বি-মাতব্বর এই ব্যাপারটীরে পানে চুনে মিশানের মতন নিভাজে হজম করণের লাইগা এক জুঠ্‌ হৈল। সদ্য খুনের দিন বৈলা স্মৃতিচুরামণি মশয় সে দিন আর ঐ দলে যোগ দিলেন না কিন্তু পরের দিন তিনির মোকাবিলা গয়ানাথ যেমুন রাইমণির পাওনা টাকার খতখান ফাইরা ফ্যালাইল, অমনি তিনর মনে বাওয়নের জাইৎ রাখনের লাইগা ফট্ কৈরা ধর্ম্মভাব উৎলায়্যা উঠ্‌ল। তিনি পাচ জনের সাথে একমত ত হৈলেন-ই—তার উপুরে বাওয়নের ছাওয়াল জেলে গেলে তার যে জাইৎ যায়, আর যে গায়ের বাওনের জাইৎ যায় সে গায়ের চেংড়া বুইড়া বৈবাকেরেই যে পাপপঙ্কে ঘিরা ধরে, ও তার ফলে যে হাজার বচ্ছর কণ্ডুক-নরক ভুগণ লাগে, এই সকল শাস্তর প্রমাণের কথা গায়ের দশ জনেরে নিজে থিকা ডাইকা আইনা শুনাবয়ার লইগ্‌লেন।

অনেক দূরে থাইকাও যেমুন মরা জীবজন্তু শকুণের নজর এরায় না, লাভের তদন্তও সেই রকম গায়ের চোকিদারে চাপা দিলেও

থানার দারগাগোরে কাণে ঠিক মত পৌছে। গায়ের লোকের সাব্যস্ত থাকন সত্বেও রাইমণির মরণের চাইর দিনের দিন দারগা আইসা গায় অধিষ্ঠান হৈল। তখন মুখে কেউ কিছু না কৈলেও মুরুব্বিগোরে বেবাকেরি পাচ পরাণ তলে তলে থগড় বগড় কইর‍্যা উঠ্‌ল। কিন্তু দারগাসায়াব যখন সরাসর আসামীর বাড়ীতে না ঢুইকা তিনু সরকারের বাড়ীতে আড্ডা নিলেন, তখন সকলের মনেই অল্পবিস্তর সাহস জইম্‌ল। গায়ের মধ্যে তিনু সরকার দারগা পুলিশের ওয়াকিব জানা লোক। আরো কয়েকবার এই গায় দারগা তদন্তে আইছিল তখন তিনুই মধ্যে পইরা সব গোলমাল অল্পে সল্পে মিটায়্যা দিছে। আসামীরে ধৈরা আননের জন্যে কনেষ্টবল পাঠানের আগেই তিনু নিজেই যাইয়্যা গয়ানাথেরে সাথে কইরা, আইনা দারগার স্বমুখে হাজির কইরা দিল। দণ্ডেকের মধ্যেই বাওয়নের জাইৎ বাচানের লাইগা দারগাবাবুও গায়ের মুরুব্বিগোরে সাথে এক মত হৈলেন, ও সেলামীর টাকা তিনশ কনেষ্টবলেরে গইনা নিবার কইয়া, গুরগুরির নলটা মুখে গুইজা দিলেন। এম্‌নি কইরা দারগা বাবুর চিৎ যখন ঠাণ্ডা হইয়্যা আইল তখন তিনি গায়ের পাচ জনের দিগে ফিরা বইসা, পারাপর্শিরা ইয়া নিয়া যাতে আর কোন সুর গোল না করে, তারির পরামিশ দিবার লাইগ্‌লেন ; এমুন সুমে পূব পাড়ার মুরুব্বি রূপলাল, রাইমণির চাকর হৈরারে সাব্যস্ত কইরা দিয়া যাওয়নের কথা জানায়্যা হুজুরের সাম্‌নে হাত জোর কইর‍্যা খারাইল।

খুনের মোকাবিলা সাক্ষী মাত্র হৈরা। তার মুখ বুজানের জন্যে বেবাকের আগে গায়ের মুরুব্বিরা তারি একলার হাতেই পচিশ টাকা দিব্যার গেছিল, কিন্তু সে দুই হাতে মুখ ঢাইকা সেই যে উইঠা গেছে

তারপরে ইলাগাং কেউই আর তার লাগুর পায় নাই। ছোট কালের থিকাই সে আছিল রাইমণির চাকর। সগণ সরীক কেউ ত তার নাইই, বৈরাগী ফকিরেরও নিজের একখান ডেরা কুইরা থাকে তার তাও নাই। রাইমণির মরণের পরদিন থিকা গায়ের বাওয়ন ভদ্র বেবাকেরেই যখন সে গয়ানাথের পক্ষ নিতে দেইখ্‌ল সেই দিন থিকা সে আর কেউর বাড়ীতেই যায় নাই। আইজ কয়দিন ধইরা সে তার ছোট-কাইলা মিতা হরি মালির কাছে আশ্রয় নিছে। মাঠাগেনের শোকে তার কৈলজাটা যে ফাট্ ফাট্ করে তা সে তার মিতারেও বুঝায়্যা উঠ্‌ব্যার পারে নাই।

হৈরা আইসা দারগার কাছে খারাইতেই ইকয়দিনকার চাপা কান্দন তার মুখ চইখ্ ছাপায়্যা বাইরয়া পৈল। খানিক বাদে কান্দন থাইমা আইলে, সে যেমুন তার মাঠাগেনের খুনের নালিশ হুজুরের কাছে মনের খেদ মিটায়্যা জানাইব ভাইবা একটু থির হইয়্যা রইল, ঠিক সেই সুমে দারগা তারে ঠাণ্ডা হৈতে দেইখা সে যাতে আর এই খুনের বিষয় নিয়া কোন রকম সুরগোল না করে, এই কথা ফিরা ফিরা দুই তিন বার তারে বুঝায়্যা কইলেন আর তিনির কথামতন না চইল্‌লে তার নিজেরও ফাস্যাদে পড়ন লাইগ্‌ব ইয়াই বৈলা একটু শাসায়াও রাইখ্‌লেন। দারগার ই-সকল কথায় হৈরা হাঁ হুঁ কিছুই না কইয়্যা ক্যাবল থম্ ধইরা বইসা রইল। ইয়ারি মধ্যে দারগা সায়াব তিনু সরকারেরে কি য্যান্ ইসারা কইর্‌লেন আর সে উইঠা গয়ানাথের হাতে থিকা গোণা পনরটা টাকা নিয়া হৈরার মুঠের মধ্যে রাখ্‌তেই সে হেচ্‌লা টান দিয়া হাত ছারায়্যা আইন্‌ল, ফলে তার হাতের উছটে তিনুর হাতের বেবাক টাকা ঘরময় ছরায়্যা পইল, এবং

তারি একটা টাকা দারগার ডেনায় ছিটা পরলে, তিনি রাইগা অগ্নি-শর্ম্মা হৈলেন। তিনির মুখের ভিরকুটী ও চইখের ভাব দেইখা আর কেউ কিছু ঠাওয়র না পাইলেও তিনুর বুঝতে বাকী রইল না যে হৈরার শ্রীমন্দিরে যাওয়ন ঠেকানের লোক আর ই পিরথিমিতে কেউই নাই।

সাত দিন পরে মহুকুমার মাজিষ্টরের এজলাসে হৈরার বিরুদ্ধে,—থানায় খুনের মিথ্যা এজাহার দেওয়ন আর দারগা রাসবিহারী দাসের উপ্রে খামাখা রুইখা যাওন, এই দুই অপরাধের দুই নম্বর মামলার বিচার এক সাথেই সারা পাইল। স্বয়ং দারগার জোবানবন্দী হওয়নের পরেই তিনু সরকার সাক্ষীর কাঠগরায় খারাইল। তার জোবানবন্দীর সুরুতে রাইমণি সন্ন্যাস রোগে মইরা গেছে তক শুন্তেই হৈরার মুখে চইখে কেমুন য্যান্ একটা চমক্ লাইগ্তে দেখা গেল। বোধ করি, সাক্ষীর কথায় আসামীরে চইম্কা উঠ্তে দেইখাই সে যে পূরা অপরাধী মাজিস্টর তা মনে মনেই ঠাওয়র পাইলেন। তার পরে মাত্র রূপলাল আর একজন কনেষ্ঠবলের সাক্ষী নিয়া, আরও যে অনেকে রাইমণির সন্ন্যাস রোগে মরণ আর দারগা সায়াবের উপ্রে হৈরার খামাখা রুইখা যাওয়নের কথা ঠিক ঠিক কৈবার আইচিল, উবুরস্ত ও অতিরিক্ত বৈলা হাকিম তাগোরে বেবাকেরেই কাচারির বাইর থিকাই বিদায় দিলেন।

দণ্ডেক কাল বইসা মাজিষ্টর রায় লেইখ্লেন পরে আসামীরে যখন দুই বছর ফাটকের কথা পইরা শুনান হৈল, তখন তার মুখের ভাবের কিছুই বদল দেখা গেল না।

শ্রীসুরেশানন্দ ভট্টাচার্য্য।

বিদ্যাপতি।

—:*:—

পলিটিক্সের রঙ্গমঞ্চে পেট্রিয়টিজ্‌ম্ জিনিসটার যে-রকম মূল্যই থাক্ না কেন বাণীর মন্দিরে কিন্তু তার কোন আসন নেই। যদি বা থাকে ত সেটা নিতান্তই নীচু—আর একান্তই এক কোণে। এই পেট্রিয়টিজ্‌ম্‌কে সঙ্গে নিয়ে যদি আমরা বাণীর মন্দিরে প্রবেশ করি তবে বীণাপাণীকেই আমরা খাট করব—আর তাতে সবার চাইতে সবার আগে ক্ষতি হবে পেট্রিয়টিজ্‌মেরই। আমরা যে আজকাল সময়ে অসময়ে সভাসমিতিতে ঘরে বাইরে সুযোগ পেলেই আমাদের বৈষ্ণব কবিদের সম্বন্ধে একটা আকাশ-পাতাল জোড়া মত প্রকাশ করি—বিশ্ব-সাহিত্যের মাঝে তাদের প্রত্যেকের জন্যে এক-একখানি হীরক-মুক্তা-খচিত রত্নসিংহাসন পেতে দিয়ে প্রশংসমান নেত্রে গদগদভাবে বলি—আঃ কি সুন্দর—এমন আর হয় না—এমন আর হবে না—হতে পারে না—সে-সবের মাঝে আমাদের পেট্রিয়টিজ্‌ম্ জিনিসটা কতখানি আছে তা জানি নে—কিন্তু তার মধ্যে যে এই পেট্রিয়টিজ্‌ম্ জিনিসটার একটা বড় রকম এলোপ্যাথিক ডোজ্ থাকার সম্ভাবনা থাক্‌তে পারে—সেই কথাটাই এখানে ব'লে নেওয়া আমার উদ্দেশ্য।

বর্ত্তমান প্রবন্ধে এই বৈষ্ণব কবিদেরই একজন—বিদ্যাপতির সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা কর্‌বার ইচ্ছা করি। এই প্রবন্ধটী নিয়ে আমি

বিদ্যাপতিকে সার্টিফিকেট দিতে যাচ্ছি নে—সেটা ধৃষ্টতা বলেই মনে করি। বিদ্যাপতি যে কবি—একজন প্রকৃত কবি সে সম্বন্ধে বোধ হয় দু'মত নেই। বাস্তবিক—

শৈশব যৌবন দুহু মিলি গেল।
শ্রবনক পথ দুহু লোচন নেল॥

চৌঙকি চলয়ে ক্ষণে ক্ষণে চলু মন্দ।
মনমথ পাঠ পহিল অনুবন্ধ॥

কবরী ভয়ে চামরী গিরি-কন্দরে
মুখ ভয়ে চাঁদ আকাশে।
হরিণী নয়ন ভয়ে স্বর ভয়ে কোকিল
গতি ভয়ে গজ বনবাসে॥

সজনি ভাল করি পেখন না ভেল।
মেঘমালা সঞে তড়িত-লতা জনু
হৃদয়ে শেল দেই গেল॥
আধ আঁচল খসি আধ বদনে হাসি
আধ হি নয়ান তরঙ্গ।
আধ উরজ হেরি আধ আঁচর ভরি
তদবধি দগধে অনঙ্গ॥

নব বৃন্দাবন নবীন তরুগণ
নব নব বিকশিত ফুল।
নবীন বসন্ত নবীন মলয়ানিল
মাতল নব অলিকুল॥

—এ রকম আরও কতও আছে—এ সবের মধ্যে যে সুর ও সৌন্দর্য্য রয়েছে তা বাঙ্গালী হ'য়ে যিনি উপভোগ করতে পারেন নি তাঁর দুর্ভাগ্যই বলতে হবে। আমার উদ্দেশ্য হচ্ছে বিদ্যাপতির পদাবলীর মূল কথা যেটা সেইটে নিয়ে একটু অলোচনা করা।

(২)

এমন অনেক সমালোচক আছেন যাঁরা বলেন যে বৈষ্ণব পদাবলী কুনীতি কুরুচি ও অশ্লীলতা পূর্ণ। সুতরাং এ-গুলোর কোন মূল্য নেই—বড় জোর এ-সব নিকৃষ্ট শ্রেণীর কবিতা। তাঁরা বলেন যে এই সকল কবিতার সংসর্গে এসে নরনারীর মন চঞ্চল ও অশুচি হ'য়ে ওঠ্বার সম্ভাবনা—তাতে সমাজের অমঙ্গল। আর্থাৎ এই সকল সমালোচক যখন কাব্য সমালোচনা করতে বসেন, তখন তাঁরা শুধুই কাব্য-সমালোচকই নন সেই সঙ্গে সঙ্গে তাঁরা নীতিবিদ্‌ও বটেন আবার সমাজপতিও বটেন। আর আমাদের ত এটা চোখে দেখা যে Judicial Executive এক জনের হাতে থাক্‌লে বিচারে ভুল হবার সম্ভাবনা পদে পদে। এই শ্রেণীর সমালোচকের বিচারটা কতকটা এই রকমের।

আসল কথা হচ্ছে এই পৃথিবীতে কেউই কবির dictator হতে পারে না—তা তিনি নীতিবিদই হন, সমাজপতিই হন, বা নবাব সিরাজদ্দৌলার নাতিই হন। কবির লেখায় যদি সমাজের অমঙ্গল হয় তবে সমাজপতি সে কবিকে কারাগারে রুদ্ধ করতে পারেন কিন্তু তাঁর দ্বারা নীতির তত্ত্ব লিখিয়ে নিতে পারেন না। কবি কি লিখবেন

তার উপরে সমাজপতি নীতিবিদের হাত ত নেইই খোদ কবিরও বড় বিশেষ নেই। কারণ কবিতার জন্ম যেখানটায় সেখানে কবির মনোময় পুরুষ পৌঁছিতে পারে না। কবির যেখানে এই কবিতার জন্ম হচ্ছে সেখানটা কুনীতি সুনীতি, শ্লীল অশ্লীল জুড়ে বসে নেই—সেখানটা জুড়ে বসে আছে সত্য ও আনন্দ। যখন সেই জগৎ থেকে আনন্দের ঠেলা খেয়ে সত্য, সুর ও সৌন্দর্য্যকে সঙ্গে নিয়ে কবির মনোরাজ্যে নেমে আসে, তখন কবি বসে যান তাতে শব্দ যোজনা করতে—আর তখনই আমরা পাই কবিতাকে। কবি তখন দেখে সত্যকে, পায় সৌন্দর্য্যকে, অনুভব করে আনন্দকে। শ্লীল অশ্লীল কুনীতি সুনীতি প্রভৃতি কথা ভাববার অবসরই নেই তখন তার। সে তখন এমন একটা জগতে, যে-জগতটা এই অজ্ঞান ও বদ্ধ পৃথিবীর চাইতে মুক্ততর, সত্যতর, দীপ্ততর। আর এই পৃথিবী দিয়ে সেই সত্যময় আনন্দময় জগতটাকে শাসন করবার চেষ্টাটা আমাদের ডন্ কুইক্‌সোট্ ও স্যাঙ্কো পাঞ্জারই কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে যায়। কাজেই নিরঙ্কুশা হি কবয়ঃ—সে-কালেও এ-কালেও ব্যাকরণেও আচরণেও।

অপর পক্ষে আবার আছেন কৃষ্ণভক্ত পরম বৈষ্ণবেরা। তাঁরা আমাদের দিকে চোখ রাঙিয়ে বল্‌বেন—সাবধান লেখক—এ সব পদাবলী নিয়ে খেলা নয়। এ সব হচ্ছে রাধাকৃষ্ণের চিরন্তন লীলা—অমূল্য রত্ন—এ সবের উপরে কলম চালাতে যেও না—সাবধান। আমরা বল্‌ব রাধাকৃষ্ণের লীলা বটে কিন্তু লেখা মানুষের। কৃষ্ণভক্ত বল্‌বেন—মানুষ, সে কি সাধারণ মানুষ! তাঁরা ছিলেন সব ভক্তশ্রেষ্ঠ পরম সাধক! আমরা উত্তরে বল্‌ব যে—পরম সাধক হলেই চরম

সাহিত্যিক হয় না—শ্রেষ্ঠ ভক্ত হলেই উৎকৃষ্ট কবি হয় না। আসল কথা হচ্ছে যে রাধাকৃষ্ণ বড় মহাজন বটে কিন্তু সেই বড় মহাজনের নামের ছাপ মেরে সাহিত্যের বাজারে আমরা কোন মালই বিনপরখে চালিয়ে নিয়ে যেতে দেব না। বড় লোকের হাতে আংটী থাকলে সাধারণ লোকে সেটাকে সোনার আংটী বলে' মনে করুক কিন্তু যে স্বর্ণকার তাকে দেখতে হবে পরীক্ষা করে', সে-আংটী বাস্তবিক সোনার না পিতলের।

গৌরাঙ্গভক্ত পরম বৈষ্ণবের পায়ের ধুলো নিয়ে আমরা জীবন কৃতার্থ মান্‌তে পারি এবং তিনি যখন মৃদঙ্গ দেখে ভাবে আত্মহারা হয়ে অশ্রু বর্ষণ করেন তখনও কারও আপত্তি করবার কারণ ঘটে না। কিন্তু বাদ্যযন্ত্রের বিচারকালে যদি তিনি বলে' বসেন যে, সকল বাদ্য-যন্ত্রের সেরা বাদ্যযন্ত্র হচ্ছে মৃদঙ্গ তখন তাঁর সঙ্গে তর্ক লাগবেই—তখন আমাদের বল্‌তেই হবে যে বাদ্যযন্ত্র হিসাবে বীণার স্থান মৃদঙ্গের চাইতে অনেক উঁচুতে—তা তিনি আমাদিগকে গালাগালিই দিন, ভক্তিহীন নরাধমই বলুন আর যাই করুন।

(৩)

এতক্ষণ এক রকম ভূমিকাতেই কেটে গেল। এইবার আসল কথা পাড়ব।

বলেছি যে বিদ্যাপতির পদাবলীর আসল কথাটা নিয়ে একটু আলোচনা কর্‌ব। এই আসল কথাটী কি? সেটি হচ্ছে প্রেম—মধুর প্রেম। প্রমাণ,—এতে পূর্ব্বরাগ, অভিসার, বিরহ, মিলন ইত্যাদি

মধুর প্রেমের যা কিছু আনুষঙ্গিক সব আছে। এখন একটা প্রশ্ন করা যেতে পারে এই যে--প্রেম ত বোঝা গেল—কিন্তু কার প্রেম?

যাঁরা একটু আধ্যাত্মিক ছাঁচের লোক তাঁরা অত্যন্ত গম্ভীর হ'য়ে বল্‌বেন যে এ-প্রেম পরমাত্মার সঙ্গে জীবাত্মার—যাঁরা একটু পৌরাণিক ধাঁচের তাঁরা নিতান্ত আশ্চর্য্য হয়ে ভাববেন—কার প্রেম? এ প্রশ্ন আবার ওঠে কেন! স্পষ্টই ত লেখা রয়েছে এ সব রাধা-কৃষ্ণের প্রেম। এঁরা দু' দলই হয়ত ঠিক। কিন্তু আমরা হচ্ছি সাধারণ লোক—আমরা বল্‌ছি যে এ প্রেম জীবাত্মা পরমাত্মারও নয়, রাধাকৃষ্ণেরও নয়—এ প্রেম হচ্ছে বিদ্যাপতির নিজের। বিদ্যাপতির যে পদাবলী তার প্রত্যেক লাইনটীর প্রত্যেক শব্দটীর প্রত্যেক সুরটীর পিছনে রয়েছে বিদ্যাপতির অনুভব—বিদ্যাপতির দৃষ্টি—বিদ্যাপতির আনন্দ। এক কথায় বিদ্যাপতির পদাবলীর পিছনে রয়েছে মানুষেরই হৃদয়ের স্পন্দন—মানুষের অনুভবেরই অনুবাদ। আর সেই জন্যেই এ সব পদাবলী রাধাকৃষ্ণের নাম করে' চিরকাল মানুষকে ফাঁকি দিয়ে যাওয়া শক্ত। কারণ প্রেম জিনিসটা সম্বন্ধে সব মানুষেরই বেশী কম অভিজ্ঞতা আছে। কিন্তু সেটা ধীরে ধীরে আস্‌ছে।

এখন দ্বিতীয় প্রশ্ন উঠ্‌তে পারে যে বিদ্যাপতির প্রেম হোক্ - কিন্তু কার প্রতি প্রেম সেটাও ভাবা উচিত। আমরা বলি যে তার কোনই দরকার নেই। কারণ কাব্যে প্রেম কতখানি মহীয়ান গরীয়ান সত্য হ'য়ে উঠ্‌বে তা কবি কাকে ভালবেসেছেন তার উপরে নির্ভর করে' না মোটেই। নির্ভর করে এর উপরে যে কবি কেমন ভালবেসেছেন—আর তার কতখানি আত্মপ্রকাশকের ক্ষমতা—তাঁর প্রতিভার ওজনই বা কত। রজকিনীকে ভালবেসেও চণ্ডীদাস প্রেমের মহীয়ান্ রূপের দর্শন পেলেন—আর

সেটা ঐ উপরে যা বলা গেল তারি সত্যতা প্রতিপন্ন করছে বলেই মনে করি। আসল কথা হচ্ছে এই যে মানুষের যে প্রেম তা ভগবানের প্রতিই হোক্ বা মানুষের প্রতিই হোক্ দুইই তাকে এক রকম অমৃতই মিলিয়ে দেবার ক্ষমতা রাখে। কারণ প্রেমের যে অমৃত মিলিয়ে দেবার ক্ষমতা সেটা ভগবানেও নেই—প্রেমপাত্র ও প্রেমপাত্রীতেও নেই—সেটা আছে প্রেমের মধ্যে—প্রেমিক প্রেমিকার প্রেম অনুভব করবার শক্তির মধ্যে—তাদের প্রেমানুভূতির গভীরতা ও একনিষ্ঠতার মধ্যে। সুতরাং বিদ্যাপতির প্রেম শ্রীকৃষ্ণের প্রতি না শিবসিংহের অন্তঃপুরবাসিনী কোন কিশোরীর প্রতি তা নিয়ে মাথা ঘামাবার আমাদের দরকার নেই। আমরা দেখ্‌তে চাই তাঁর কাব্যে আমরা কি পাই। আর সে জন্যে বৈষ্ণব কবিদের আলোচনা কালে এ কথাটা আমাদের মনে রাখা খুব দরকার যে আধ্যাত্মিক-যোগ সাধনা আর কাব্য-রচনা এক কথা ত নয়ই—এ দুয়ের এক প্রথাও নয়। কারণ কাব্য-রচনাটা এক প্রকারের সাধনা বলে' মেনে নিলেও সব রকমের সাধনাই যে কোন প্রকারের কাব্য তা স্বীকার করতে পারে তারাই যাদের মস্তিষ্ক আর হৃদয়টা ঠিক্ অ্যানাটমির নিয়ম রক্ষা করে' সৃষ্ট হয় নি।

বৈষ্ণব কবিদের কথা উঠ্‌লেই যে আমরা "আধ্যাত্মিক" "যোগ-সাধনা" ইত্যাদি ইত্যাদি কতগুলো বাঁধিগৎ আওড়িয়ে তাঁদের কাব্যের চার পাশে একটা Mystery-র কুয়াশা সৃষ্টি করি সেই কুয়াশা কতকটা দূর করবার প্রয়াসেই উপরের অতগুলো কথা বলা গেল—নইলে কথাগুলো বোধ হয় অবান্তর। যা হোক্ এখন বিদ্যাপতির পদাবলীর আসল কথাটার দিক থেকে একটা মূল্য দেখ্‌তে চেষ্টা করব। এই আসল কথাটা হচ্ছে মধুর প্রেম।

(৪)

বিদ্যাপতির কাব্যের একটা সঠিক মূল্য নির্দ্ধারণ করতে গেলে তাঁর একটী কবিতাকে বাদ দেওয়া দরকার। সেটী হচ্ছে সেই সর্ব্বস্থানে সর্ব্বজনোদ্ধৃত কবিতাটী—

সখি কি পুছসি অনুভব মোয়।
সেহ পীরিতি অনুরাগ বাখানিতে
তিলে তিলে নূতন হোয়॥
জনম অবধি হাম রূপ নেহারিনু
নয়ন না তিরপিত ভেল।
সেহ মধুর বোল শ্রবনহি শুনলু
শ্রুতি পথে পরশ না গেল॥
কত মধু যামিনী রভসে গোঁয়ায়িনু
না বুঝনু কৈছল কেলি।
লাখ লাখ যুগ হিয়ে হিয়ে রাখনু
তবু হিয়া জুড়ল না গেলি॥ ইত্যাদি॥

এ-কবিতাটী বাদ দেওয়া দরকার এই জন্যে যে এটী দিয়ে বিচার করতে গেলে বিদ্যাপতির কাব্য সম্বন্ধে একটা ভুল ধারণাই হবার সম্ভাবনা। কারণ এ কবিতাটী বিদ্যাপতির অন্যান্য পদাবলী থেকে এত বিভিন্ন—এত উঁচুতে যে হঠাৎ মনে হয় এটা বুঝি প্রক্ষিপ্ত। এই কবিতাটী দাঁড়িয়ে উন্নতশিরে বিদ্যাপতির বিরুদ্ধে সাক্ষী দিচ্ছে। বলছে—দেখ দেখ—আমি কি হতে পারতেম—অথচ কি হই নি—আর সে দোষ বিদ্যাপতি ঠাকুরের। আমার মনে হয় এই কবিতাটীতে

চণ্ডীদাসের ভাব বিদ্যাপতির ভাষার পোষাকে একেবারে নিখুঁত সুন্দর হ'য়ে ফুটে উঠেছে।

এ কবিতাটী পড়ে আমাদের অন্তরে যে ছবি ফুটে ওঠে সে এ-লোকের নয়—সেটা স্বলোকের। মানুষের অন্তরে যে একটা প্রেমের এম্‌নি পারাবার আছে যার তল সে নিজেই বুঝে উঠ্‌তে পারে নি তার পরিচয় এ কবিতার প্রত্যেক ছত্রে আছে। এই গ্রামটায় আমরা প্রেমের যে সুর শুন্‌তে পাই সে-সুর বোধ হয় কতকটা পরিমাণে আর একটা কবিতায়ও আছে—সেটা হচ্ছে সেই যার আরম্ভ "আজু রজনী হাম ভাগ্যে পোহায়নু পেখনু পিয়া-মুখ-চন্দ" দিয়ে। কিন্তু এ ছাড়া বিদ্যাপতির আর যে-সব পদাবলী তার জন্ম প্রেমলোকে হয় নি—তার জন্ম হয়েছে কামলোকে।

কথাটা শুন্‌তে বোধ হয় একটু কড়া শোনায়—কিন্তু উপায় কি? যখন পড়ি—

কি লাগি বদন ঝাঁপসি সুন্দরী
হরল চেতন মোর।
পুরুখ বধের ভয় না করহ
এ বড়ি সাহস তোর॥ ইত্যাদি

তখন এ-সব পদের ভিতর দিয়ে বিদ্যাপতি ঠাকুরের হৃদয়-প্রেমের কোন ধারা আমাদের অন্তরকে স্পর্শ করে' যায় না—আমাদের মনে অন্য রকমের ছবি ফুটে ওঠে। হাফেজের একটী কবিতা আছে—

ছড়ায় রাজার পথে তারা
মণি মুক্তা কতই না জানি;

আমি কিন্তু মোর প্রিয়া লাগি
আঁখিতে বাঁধাব পথ খানি।

তবুও এ অনুবাদ—কিন্তু এর পিছনে হাফেজের যে একটা অনুভবের অনুভব আমরা পাই বিদ্যাপতির কাব্যে তা কোথাও পাই নে—অবশ্য বলেছি ঐ একটী কবিতা ছাড়া যেখানে বলা হয়েছে যে সে-প্রেমের ব্যাখ্যান কর্‌তে "তিলে তিলে নূতন হোয়"। কেউ কেউ মনে কর্‌তে পারেন যে আমি আমার মত সমর্থন কর্‌বার জন্যে খুঁজে খুঁজে বহু কষ্টে ঐ একটী পদ বের করে' এখানে লাগিয়ে দিয়েছি। কিন্তু যাঁদের বিদ্যাপতির কাব্যের সঙ্গে পরিচয় আছে তাঁরাই জানেন যে তাঁর পদাবলীতে আগা থেকে গোড়া পর্য্যন্ত হৃদয়ের কথার চাইতে হৃদয়জের ব্যথাই বেশী। আর হৃদয়জ জিনিসটা প্রেমলোকের গানের বিষয় নয়—সেটা হচ্ছে কামলোকের ধ্যানের বস্তু।

দেশী বিদেশী অনেক প্রেমিক-কবির কবিতা তুলে তার সঙ্গে তুলনা করে' বিদ্যাপতির প্রেমের গানের যে কি পার্থক্য তা দেখান যেতে পারে কিন্তু তাতে পুঁথিই বেড়ে যাবে আর তার দরকারও নেই। কেননা বিদ্যাপতির কাব্য নিজ গুণেই স্বপ্রকাশ হ'য়ে আছে—তা বুঝবার জন্যে আর কারও কাছে যাবার দরকার নেই। বিশেষতঃ প্রেম জিনিসটা এমন একটা দ্রব্য যার গুণ সম্বন্ধে সব মানুষেরই অল্প বিস্তর অভিজ্ঞতা আছে। সেই অভিজ্ঞতাটা একবার খতিয়ে দেখবার চেষ্টা করা যাক।

একাল পর্য্যন্ত মানুষ প্রেমের তিনটী রূপের দর্শন লাভ করে' এসেছে। প্রথমটী হচ্ছে—নিছক কাম। এতে নাসিকা কুঞ্চিত

করবার কিছু নেই। কারণ এও একটা ভগবান-স্বষ্ট সত্য। এর প্রতিষ্ঠা হচ্ছে মানুষের ইন্দ্রিয়ের উপরে—তার দেহের অণু-পরমাণুর যে চৈতন্য তার উপরে—তার অন্নময় কোষের instinct-এর উপরে। এও এক প্রকারের প্রেম। এ প্রেমের আনন্দ অতি পরিমিত, অতি সীমাবদ্ধ—কেননা অন্নের সীমা আছে আর সেইজন্যই এটাকে আমরা নিকৃষ্ট প্রেম বলি—কারণ মানুষকে এর আনন্দ দেবার ক্ষমতা অতি কম। এই প্রকারের প্রেমেই জন্মেছে ভারতচন্দ্রের বিদ্যাসুন্দর, বায়রণের ডন্ জুয়ান, বোকাচ্চেয়োর ডিক্যামেরন। দ্বিতীয় প্রকার হচ্ছে কাম এবং প্রেমের একটা কেমিকেল কম্পাউণ্ড গোছের। এইটী হচ্ছে বিশেষ করে' মানবীয় প্রেম। সাধারণতঃ মানুষের অন্তরে কাম ও প্রেম এমনি ভাবে জড়াজড়ি করে' থাকে যে এর একটাকে বাদ দিয়ে আর একটাকে প্রায় সে বুঝতেই পারে না। মানুষের অন্তরে এই প্রকার প্রেমের মধ্যে কামের ডোজ যত কমে আস্‌তে থাকে আর প্রেমের ভাগ যত বেড়ে যেতে থাকে তার আনন্দের অনুভবও তত পরিপূর্ণতর হতে থাকে। কেননা কামই মানুষের সীমা দেয়—কামই মানুষকে সকাম করে' তোলে—আর মানুষ সকাম যেখানে সেখানে তার দুঃখের চাইতে সুখ কম—অমৃতের চাইতে অশান্তি বেশী। এ প্রেমের প্রতিষ্ঠা হচ্ছে মানুষের হৃদয়ে। তাই এ প্রেমের আনন্দেরও সীমা আছে। কারণ মানুষের হৃদয় ক্ষুদ্র না হলেও তা অসীম নয়।

এ দুই প্রকার ছাড়া তৃতীয় রকমের এক প্রেম আছে যেটা মানুষ সাধারণ ভাবে অনুভব না কর্‌লেও অসাধারণ ভাবে মাঝে মাঝে তার খবর সে পেয়েছে। সেটা হচ্ছে নিছক বিশুদ্ধ প্রেম। এই প্রেমের অনুভবেই অমৃত—এ প্রেমের আনন্দের পূর্ণতা বাইরের মিলনকে

উপেক্ষাও করে না—আবার তার অপেক্ষাও রাখে না—এ প্রেম স্বরাট, যা নিজগুণেই মানুষকে অমৃত পাইয়ে দেয়। এ প্রেমের মানুষকে অমৃত পাইয়ে দেবার ক্ষমতা অসীম—কারণ এ প্রেমের প্রতিষ্ঠা সেইখানে যেখানে মানুষের সীমা নেই। কেউ কেউ হয়ত বল্‌বেন যে আমি বাজে বক্‌ছি—বড় জোর একটা থিওরির সৃষ্টি কর্‌ছি। এর ছাপাই স্বরূপ বল্‌ছি যে এই প্রকার প্রেমের ইঙ্গিতই চণ্ডিদাসের পদাবলীতে অনেক খানে আছে—অবশ্য তাও অনেক স্থলেই তত্ত্ব হিসেবে—কাব্য হিসেবে নয়। কারণ একথা আজকাল সবাই মানেন যে তত্ত্বকথা পদ্যে গাঁথলেই তা কাব্য হ'য়ে উঠতে বাধ্য নয়।

এই যে তৃতীয় রকমের প্রেম এইটে হচ্ছে উত্তম প্রেম। কারণ এ প্রেমের অনুভব যখন মানুষ পায় তখন তার পূর্ণ আনন্দ—তখন তার প্রেমে দুঃখের লেশমাত্র থাকে না। কারণ এ প্রেমে ব্যর্থতার স্থান নেই—কেননা এ প্রেমের অনুভবের মধ্যেই মিলন রয়েছে—আর তার কারণ হচ্ছে এই যে দৈহিক মিলনটা যতটা স্পষ্ট ততটা সত্য নয়। আর প্রেমের সত্য ধর্ম্মই হচ্ছে মানুষকে আনন্দ দেওয়া—দুঃখ দেওয়া নয়। এ প্রেম উত্তম প্রেম কারণ এ প্রেমের আনন্দ দেবার ক্ষমতাও অসীম—কেননা বলেছি এর প্রতিষ্ঠা অঙ্গে নয়—অঙ্গের সীমা আছে—মানুষের হৃদয়েও নয়—হৃদয়ও অসীম নয়—এ প্রেমের প্রতিষ্ঠা তার চাইতেও ঊর্দ্ধলোকে। এ প্রেম সীমাকে আশ্রয় করে' অসীমে উন্মুক্ত হয়েছে—এ প্রেম রূপকে জড়িয়ে অরূপে বিকশিত হয়ে উঠেছে—তাই এ প্রেমে অঙ্গ পরিত্যক্তও হয় নি আবার তার আধিপত্যও রয় নি—ইন্দ্রিয়াদি মুছেও যায় নি আবার তার বন্ধনও

পড়ে নি—এই হচ্ছে সীমার মধ্যে অসীমের খেলা—রূপের মাঝে অরূপের প্রকাশ। আর এই হচ্ছে মানুষের আসল সত্যময় রহস্যটী যা দিয়ে সে তৈরি।

এখন আমরা প্রেমের কবিতার মধ্যে চাই এমন কতগুলো কথার সমষ্টি—এমন একটা সুরের ব্যঞ্জনা—এমন একটা ভাবের সঙ্গীত যার ভিতর দিয়ে আমরা খবর পাব এই উত্তম প্রেমের। কারণ ঐ দিকেই আমাদের গতি—ঐটেই যে আমাদের সত্য আর ঐটেই যে আমাদের অপ্রাপ্ত। যেটার সঙ্গে আমাদের সাক্ষাৎ সম্বন্ধে পরিচয় নেই—সেটার খবর আমরা পেতে চাই কবির অন্তরের ভিতর দিয়ে। কারণ কবি অন্যান্য লোক থেকে কিছু অসাধারণ। আমরা সাধারণ মানুষ যে লোকে যেতে পারিনে কবি সেখানে হামেশাই যাওয়া আসা কচ্ছেন। সুতরাং প্রেমের উৎকৃষ্ট গান বল্‌ব সেই সবকে যা আমাদিকে এই উত্তম প্রেমের অনুভব কতকটা করিয়ে দিতে পারে। আর যে গান যত বেশী করে'—যত গভীর করে'—যত স্পষ্ট করে' ঐ ভাব আমাদেকে অনুভব করিয়ে দিতে পারবে সে-গানকে আমরা তত উচ্চে আসন দেব। আর বিদ্যাপতির কাব্যে—বলেছি ঐ একটি কবিতায় ছাড়া—ঐ জিনিসটী আমরা পাই নে—অবশ্য সেটা জোর করে' বল্‌ছি নে—সেটা বল্‌ছি দুঃখ করে'।

বিদ্যাপতির হ'য়ে কেউ কেউ একটা কথা বল্‌তে পারেন যে যেখানে মধুর প্রেমের ভিতর দিয়ে আত্মায় আত্মায় মিলন হয়েছে সেখানে ত দেহের মিলন ঘটবেই—সেখানে ত পরস্পরের চোখে পরস্পরের দেহ সুন্দর হয়ে উঠ্‌বেই—সেই রহস্যই ত বিদ্যাপতির কাব্যে আমরা পাই। সত্যি কথা—আত্মার মিলন হ'লে দেহের মিলন হবেই। কিন্তু যখন

কাব্যে দেহের মিলনটাই প্রধান বক্তব্য বিষয় হ'য়ে ওঠে এবং আত্মার মিলনের সন্ধানও পাওয়া যায় না—তখনই মুস্কিলের কথা। কারণ প্রেমিক লেখক যেখানে আত্মার মিলনের ভিতর দিয়ে দেহের মিলনে এসে পৌছেচেন পাঠক সেখানে দেহের মিলনের গান শুনে আত্মার মিলনে পৌছিতে পারে না। কেননা দেহ আত্মাকে গড়ে নি—আত্মাই দেহের জন্ম দিয়েছে। সুতরাং আত্মার সঙ্গে সঙ্গে দেহ এলেও—দেহের সঙ্গে সঙ্গে আত্মাকে পাওয়া যায় না।

ভারতচন্দ্রের বিদ্যাসুন্দর পড়ে' যে বিদ্যা বা সুন্দরের অন্তরের প্রেমের কোন রূপ আমাদের মানস-চোখে ফুটে ওঠে না—সেটা সবাই একবাক্যে স্বীকার কর্‌বেন—কিন্তু বিদ্যাপতির পদাবলীর সম্বন্ধে যে মতভেদ হয় তার কারণ আমার মনে হয়—রাধাকৃষ্ণ নামের পুরাতন মাহাত্ম্য আর আমাদের মনের সনাতন জড়ত্ব। রাধাকৃষ্ণের নামের সঙ্গে এমন কতগুলো association of ideas আমাদের মনে আছে যে রাধাকৃষ্ণের নাম পেলেই সেটাকে আমরা সেই সব "ideas"-এর আতসীকাঁচের ভিতর দিয়ে দেখি—নইলে দশ জনের চোখে খেলো হ'য়ে যাওয়ার আশঙ্কাও যে একটু না আছে তাও নয়। রামায়ণ পাঠ হচ্ছে। বিশল্যকরণি না চিন্‌তে পেরে মহাবীর হনুমান সমস্ত গন্ধমাদনটাকেই নিয়ে যাবার মতলব আট্‌ছেন। এক নিরক্ষরা যুবতী কেঁদেই আকুল। তার পার্শ্ববর্ত্তী সঙ্গিনী জিজ্ঞেস কর্‌ল—"ওলো কাঁদিস্ কেন?" যুবতী বল্‌লে—"আহা কি কষ্ট।" সঙ্গিনী আশ্চর্য্য হ'য়ে জিজ্ঞেস কর্‌লে—"কার কষ্ট?" যুবতী উত্তর দিলে—"কেন! সীতার।" সঙ্গিনী বল্‌লে—দূর, এ যে হনুমানের কথা হচ্ছে।" "যুবতী তখন চোখ মুছে বল্‌লে—"ওমা আমি মনে

করেছিলুম বুঝি সীতার বনবাস হচ্ছে।" এও যেন কতকটা সেই রকম।

যা হোক শেষে বক্তব্য হচ্ছে এই যে বিদ্যাপতির কাব্যকে যখন প্রেমের দিক থেকে দেখি তখন তাঁর সমস্ত পদাবলীগুলো পাঠ শেষ হয়ে গেলে দীর্ঘ-নিশ্বাসের সঙ্গে সঙ্গে একটা কথাই খালি মনে জাগতে থাকে—সে কথাটা হচ্ছে—"পিতল কাটারি কামে নাহি আওল উপরহি ঝিকি-মিকি সার।" তবু যে বিদ্যাপতিকে একজন প্রকৃত কবি বলি তার কারণ হচ্ছে যে তিনি যে গান গেয়েছেন তা সুন্দর ও মিষ্টি। আর অস্‌কার ওয়াইলডের এই যে কথা—

There is no such thing as a moral or immoral book ; books are well written or badly written that's all.

এ কথাটা নিতান্ত বাজে কথা নয় বলেই মনে করি।

(৫)

এখন যারা

তিন বাণে মদন জিতল তিন ভুবন
অবধি রহল দউ বাণে
বিহি বড় দারুণ বধিতে রসিক জন
সোঁপল তোহার নয়ানে॥

কিম্বা

কামিনী করই সিনান।
হেরইতে হৃদয়ে হানল পাঁচ বাণ॥

কিম্বা

ঝাঁপবি কুচ দরশয়েবি কন্দ।
দৃঢ় করি বাঁধিবি নীবিহক বন্ধ॥

ইত্যাদি পদে একটা ভীষণ আধ্যাত্মিক অর্থের ও তত্ত্বের সন্ধান পান তাঁদের কেউ কেউ আমাকে সম্বোধন করে' যে একটা কথা বলবেন তা জানি। তাঁরা বল্‌বেন—হে মূর্খ লেখক! তুমি বিদ্যাপতির কিছুই বোঝ নি। তাঁর কাব্যে যে একটা আধ্যাত্মিক জীবনের পূর্ণ রহস্য—যে একটা গভীর যোগসাধনের ধারা ইত্যাদি ইত্যাদি। তা তাঁরা যদি বিদ্যাপতির কাব্যকে যোগশাস্ত্র বলে চালাতে চান তা চালান—তাতে আমার কোন আপত্তি নেই। তবে তাতে সাহিত্যের আসরে বিদ্যাপতির গৌরব কম্‌বে বই বাড়্‌বে না—অন্ততঃ আমার ত তাই বিশ্বাস।

শ্রীসুরেশ চন্দ্র চক্রবর্ত্তী।

বাজে তর্ক।

——:*:——

[স্থান—হ্যারিসন রোডস্থ এক ত্রিতল বাটীর একটি ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠ। সময়—সন্ধ্যা প্রায় সাড়ে ছটা। শচীন্দ্রকুমার ও তাহার বন্ধু অমিয় চৌকিতে উপবিষ্ট। উভয়েই তরুণ বয়স্ক যুবক। শচীনের চেহারাতে নির্ভীকতা, তেজস্বিতা ও সরলতার বেশ একটু আভা আছে। অমিয় একটু স্থূলকায় এবং তাহার চেহারা সাদাসিদে ভাল মানুষটির মত। দুই বন্ধুতে কথাবার্ত্তা চলিতেছে।]

অমিয়। তোমার কাছে ফণীবাবুর সেই বইখানা আছে না, শচীন?

শচীন। হ্যাঁ আছে। পড়া হয়ে গেছে, চাই তোমার?

অমিয়। সেটা নিতেই তো এসেছি। আচ্ছা শচীন, সেদিন ফণীবাবুর সঙ্গে হরিদার কি তর্কই বেধে গেল। হাতাহাতি হয় আর কি! আমি না থামিয়ে দিলে ঠিক মারামারি হতো।

শচীন। হ্যাঁ, ফণীবাবুর অতটা তেতে ওঠা উচিত হয় নি। জানেই তো হরিদা একটুতে কি রকম চটে যায়, তার সঙ্গে এত তর্ক করা কেন? আর বিশেষ হরিদা বয়সে ঢের বড়, তাকে এতটা ক্ষেপিয়ে তুলে লাভ কি?

অমিয়। তুমি আর কথা ব'ল না। একবার তর্ক উঠলেই হ'ল, তার স্রোতে গা ভাসিয়ে কোথায় যে চলে যাও, তার ঠিকানাই পাওয়া যায় না।

[হরিদার প্রবেশ, তিনি অপর দুজনের অপেক্ষা বয়সে কিছু বড়। তাঁহার চুল সাম্‌নে ও পিছনে সমান ভাবে কাটা। শিরোপরি একটী শিখাও উঁকিঝুঁকি মারিতেছে।]

শচীন। এই যে হরিদা—আসুন।

অমিয়। অনেক দিন বাঁচবেন হরিদা। এইমাত্র আপনার কথাই হচ্ছিল।

হরিদা। তাই নাকি, আমার ভাগ্যি বলতে হবে। তা কি কথা হচ্ছিল শুন্‌তে পারি কি?

শচীন। এমন কিছু না। আপনার সঙ্গে ফণীবাবুর সেই ঝগড়ার কথা বল্‌ছিলাম।

হরিদা। ঝগড়া আর কি? তবে যারা তর্ক করব বলে তর্ক করে, আর তর্ক করতে গিয়ে মেজাজ ঠিক রাখতে পারে না—তাদের সঙ্গে কথা বলে লাভ নেই। ফণী তো কথা বলতেই জানে না।

অমিয়। (একটু হাসিয়া) সে দোষটা শুধু ফণীবাবুর কেন, অনেকেরই আছে।

হরিদা। ফণী বলে কি জান? আমাদের দেশের নাকি যা-কিছু সবি মন্দ। আমাদের ধর্ম্ম অচল, আমাদের সমাজের গঠন খারাপ, আমাদের স্ত্রীশিক্ষা নেই—এ সব অন্যায় কথা শুনলে কার না রাগ হয়, বল তো, অমিয়।

অমিয়। সে ত ঠিক কথা।

শচীন। না, ফণীবাবু এমন অন্যায়ই বা কি বলেছেন? আপনারা সব বলেন যে আমাদের দেশে খুব স্ত্রী-শিক্ষা আছে, কিন্তু কোথায় যে আছে তাত দেখতে পাইনে।

হরিদা। নেই? স্ত্রী-শিক্ষা নেই? আমাদের দেশে যেরূপ স্ত্রী-শিক্ষা, সেরূপ কোন্ দেশে তুমি দেখাতে পার?

শচীন। এইটে ঠিক কথা বলেছেন। আমাদের দেশে যেমন, এ রকম আর কোথাও খুঁজে পাওয়া যাবে না। আমাদের দেশে গৃহলক্ষ্মীদের সঙ্গে সরস্বতীদেবীর যেমন মুখ দেখাদেখি নেই—তেমন বোধ হয় এক আফগানিস্থান ছাড়া আর কোথায়ও নেই।

হরিদা। তুমি নিতান্ত অর্ব্বাচীনের মত কথা বলছ, শচীন। শিক্ষা তুমি কাকে বল? যাতে মনের সদ্বৃত্তিগুলির বিকাশ হয় এবং চরিত্র গঠন হয়, তাই তো শিক্ষা। এদিক থেকে বিচার করলে দেখতে পাবে, আমাদের দেশের স্ত্রীলোক যত শিক্ষিতা এরূপ আর কোথাও নেই।

শচীন। কেবল মুখে বড় বল্লেই তো হয় না, কিসে বড় সেইটা আমাকে বুঝিয়ে দিন।

হরিদা। কিসে বড়? স্ত্রীলোকের যাহা প্রকৃষ্ট গৌরবের বিষয়—'মাতৃত্ব' তাতেই বড়। জান, কবি যা বলে গেছেন তার এক বর্ণও মিথ্যে নয়—"ভায়ের মায়ের এত স্নেহ, কোথায় গেলে পাবে কেহ"—কোথাও না।

শচীন। সর্ব্বত্র-গেলেই পাওয়া যাবে। "মা" হওয়াটা ভারত-বর্ষের স্ত্রীলোকদেরি একচেটে নয়। আর এই যে আপনি বল্‌ছেন 'মাতৃত্বটা' আমাদের স্ত্রীলোকদের গৌরব, তা, ভাল-মা হবার উপ-যোগিতাই কি এদের আছে? শুধু বুকভরা স্নেহ থাকলেই ভাল-মা হয় না। পৃথিবীর ছোট-বড় নানা বিষয়ের ভাল-মন্দ বিচারের শক্তি, যে মাতৃত্বের ভিতর নেই সে মাতৃত্বকে আমি বড় বল্‌তে পারিনে।

হরিদা। তোমার কাছে এক অভিনব কথা শোনা গেল। স্নেহ থাক্‌লে 'মা' হয় না, মাতৃত্বটা উঁচুদরের জিনিস নয়, বাৎসল্যটা মায়া-মাত্র, অদ্ভুত বটে।

অমিয়। চটেন কেন, হরিদা? শচীনের কথায় দোষটা কি হল? সত্যিই তো, মনে করুন, যদি সন্তানের জ্বর হয়, সে ভাল জিনিস কিছু খেতে পায় না বলে, মা যদি একটি সন্দেশ লুকিয়ে খেতে দেন, তাহলে তার জ্বর-বিকার হতে পারে। শুধু স্নেহটা থাকলেই চলে না, আরও কিছু দরকার। আর ছোট ছেলেদের শিক্ষার ভার যদি রোজগারের খাটুনিতে শ্রান্তক্লান্ত পিতারি নিতে হয়, তবে মাতৃত্বের গর্ব্বটা অত করি কিসের?

হরিদা। শুধু স্নেহ থাকলেই সব হয়। 'মা' কখনও রুগ্ন সন্তানকে কুপথ্য দিতে পারেন না। তোমরা যে শিক্ষা শিক্ষা কর, শিক্ষা কাকে বলে, তাই তোমরা জান না। মানচিত্র খুঁজে কোথায় পোপোকেটি-পেট্‌ল্ আছে তাই বের করার নাম শিক্ষা নয়; আর আকবর সাহের কটা হাতী ছিল—তা ঠিক না জানাটাই অশিক্ষা নয়।

শচীন। নিশ্চয়ই অশিক্ষা। পৃথিবীটা কি রকম, কোথায় কোন দেশে কি রকম লোক থাকে—এ সমস্ত না জেনে থাকা, আর ইচ্ছে করে অন্ধ হয়ে থাকা—একই কথা।

হরিদা। ওঃ, তোমরাই ভারি সব জান কিনা? তোমরা পৃথিবীর কটা খবর রাখ? কটা রাসায়নিক তথ্য তোমার জানা? দুপাতা ইংরেজী পড়েই মনে ভাব তুমি ভারী শিক্ষিত; ধরতে গেলে, তোমাতে আর ঐ কেষ্টাতে আমি কোন প্রভেদই দেখি না। তফাতের মধ্যে কেষ্টা ভৃত্য আর তুমি বিয়ে পাস।

অমিয়। আপনি কি বল্‌তে চান যে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা আমাদের কোন উপকারে আসে না ?

হরিদা। আসে বৈকি ? এতে খুব অর্থ আসে। তা নিজে ঘরকন্না দেখে স্ত্রীকে অর্থসংগ্রহের চেষ্টায় পাঠাতে চাও তাকে খুব ঠেসে শিক্ষা দাও। কোন আপত্তি নেই।

শচীন। বাজে কথা বলেন কেন ? এই যে সব ছেলেরা মিল্‌টন, সেক্‌স্‌পীয়র প্রভৃতি বড় বড় কবিদের বই পড়ে, এতে করে কি তাদের মনের বিকাশ হয় না, বলতে চান ? শত শত বৎসর ধরে ইউরোপ যে সভ্যতা মনপ্রাণ দিয়ে গড়ে তুলেছে, তার পরিচয় পেয়ে আমাদের কোন লাভ হয় না ?

হরিদা। কাব্য-রসাস্বাদনের জন্য বহুদিন কষ্ট করে একটি বিজাতীয় ভাষা শেখবার কোন প্রয়োজন আছে বলে আমি বিবেচনা করিনে। তোমাদের ভবভূতি নেই, কালিদাস নেই, কৃত্তিবাস নেই, কাশীদাস নেই ? তোমরা নিজের সোনার অলঙ্কার ছেড়ে পরের গিল্টিকরা জিনিস পরতে এত লালায়িত হও কেন ? শত শত বৎসর ধরে ইউরোপ কি Civilization-এর চর্চ্চা করেছে ? তা কি তোমাদের হতাদর আর্য্যঋষিদের Civilization-এর পায়ের কাছে লাগে ? আমাদের সভ্যতা, আধ্যাত্মিক বৈজ্ঞানিক নয়।

শচীন। আচ্ছা মানলুম, তাহলে আমাদের দেশে যে বিজ্ঞানের বিশেষ চর্চ্চা হয় নি, তা ত স্বীকার করেন ? না তাও করেন না ?

হরিদা। না, তাও করিনে। যে দেশে ন্যায়-দর্শনের এত গভীর গবেষণা হয়েছে সেখানে যে বিজ্ঞানের চর্চ্চা হয় নি, এটা অসম্ভব কথা।

তা ছাড়া চর্চ্চা নেই তোমাকে বল্লে কে? অঙ্কশাস্ত্র, রাসায়নিক শাস্ত্র এ সব তো আমাদেরি জিনিস।

শচীন। বটে? আর এই যে রেলগাড়ী চড়ে যাতায়াত কচ্ছেন, ট্রামে চাপছেন, বৈদ্যুতিক আলো ও বাতাস ভোগ কচ্ছেন, এ সবও কি আপনাদের মহর্ষিরা দিয়ে গেছেন নাকি?

হরিদা। দেখ শচীন, তুমি আমাকে যা বলবে বল, কিন্তু আর্য্য-ঋষিদের সম্বন্ধে কোন শ্লেষ প্রয়োগ ক'র না। তাঁরা তোমার ঠাট্টার পাত্র নন।

শচীন। রেখে দিন আপনার আর্য্যঋষিদের। তাঁরা করেছেন কি? লোকালয় ছেড়ে এক পাহাড়ে গিয়ে বনে ধ্যান করেছেন; তাতে লোকের কি এল গেল? আর কাজের মধ্যে করেছেন এই যে বামুন, বৈদ্য, কায়েত, শূদ্র প্রভৃতি সমাজের নানা ভাগ তৈরি করে, মানুষের সঙ্গে মানুষের যাতে চিরকাল একটা প্রভেদ থাকে, তার একটা পাকা বন্দোবস্ত।

হরিদা। পাশ্চাত্য শিক্ষার যে কি বিষময় ফল হয়, তা তোমাদের দেখেই বেশ বোঝা যায়। বর্ণভেদ নিয়ে যে এতটা চেঁচামিচি কর, বলি বর্ণভেদ নেই কোথায়? ইউরোপে নেই? তাদের মধ্যে বামুন যাদের পয়সা আছে, আর যে হতভাগ্য গরীব সেই শূদ্র, তাকে ছুঁলে তাদেরও জাত যায়। এ খবর রাখ?

শচীন। সে বর্ণভেদ পৃথিবীর সর্ব্বত্র আছে, ভারতবর্ষও বাদ যায় না। আমাদের মধ্য যার অর্থ বেশী তাকে সম্মান করিনে? চির-কালই করে এসেছি—কলির ভাগ্যে আজই যে করি তা নয় বরং ধনীর মান্য আজকাল কমে আস্‌ছে। আমাদের মধ্যে আছে দোকর

জাতিভেদ—এক পয়সার, আর এক জাতের। পয়সার উপদ্রব মানুষমাত্রকেই ভোগ কর্ত্তে হবে, তাই করি, কিন্তু তার উপরে যে আর একটা হাতেগড়া দৌরাত্ম্য সহ্য করব, তা অসম্ভব।

অমিয়। যাক, তোমরা কি বাজে কথা নিয়ে তর্ক কচ্ছ, সন্ধ্যা-বেলা। তর্কে তোমাদের মধ্যে যে জিতবে, তারি মতে সায় দিয়ে পৃথিবীটা চল্‌বে এই ভেবে তর্ক বাধিয়েছ—না কি? আচ্ছা হরিদা, আপনি তো বামুন, আপনি কি মনে করেন যে আপনার খাবার সময়ে আমি ছুঁয়ে দিলে, আপনি আর বামুন থাকবেন না—একদম কায়েত হয়ে যাবেন?

হরিদা। এম্নি ছোঁও কিছু ব'লব না, কিন্তু সামাজিক ভাবে যখন আহার করব, তখন ছুঁলে আমাকে শাস্ত্রানুসারে প্রায়শ্চিত্ত করতেই হবে।

শচীন। এই তো, এই জন্যেই তো আপনাদের সঙ্গে আমার লাগে। মিথ্যার উপর যে সমাজের ভিত্তি তা নিশ্চয়ই ধ্বংস হবে। সমাজ আমাকে বল্‌ছেন—তোমার যা ইচ্ছে যায় কর, বিলেত যাও, মুসলমানের হাতে খাও, সব কর—কিন্তু সামাজিক ভাবে জিজ্ঞেস করলেই বলা চাই, আমি কিছু করি নি তো! এ সব খুব ভাল, কি বলুন হরিদা?

হরিদা। তা ছাড়া, সমাজ কি করবে আর? লোক উচ্ছৃঙ্খল হবে, তা কি নেতারা এসে তাদের ধরে প্রহার করবে? মিথ্যা আচরণে কোনও দোষ নেই—উদ্দেশ্যটা যদি হয় খুব মহৎ।

শচীন। এটা আপনার নিতান্ত এঁড়োতর্ক। মিথ্যার সাহায্যে কোনও মহৎ উদ্দেশ্য কস্মিনকালে সিদ্ধ হয়ও নি, হবেও না। বিবেকানন্দ বলেছেন—

হরিদা। সব কথাতেই স্বামীজি, পরমহংসদেব এঁদের টেনে এন না। তোমার এই অভ্যাসটা বড় খারাপ। এঁদের কথা তুলতে তোমার একটুও সঙ্কোচ হয় না। এ অশ্রদ্ধার ভাবটা আমি মোটেই পছন্দ করিনে। স্বামীজি কি বলেছেন? তাঁর কথা তোমরা কেউ বোঝ? এটা দেখছি, ছেলেদের মধ্যে এক ফ্যাসান হয়ে দাঁড়িয়েছে—সবারি মুখে বিবেকানন্দের কথা। তাঁর 'বাণী' কেউ বোঝে না, কেবল কুতর্ক করবার জন্যে কতগুলি বুলি আওড়ায়।

শচীন। আপনারও এ রকম ত্রিকালজ্ঞ হবার ভাণটা কেউ ভাল বলতে পারে না। ধর্ম্ম, স্বামীজি, পরমহংসদেব, সবি কি আপনার একলার? আর কেউ এ সম্বন্ধে কোন কথাই বলতে পারবে না?

হরিদা। পারবে না কেন—আমি কি নিষেধ করি? যার অধিকার আছে সেই পারবে, অনধিকার চর্চ্চা করা ভাল নয়।

শচীন। মানুষমাত্রেরই অধিকার আছে।

অমিয়। আপনারা কি কচ্ছেন, হরিদা? এই ফণীবাবুর বাড়ীতে এত তর্ক, আবার এখানে—কেন, এ রোগ কেন?

হরিদা। তর্ক আবার কি? যে যা খুসি বলবে আর সব নীরবে সহ্য করে যেতে হবে এ কোন কথা?

শচীন। সত্যিই তো, রাত হয়ে গেছে। কি রকম বাজে তর্ক করে সময়টা কেটে গেল। কিছু মনে করবেন না হরিদা, তর্কের মাথায় যা' তা' বলে ফেলেছি।

হরিদা। না; মনে কিছু করি নি, তবে তোমার আর একটু সংযত হওয়া উচিত। পাগলের মত তর্ক ক'র না আর কারু সঙ্গে। আচ্ছা, এখন তবে আসি।

শচীন। বসুন না, হরিদা, এখনি যাবেন কেন?

হরিদা। না পালাই, আমার কাজ আছে।

[হরিদার প্রস্থান]

অমিয়। আচ্ছা, কি নিয়ে সমস্ত সন্ধ্যেটা তর্ক করলে? তুমি আবার ফণীবাবুকে তার্কিক বল্‌ছিলে!

শচীন। উঃ, বেজায় গরম বোধ হচ্ছে। সন্ধ্যেটা কেটে গেল, চল গোলদীঘিতে একটা চক্‌কর দিয়ে আসি, তা না হলে ঠিক মাথা ধরবে। তুমি যা বল্‌ছ তা ঠিক. এদেশে তর্ক করে কোনও ফল নেই আর তর্ক ছাড়া করবারও আর কিছু ত নেই।

[উভয়ের প্রস্থান]

শ্রীকান্তিচন্দ্র সেন।

চৈত্র, ১৩২৪

সবুজ পত্র

সম্পাদক

শ্রীপ্রমথ চৌধুরী

বার্ষিক মূল্য দুই টাকা ছয় আনা।

সবুজ পত্র কার্য্যালয়, ৩ নং হেষ্টিংস্ ষ্ট্রীট,

কলিকাতা।

৯০

কলিকাতা।
৩ নং হেষ্টিংস্ ষ্ট্রীট।
শ্রীপ্রমথ চৌধুরী এম্, এ, বার-য়্যাট-ল কর্ত্তৃক
প্রকাশিত।

কলিকাতা।
উইক্লী নোট্স্ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্,
৩ নং হেষ্টিংস্ ষ্ট্রীট।
শ্রীসারদা প্রসাদ দাস দ্বারা মুদ্রিত।

ছন্দ।

——:*:——

শুধু কথা যখন খাড়া দাঁড়িয়ে থাকে তখন কেবলমাত্র অর্থকে প্রকাশ করে। কিন্তু সেই কথাকে যখন বিশেষ গতি দেওয়া যায় তখন সে আপন অর্থের চেয়ে আরও কিছু বেশি প্রকাশ করে। সেই বেশিটুকু যে কি তা বলাই শক্ত। কেননা তা কথার অতীত, সুতরাং অনির্ব্বচনীয়। যা আমরা দেখ্‌চি শুন্‌চি জান্‌চি তার সঙ্গে যখন অনির্ব্বচনীয়ের যোগ হয় তখন তাকেই আমরা বলি রস—অর্থাৎ সে-জিনিসটাকে অনুভব করা যায়, ব্যাখ্যা করা যায় না। সকলে জানেন এই রসই হচ্চে কাব্যের বিষয়।

এইখানে একটা কথা মনে রাখা দরকার—অনির্ব্বচনীয় শব্দটার মানে অভাবনীয় নয়। তা যদি হত তাহলে ওটা কাব্যে অকাব্যে কুকাব্যে কোথাও কোনো কাজে লাগত না। বস্তু পদার্থের সংজ্ঞা নির্ণয় করা যায় কিন্তু রস পদার্থের করা যায় না। অথচ রস আমাদের একান্ত অনুভূতির বিষয়। গোলাপকে আমরা বস্তুরূপে জানি, আর গোলাপকে আমরা রসরূপে পাই। এর মধ্যে বস্তু জানাকে আমরা সাদা কথায় তার আকার আয়তন তার কোমলতা প্রভৃতি বহুবিধ পরিচয়ের দ্বারা ব্যাখ্যা করতে পারি কিন্তু রস-পাওয়া এমন একটি অখণ্ড ব্যাপার যে তাকে তেমন করে সাদা কথায় বর্ণনা করা যায় না—কিন্তু তাই বলেই সেটা অলৌকিক অদ্ভুত অসামান্য কিছুই নয়। বরঞ্চ রসের অনুভূতি বস্তু-জ্ঞানের চেয়ে আরো প্রবলতর গভীরতর। এই জন্য গোলাপের আনন্দকে আমরা

যখন অন্যের মনে সঞ্চার করতে চাই তখন সে একটা সাধারণ অভিজ্ঞতার রাস্তা দিয়েই করে থাকে। তফাৎ এই, বস্তু-অভিজ্ঞতার ভাষা সাদা কথার বিশেষণ, কিন্তু রস-অভিজ্ঞতার ভাষা আকার ইঙ্গিত সুর এবং রূপক। পুরুষের যে-পরিচয় হচ্চে তিনি আপিসের বড় বাবু সেটা আপিসের খাতা পত্র দেখ্‌লেই জানা যায়, কিন্তু মেয়ের যে-পরিচয় তিনি গৃহলক্ষ্মী সেটা প্রকাশের জন্যে তাঁর সিঁথেয় সিঁদুর, তাঁর হাতে কঙ্কণ। অর্থাৎ এটার মধ্যে রূপক চাই, অলঙ্কার চাই, কেননা কেবল মাত্র তথ্যের চেয়ে এ যে বেশি—এর পরিচয় শুধু জ্ঞানে নয় হৃদয়ে। ঐ যে গৃহলক্ষ্মীকে লক্ষ্মী বলা গেল এইটেই ত হল একটা কথার ইসারা মাত্র—অথচ আপিসের বড় বাবুকে ত আমাদের কেরাণী-নারায়ণ বলবার ইচ্ছাও হয় না, যদিও ধর্ম্মতত্ত্বে বলে থাকে সকল নরের মধ্যেই নারায়ণের আবির্ভাব আছে। তাহলেই বোঝা যাচ্চে আপিসের বড় বাবুর মধ্যে অনির্ব্বচনীয়তা নেই—কিন্তু যেখানে তাঁর গৃহিণী সাধ্বী সেখানে তাঁর মধ্যে আছে। তাই বলে এমন কথা বলা যায় না, যে ঐ বাবুটিকেই আমরা সম্পূর্ণ বুঝি আর মা'লক্ষ্মীকে বুঝি নে—বরঞ্চ উল্টো। কেবল কথা এই, যে, বোঝবার বেলায় মা'লক্ষ্মী যত সহজ বোঝাবার বেলায় তত নয়।

"কেবা শুনাইল শ্যাম নাম।" ব্যাপারটা ঘটনা হিসাবে সহজ। কোনো এক ব্যক্তি দ্বিতীয় ব্যক্তির কাছে তৃতীয় ব্যক্তির নাম উচ্চারণ করেচে। এমন কাণ্ড দিনের মধ্যে পঞ্চাশবার ঘটে। এটুকু বলবার জন্যে কথাকে বেশি নাড়া দেবার দরকার হয় না। কিন্তু নাম কানের ভিতর দিয়ে যখন মরমে গিয়ে পশে—অর্থাৎ এমন জায়গায় কাজ করতে থাকে যে-জায়গা দেখা শোনার অতীত, এবং এমন কাজ করতে থাকে

যাকে মাপা যায় না, ওজন করা যায় না, চোখের সাম্‌নে দাঁড় করিয়ে যার সাক্ষ্য নেওয়া যায় না, তখন কথাগুলোকে নাড়া দিয়ে তাদের পূরো অর্থের চেয়ে তাদের কাছ থেকে আরো অনেক বেশি আদায় করে নিতে হয়। অর্থাৎ আবেগকে প্রকাশ করতে গেলে কথার মধ্যে সেই আবেগের ধর্ম্ম সঞ্চার করতে হয়। আবেগের ধর্ম্ম হচ্চে বেগ। কথা যখন সেই বেগ গ্রহণ করে তখনই আমাদের হৃদয়-ভাবের সঙ্গে তার মিল ঘটে।

এই বেগের কত বৈচিত্র্যই যে আছে তার ঠিকানা নেই। এই বেগের বৈচিত্র্যেই ত আলোকের রং বদল হচ্চে, শব্দের সুর বদল হচ্চে, এবং লীলাময়ী সৃষ্টি রূপ থেকে রূপান্তর গ্রহণ করচে। এমন কি সৃষ্টির বাইরের পর্দ্দা সরিয়ে ভিতরের রহস্য-নিকেতনে যতই প্রবেশ করা যায় ততই বস্তু ঘুচে গিয়ে কেবল বেগই প্রকাশ পেতে থাকে। শেষকালে এই কথাই মনে হয় প্রকাশ-বৈচিত্র্যের মূলে বুঝি এই বেগ-বৈচিত্র্য। যদিদং সর্ব্বং প্রাণ এজতি নিঃসৃতং।

মানুষের সত্তার মধ্যে এই অনুভূতিলোকই হচ্চে সেই রহস্যলোক যেখানে বাহিরের রূপজগতের সমস্ত বেগ অন্তরে আবেগ হয়ে উঠ্‌চে, এবং সেই অন্তরের আবেগ আবার বাহিরে রূপ গ্রহণ করবার জন্যে উৎসুক হচ্চে। এই জন্যে বাক্য যখন আমাদের অনুভূতিলোকের বাহনের কাজে ভর্ত্তি হয় তখন তার গতি না হলে চলে না। সে তার অর্থের দ্বারা বাহিরের ঘটনাকে ব্যক্ত করে, গতির দ্বারা অন্তরের গতিকে প্রকাশ করে।

শ্যামের নাম রাধা শুনেচে। ঘটনাটা শেষ হয়ে গেচে। কিন্তু যে-একটা অদৃশ্য বেগ জন্মাল তার আর শেষ নেই। আসল ব্যাপারটাই

হল তাই। সেই জন্যে কবি ছন্দের ঝঙ্কারের মধ্যে এই কথাটাকে দুলিয়ে দিলেন। যতক্ষণ ছন্দ থাকবে ততক্ষণ এই দোলা আর থাম্‌বে না। "সই, কেবা শুনাইলে শ্যাম নাম।" কেবলি ঢেউ উঠ্‌তে লাগ্‌ল। ঐ কটি কথা ছাপার অক্ষরে যদিও ভাল মানুষের মত দাঁড়িয়ে থাকার ভান করে কিন্তু ওদের অন্তরের স্পন্দন আর কোনো দিনই শান্ত হবে না। ওরা অস্থির হয়েচে, এবং অস্থির করাই ওদের কাজ।

আমাদের পুরাণে ছন্দের উৎপত্তির কথা যা বলেচে তা সবাই জানেন। দুটি পাখীর মধ্যে একটিকে যখন ব্যাধ মারলে তখন বাল্মীকি মনে যে-ব্যথা পেলেন সেই ব্যথা শ্লোক দিয়ে না জানিয়ে তাঁর উপায় ছিল না। যে-পাখীটা মারা গেল এবং আর যে-একটি পাখী তার জন্যে কাঁদল তারা কোন্‌কালে লুপ্ত হয়ে গেছে। কিন্তু এই নিদারুণ-তার ব্যথাটিকে ত কেবল কালের মাপকাঠি দিয়ে মাপা যায় না। সে যে অনন্তের বুকে বেজে রইল। সেই জন্যে কবির শাপ ছন্দের বাহনকে নিয়ে কাল থেকে কালান্তরে ছুট্‌তে চাইলে। হায়রে, আজও সেই ব্যাধ নানা অস্ত্র হাতে নানা বীভৎসতার মধ্যে নানা দেশে নানা আকারে ঘুরে বেড়াচ্চে। কিন্তু সেই আদিকবির শাপ শাশ্বত-কালের কণ্ঠে ধ্বনিত হয়ে রইল। এই শাশ্বত-কালের কথাকে প্রকাশ করবার জন্যেই ত ছন্দ।

আমরা ভাষায় বলে থাকি, কথাকে ছন্দে বাঁধা। কিন্তু এ কেবল বাইরে বাঁধন, অন্তরে মুক্তি। কথাকে তার জড়ধর্ম্ম থেকে মুক্তি দেবার জন্যেই ছন্দ। সেতারের তার বাঁধা থাকে বটে কিন্তু তার থেকে সুর পায় ছাড়া। ছন্দ হচ্চে সেই তার-বাঁধা সেতার, কথার অন্তরের সুরকে সে ছাড়া দিতে থাকে। ধনুকের সে ছিলা, কথাকে সে তীরের মত লক্ষ্যের মর্ম্মের মধ্যে প্রক্ষেপ করে।

গোড়াতেই ছন্দ সম্বন্ধে এতখানি ওকালতি করা হয় ত বাহুল্য বলে অনেকের মনে হতে পারে। কিন্তু আমি জানি এমন লোক আছেন যাঁরা ছন্দকে সাহিত্যের একটা কৃত্রিম প্রথা বলে মনে করেন। তাই আমাকে এই গোড়ার কথাটা বুঝিয়ে বল্‌তে হল যে, পৃথিবী ঠিক চব্বিশ ঘণ্টার ঘূর্ণিলয়ে তিনশো পঁয়ষট্টি মাত্রার ছন্দে সূর্য্যকে প্রদক্ষিণ করে, সেও যেমন কৃত্রিম নয়, ভাবাবেগ তেমনি ছন্দকে আশ্রয় করে' আপন গতিকে প্রকাশ করবার যে চেষ্টা করে সেও তেমনি কৃত্রিম নয়।

এইখানে কাব্যের সঙ্গে গানের তুলনা করে আলোচ্য বিষয়টাকে পরিষ্কার করবার চেষ্টা করা যাক্।

সুর পদার্থটাই একটা বেগ। সে আপনার মধ্যে আপনি স্পন্দিত হচ্চে। কথা যেমন অর্থের মোক্তারি করবার জন্যে, সুর তেমন নয়—সে আপনাকেই আপনি প্রকাশ করে। বিশেষ সুরের সঙ্গে বিশেষ সুরের সংযোগে ধ্বনি-বেগের একটা সমবায় উৎপন্ন হয়। তাল সেই সমবেত বেগটাকে গতিদান করে। ধ্বনির এই গতি-বেগে আমাদের হৃদয়ের মধ্যে যে গতি সঞ্চার করে সে একটা বিশুদ্ধ আবেগ মাত্র—তার যেন কোনো অবলম্বন নেই। সাধারণত সংসারে আমরা কতকগুলি বিশেষ ঘটনা আশ্রয় করে সুখে দুঃখে বিচলিত হই। সেই ঘটনা সত্যও হতে পারে, কাল্পনিকও হতে পারে অর্থাৎ আমাদের কাছে সত্যের মত প্রতিভাত হতে পারে। তারই আঘাতে আমাদের চেতনা নানা রকমে নাড়া পায়—সেই নাড়ার প্রকার-ভেদে আমাদের আবেগের প্রকৃতি-ভেদ ঘটে। কিন্তু গানের সুরে আমাদের চেতনাকে যে-নাড়া দেয় সে কোনো ঘটনার উপলক্ষ্য দিয়ে নয়, সে একেবারে অব্যবহিত-

ভাবে। সুতরাং তাতে যে আবেগ উৎপন্ন হয় সে অহৈতুক আবেগ। তাতে আমাদের চিত্ত নিজের স্পন্দন-বেগেই নিজেকে জানে—বাইরের সঙ্গে কোনো ব্যবহারের যোগে নয়।

সংসারে আমাদের জীবনে যে সব ঘটনা ঘটে তার সঙ্গে নানা দায় জড়ানো আছে। জৈবিক দায়, বৈষয়িক দায়, সামাজিক দায়, নৈতিক দায়। তার জন্যে নানা চিন্তায় নানা কাজে আমাদের চিত্তকে বাইরে বিক্ষিপ্ত করতে হয়। শিল্পকলায়, কাব্যে এবং রস-সাহিত্য মাত্রেই আমাদের চিত্তকে সেই সমস্ত দায় থেকে মুক্তি দেয়। তখন আমাদের চিত্ত সুখ দুঃখের মধ্যে আপনারই বিশুদ্ধ প্রকাশ দেখ্‌তে পায়। সেই প্রকাশই আনন্দ। এই প্রকাশকে আমরা চিরন্তন বলি এই জন্যে, যে, বাইরের ঘটনাগুলি সংসারের জাল বুন্‌তে বুন্‌তে নানা প্রয়োজন সাধন করতে করতে সরে যায় চলে যায়, তাদের নিজের মধ্যে নিজের কোনো চরম মূল্য নেই। কিন্তু আমাদের চিত্তের যে আত্মপ্রকাশ তার আপনাতেই আপনার চরম—তার মূল্য তার আপনার মধ্যেই পর্য্যাপ্ত। তমসাতীরে ক্রৌঞ্চ-বিরহিণীর দুঃখ কোন খানেই নেই কিন্তু আমাদের চিত্তের আত্মানুভূতির মধ্যে সেই বেদনার তার বাঁধা হয়েই আছে—সে ঘটনা এখন ঘট্‌চে না, বা সে ঘটনা কোনো কালেই ঘটে নি এ কথা তার কাছে প্রমাণ করে কোনো লাভ নেই।

যাহোক্, দেখা যাচ্ছে, গানের স্পন্দন আমাদের চিত্তের মধ্যে যে-আবেগ জন্মিয়ে দেয়, সে কোনো সাংসারিক ঘটনামূলক আবেগ নয়। তাই মনে হয় সৃষ্টির গভীরতার মধ্যে যে-একটি বিশ্বব্যাপী প্রাণকম্পন চল্‌চে গান শুনে সেইটেরই বেদনাবেগ যেন আমরা চিত্তের মধ্যে অনুভব করি। ভৈরবী যেন সমস্ত সৃষ্টির অন্তরতম বিরহব্যাকুলতা,

দেশমল্লার যেন অশ্রুগঙ্গোত্রীর কোন্ আদি নির্ঝরের কলকল্লোল। এতে করে আমাদের চেতনা দেশকালের সীমা পার হয়ে নিজের চঞ্চল প্রাণধারাকে বিরাটের মধ্যে উপলব্ধি করে।

কাব্যেও আমরা আমাদের চিত্তের এই আত্মানুভূতিকে বিশুদ্ধ এবং মুক্তভাবে অথচ বিচিত্র আকারে পেতে চাই; কিন্তু কাব্যের প্রধান উপকরণ হল কথা। সেত সুরের মত স্বপ্রকাশ নয়। কথা অর্থকে জানাচ্চে। অতএব কাব্যে এই অর্থকে নিয়ে কারবার করতেই হবে। তাই গোড়ায় দরকার এই অর্থটা যেন রসমূলক হয়। অর্থাৎ সেটা এমন কিছু হয় যা স্বতই আমাদের মনে স্পন্দন সঞ্চার করে, যাকে আমরা বলি আবেগ।

কিন্তু যে হেতু কথা জিনিসটা স্বপ্রকাশ নয় এই জন্যে সুরের মত কথার সঙ্গে আমাদের চিত্তের সাধর্ম্ম্য নেই। আমাদের চিত্ত বেগবান, কিন্তু কথা স্থির। এ প্রবন্ধের আরম্ভেই আমরা এই বিষয়টার আলোচনা করেচি। বলেচি, কথাকে বেগ দিয়ে আমাদের চিত্তের সামগ্রী করে তোলবার জন্যে ছন্দের দরকার। এই ছন্দের বাহনযোগে কথা কেবল যে দ্রুত আমাদের চিত্তে প্রবেশ করে তা নয়, তার স্পন্দনে নিজের স্পন্দন যোগ করে দেয়।

এই স্পন্দনের যোগে শব্দের অর্থ যে কি অপরূপতা লাভ করে তা আগে থাকতে হিসাব করে বলা যায় না। সেই জন্যে কাব্যরচনা একটা বিস্ময়ের ব্যাপার। তার বিষয়টা কবির মনে বাঁধা, কিন্তু কাব্যের লক্ষ্য হচ্চে বিষয়কে অতিক্রম করা; সেই বিষয়ের চেয়ে বেশিটুকুই হচ্চে অনির্ব্বচনীয়। ছন্দের গতি কথার মধ্যথেকে সেই অনির্ব্বচনীয়কে জাগিয়ে তোলে।

"রজনী সাঙন ঘন, ঘন দেয়া-গরজন,
রিমিঝিমি শবদে বরিষে।
পালঙ্কে শয়ান রঙ্গে বিগলিত চীর অঙ্গে
নিন্দ যাই মনের হরিষে।"

বাদলার রাত্রে একটি মেয়ে বিছানায় শুয়ে ঘুমচ্চে বিষয়টা এইমাত্র, কিন্তু ছন্দ এই বিষয়টিকে আমাদের মনে কাঁপিয়ে তুল্‌তেই এই মেয়ের ঘুমোনো ব্যাপারটি যেন নিত্যকালকে আশ্রয় করে একটি পরম ব্যাপার হয়ে উঠল—এমন কি, জর্ম্মন কাইজার আজ যে চার বছর ধরে এমন দুর্দ্দান্ত প্রতাপে লড়াই করচে সেও এর তুলনায় তুচ্ছ এবং অনিত্য। ঐ লড়াইয়ের তথ্যটাকে এক দিন বহুকষ্টে ইতিহাসের বই থেকে মুখস্থ করে ছেলেদের একজামিন পাস করতে হবে—কিন্তু পালঙ্কে শয়ান রঙ্গে বিগলিত চীর অঙ্গে নিন্দ যাই মনের হরিষে—এ পড়া-মুখস্থ করার জিনিস নয়। এ আমরা আপনার প্রাণের মধ্যে দেখতে পাব, এবং যা দেখব সেটা একটি মেয়ের বিছানায় শুয়ে ঘুমোনোর চেয়ে অনেক বেশি। এই কথাটাকেই আরেক ছন্দে লিখলে বিষয়টা ঠিকই থাক্‌বে কিন্তু বিষয়ের চেয়ে বেশি যেটা, তার অনেকখানি বদল হবে।

শ্রাবণ মেঘে তিমির-ঘন শর্ব্বরী,
বরিষে জল কাননতল মর্ম্মরি'॥
জলদরব-ঝঙ্কারিত ঝঞ্ঝাতে
বিজন ঘরে ছিলাম সুখ-তন্দ্রাতে,
অলস মম শিথিল তনু-বল্লরী।
মুখর শিখী শিখরে ফিরে সঞ্চরি॥

এই ছন্দে হয়ত বাইরের ঝড়ের দোলা কিছু আছে কিন্তু মেয়েটির ভিতরের গভীর কথা ফুট্‌ল না। এ আর-এক জিনিস হল।

ছন্দ কবিতার বিষয়টির চারদিকে আবর্ত্তন করচে। পাতা যেমন গাছের ডাঁটার চারদিকে ঘুরে ঘুরে তাল রেখে ওঠে এও সেই রকম। গাছের বস্তু-পদার্থ তার ডালের মধ্যে গুঁড়ির মধ্যে মজ্জাগত হয়ে রয়েচে, কিন্তু তার লাবণ্য, তার চাঞ্চল্য, বাতাসের সঙ্গে তার আলাপ, আকাশের সঙ্গে তার চাউনির বদল এসমস্ত প্রধানত তার পাতার ছন্দে।

পৃথিবীর আহ্নিক এবং বার্ষিক গতির মত কাব্যে ছন্দের আবর্ত্তনের দুটি অঙ্গ আছে, একটি বড় গতি আর একটি ছোট গতি। অর্থাৎ চাল এবং চলন। প্রদক্ষিণ এবং পদক্ষেপ। দৃষ্টান্ত দেখাই।

"শারদচন্দ্র পবন মন্দ বিপিন ভরল কুসুম গন্ধ"

এরই প্রত্যেকটি হল চলন। এমন আটটি চলনে এই ছন্দের চাল সারা হচ্চে। অর্থাৎ ছয়ের মাত্রায় এ পা ফেল্‌চে এবং আটের মাত্রায় ঘুরে আস্‌চে। "শারদ চন্দ্র" এই কথাটি ছয় মাত্রার, "শারদ" তিন এবং "চন্দ্র"ও তিন। বলা বাহুল্য, যুক্ত অক্ষরে দুই অক্ষরের মাত্রা আছে, এই কারণে "শারদ চন্দ্র" এবং "বিপিন ভরল" ওজনে একই।

১ ২ ৩ ৪
শারদ চন্দ্র পবন মন্দ, বিপিন ভরল কুসুম গন্ধ,
৫ ৬ ৭ ৮
ফুল্ল মল্লি, মালতি যুথি, মত্ত মধুপ ভোরণী।

প্রদক্ষিণের মাত্রার চেয়ে পদক্ষেপের মাত্রার পরেই ছন্দের বিশেষত্ব বেশি নির্ভর করচে। কেননা এই আট পদক্ষেপের আবর্ত্তন সকল ছন্দেই চলে। বস্তুত এইটেই হচ্চে অধিকাংশ ছন্দের চলিত কায়দা। যথা,

১ ২ ৩ ৪
মহাভার- তের কথা অমৃত স- মান
৫ ৬ ৭ ৮
কাশিরাম দাস কহে শুনে পুণ্য- বান।

এও আট পদক্ষেপ।

১ ২ ৩ ৪
(To) night the winds be- gin to rise
৫ ৬ ৭ ৮
(And) roar from yonder dropping day

এই কবিতার প্রদক্ষিণের মাত্রাভাগও আট, আবার

১ ২ ৩ ৪
When we two parted in silence and tears
৫ ৬ ৭ ৮
Half broken hearted to sever for years

এ কবিতারও তাই। কিন্তু কানে শোন্‌বামাত্রই বোঝা যায় এরা ভিন্ন জাতের ছন্দ।

এই জাত নির্ণয় করতে হলে চালের দিকে ততটা নয় কিন্তু চলনের দিকেই দৃষ্টি দিতে হবে। দিলে দেখা যাবে, ছন্দকে মোটের উপর তিন জাতে ভাগ করা যায়। সম-চলনের ছন্দ, অসম-চলনের ছন্দ এবং বিষম-চলনের ছন্দ। দুই মাত্রার চলনকে বলি সম-মাত্রার চলন, তিন মাত্রার চলনকে বলি অসম মাত্রার চলন এবং দুই তিনের মিলিত মাত্রার চলনকে বলি বিষম মাত্রার ছন্দ।

ফিরে ফিরে আঁখি নীরে পিছু পানে চায়।
পায়ে পায়ে বাধা পড়ে চলা হল দায়।

এ হল দুই মাত্রার চলন। দুইয়ের গুণফল চার বা আটকেও আমরা এক জাতিরই গণ্য করি।

নয়ন ধারায় পথ সে হারায়, চায় সে পিছন পানে,
চলিতে চলিতে চরণ চলে না, ব্যথার বিষম টানে।

এ হল তিন মাত্রার চলন। আর

যতই চলে চোখের জলে নয়ন ভরে ওঠে,
চরণ বাধে, পরাণ কাঁদে, পিছনে মন ছোটে।

এ হল দুই তিনের যোগে বিষম মাত্রার ছন্দ।

তা হলেই দেখতে পাওয়া যাচ্চে চলনের ভেদেই ছন্দের প্রকৃতি-ভেদ। আমরা যে-দুটি ইংরেজি কবিতা উপরে উদ্ধৃত করেছি—তার মধ্যে একটার চলন সমমাত্রার অর্থাৎ দুই মাত্রার—অন্যটার চলন অসম মাত্রার অর্থাৎ তিন মাত্রার—তাল দিয়ে গুণে দেখলেই সেটা ধরা পড়বে। ইংরেজিতে বিষম মাত্রার ছন্দ আমার চোখে পড়ে নি।

বৈষ্ণব পদাবলীতে বাংলা সাহিত্যে ছন্দের প্রথম ঢেউ ওঠে। কিন্তু দেখা যায় তার লীলাবৈচিত্র্য সংস্কৃত ছন্দের দীর্ঘ হ্রস্ব মাত্রা অবলম্বন করেই প্রধানত প্রকাশ পেয়েচে। প্রাকৃত বাংলায় যত কবিতা আছে তার ছন্দ সংখ্যা বেশি নয়। সম মাত্রার ছন্দের দৃষ্টান্ত :—

কেন তোরে আনমন দেখি।
কাহে নখে ক্ষিতিতল লেখি।

এ ছাড়া পয়ার এবং ত্রিপদী আছে—সেও সম মাত্রার ছন্দ। অসম মাত্রার অর্থাৎ তিনের ছন্দ চার রকমের পাওয়া যায়—

১। মলিন বদন ভেল,
ধীরে ধীরে চলি গেল।
আওল রাইর পাশ।
কি কহিব জ্ঞান দাস।

২। জাগিয়া জাগিয়া হইল খীন
অসিত চাঁদের উদয় দিন॥

৩। সদাই ধেয়ানে চাহে মেঘপানে
না চলে নয়ন তারা।
বিরতি আহারে রাঙা বাস পরে
যেমত যোগিনী পারা।

৪। বেলি অবসান কালে
কবে গিয়াছিলা জলে।
তাহারে দেখিয়া ইষত হাসিয়া ধরিলি সখীর গলে॥

বিষম মাত্রার দৃষ্টান্ত কেবল একটা চোখে পড়েচে—সেও কেবল গানের আরম্ভে—শেষ পর্য্যন্ত টেঁকে নি।

চিকনকালা গলায় মালা
বাজন নুপুর পায়।
চূড়ার ফুলে ভ্রমর বুলে
তেরছ নয়ানে চায়॥

বাংলায় সম মাত্রার ছন্দের মধ্যে পয়ার এবং ত্রিপদীই সব চেয়ে প্রচলিত। এই দুটি ছন্দের বিশেষত্ব হচ্চে এই যে এদের চলন খুব লম্বা। এদের প্রত্যেক পদক্ষেপে আট মাত্রা। এই আট মাত্রার মোট ওজন রেখে পাঠক এর মাত্রাগুলিকে অনেকটা ইচ্ছামত চালাচালি করতে পারেন।

"পাষাণ মিলায়ে যায় গায়ের বাতাসে।"

এর মধ্যে যে কতটা ফাঁক আছে তা যুক্তাক্ষর বসালেই টের পাওয়া যায়।

"পাষাণ মূর্চ্ছিয়া যায় গায়ের বাতাসে।"

ভারি হল না।

"পাষাণ মূর্চ্ছিয়া যায় অঙ্গের বাতাসে।"

এতেও বিশেষ ভিড় বাড়ল না।

"পাষাণ মূর্চ্ছিয়া যায় অঙ্গের উচ্ছ্বাসে।"

এও বেশ সহ্য হয়।

"সঙ্গীত তরঙ্গি উঠে অঙ্গের উচ্ছ্বাসে।"

এতেও অত্যন্ত ঠেসাঠেসি হল না।

"সঙ্গীত তরঙ্গ রঙ্গ অঙ্গের উচ্ছ্বাস।"

অনুপ্রাসের ভিড় হল বটে কিন্তু এখনো অন্ধকূপ হত্যা হবার মত হয় নি। কিন্তু এর বেশি আর সাহস হয় না। তবু যদি আরো প্যাসেঞ্জার নেওয়া যায় তাহলে যে একেবারে পয়ারের নৌকাডুবি হবে তা নয়, তবে কিনা হাঁপ ধরবে—যথা,

দুর্দ্দান্ত পাণ্ডিত্যপূর্ণ দুঃসাধ্য সিদ্ধান্ত।

কিন্তু দুই মাত্রার ছন্দ মাত্রেরই যে এই রকম অসাধারণ শোষণ-শক্তি তা বলতে পারি নে। যেখানে পদক্ষেপ ঘন ঘন সেখানে ঠিক উল্টো। যথা—

২ ২ ২ ২ ২ ২ ২
ধরণীর আঁখিনীর মোচনের ছলে,
২ ২ ২ ২ ২ ২ ২
দেবতার অবতার বসুধার তলে।

এও পয়ার কিন্তু যেহেতু এর পদক্ষেপ আটে নয়, দুইয়ে, সেইজন্যে এর উপরে বোঝা সয় না। যে দ্রুত চলে তাকে হাল্কা হতে হয়। যদি লেখা যায়,

ধরিত্রীর চক্ষুনীর মুঞ্চনের ছলে,
কংসারির শঙ্খ-রব সংসারের তলে—

তাহলে ও একটা স্বতন্ত্র ছন্দ হয়ে যায়। সংস্কৃতেও দেখ, সম মাত্রার ছন্দ যেখানে দুয়ের লয়ে চলে সেখানে দৌড় বেশি—যেমন—

২ .২ ২ ২ ২ ২ ২ ২
হরি রিহ বিহরতি সরস বসন্তে।

ইংরেজিতেও তাই—

১ ২ ১ ২ ১ ২ ১ ২
Ah dis- | tinctly | I re- | member |
১ ২ ১ ২ ১ ২ ১ ২
It was | in the | bleak De- | cember |

বাংলা পয়ারের মত এদের গম্ভীর মন্থর চলন নয়। কিন্তু ঐ ইংরেজিতে দুইয়ের চলনের বদলে চারের চলন যেখানে আসে সেখানে কেবল যে মন্থরতা, তা নয়, ছন্দের স্বাধীনতা বাড়ে। যেমন—

১ ২ ৩ ৪ ১ ২ ৩ ৪ ১ ২
(O) Goddess, hear these | tuneless numbers, | wrung
১ ২ ৩ ৪ ১ ২ ৩ ৪ ১ ২
(By) sweet enforcement | and remembrance | dear, |

এই খানে বলা আবশ্যক wrung এবং dear শব্দকে দুই মাত্রা বলে গণ্য করেছি, তার কারণ উচ্চারিত syllableএর এক মাত্রার সঙ্গে বিরামের এক মাত্রা যোগ না করলে ছন্দ সম্পূর্ণ হয় না।

অসম অর্থাৎ তিন মাত্রার চলনও দ্রুত।

পাষাণ মিলায় গায়ের বাতাসে—

এর লয়টা দুরন্ত। পড়লেই বোঝা যায় এর প্রত্যেক তিন মাত্রা পরবর্ত্তী তিন মাত্রাকে চাচ্চে, কিছুতে তর সচ্চে না। তিনের মাত্রাটা টলটলে—গড়িয়ে যাবার দিকে তার ঝোঁক। এইজন্যে তিনকে গুণ করে ছয় বা বারো করলেও তার চাপল্য ঘোচে না। দুই মাত্রার চলন ক্ষিপ্র, তিন মাত্রার চঞ্চল, চার মাত্রার মন্থর, আট মাত্রার গম্ভীর। তিন মাত্রার ছন্দে যে পয়ারের মত ফাঁক নেই তা যুক্তাক্ষর জুড়তে গেলেই ধরা পড়বে। যথা—

গিরির গুহায় ঝরিছে নিঝর

এই পদটিকে যদি লেখা যায়

পর্ব্বত কন্দরে ঝরিছে নির্ঝর

তাহলে ছন্দের পক্ষে সাংঘাতিক হয়। অথচ পয়ারে

গিরি গুহাতল বেয়ে ঝরিছে নিঝর

এবং

পর্ব্বত কন্দর তলে ঝরিছে নির্ঝর

ছন্দের পক্ষে দুইই সমান।

বিষম মাত্রার ছন্দের স্বভাব হচ্চে তার প্রত্যেক পদে এক অংশে গতি, আর এক অংশে বাধা। এই গতি এবং বাধার সম্মিলনে তার নৃত্য।

"অহহ কল- য়ামি বল- য়াদি মণি ভূষণং
হরি বিরহ দহন বহ- নেন বহু দূষণং।"

তিন মাত্রার "অহহ" যে ছাঁদে চলবার জন্যে বেগ সঞ্চয় করলে, দুই মাত্রার "কল" তাকে হঠাৎ টেনে থামিয়ে দিলে—আবার পরক্ষণেই তিন যেই নিজমূর্ত্তি ধরলে অমনি আবার দুই এসে তার লাগামে টান দিলে। এই বাধা যদি সত্যকার বাধা হত, তাহলে ছন্দই হত না—এ কেবল বাধার ছল, এতে গতিকে আরো উস্কিয়ে দেয় এবং বিচিত্র করে তোলে। এইজন্যে অন্য ছন্দের চেয়ে বিষম মাত্রার ছন্দে গতিকে আরো যেন বেশি অনুভব করা যায়।

যাই হোক্ আমার বক্তব্য এই, ছন্দের পরিচয়ের মূলে দুটি প্রশ্ন আছে। এক হচ্চে তার প্রত্যেক পদক্ষেপে ক'টি করে মাত্রা আছে। দুই হচ্চে, সে মাত্রা সম, অসম, না বিষম অথবা সম-বিষমের যোগ। আমরা যখন মোটা করে বলে থাকি যে, এটা চোদ্দ মাত্রার ছন্দ, বা ওটা দশ মাত্রার তখন আসল কথাটাই বলা হয় না। তার কারণ পূর্ব্বেই বলেচি চাল অর্থাৎ প্রদক্ষিণের মাত্রায় ছন্দকে চেনা

যায় না—চলন অর্থাৎ পদক্ষেপের মাত্রায় তার পরিচয়। চোদ্দ মাত্রায় শুধু যে পয়ার হয় না, আরো অনেক ছন্দ হয় তার দৃষ্টান্ত দেওয়া যাক্।

বসন্ত পাঠায় দূত রহিয়া রহিয়া,
যে কাল গিয়েছে তারি নিশ্বাস্ বহিয়া।

এই ত পয়ার—এর প্রত্যেক প্রদক্ষিণে দুটি পদক্ষেপ। প্রথম পদক্ষেপে আটটি উচ্চারিত মাত্রা, দ্বিতীয় পদক্ষেপে ছয়টি উচ্চারিত মাত্রা এবং দুটি অনুচ্চারিত অর্থাৎ যতির মাত্রা। অর্থাৎ প্রত্যেক প্রদক্ষিণে মোটের উপর উচ্চারিত মাত্রা চোদ্দ। আমরা পয়ারের পরিচয় দেওয়ার কালে প্রত্যেক প্রদক্ষিণের উচ্চারিত মাত্রার সমষ্টির হিসাব দিয়ে থাকি। তার প্রধান কারণ, কিছুকাল পূর্ব্বে পয়ার ছাড়া চোদ্দ মাত্রা-সমষ্টির ছন্দ আমাদের ব্যবহারে লাগ্‌ত না। নিম্নলিখিত চোদ্দ মাত্রার ছন্দেও ঠিক পয়ারের মতই প্রত্যেক প্রদক্ষিণে দুটি করে পদক্ষেপ :—

ফাগুন এল দ্বারে কেহ যে ঘরে নাই,
পরাণ ডাকে কারে ভাবিয়া নাহি পাই।

অথচ এটা মোটেই পয়ার নয়। তফাৎ হল কিসে যাচাই করে দেখলে দেখা যাবে যে এর প্রতি পদক্ষেপে আটের বদলে সাত উচ্চারিত মাত্রা। আর অনুচ্চারিত মাত্রা প্রতি পদক্ষেপের শেষে একটি করে দেওয়া যেতে পারে—যেমন,

“ফাগুন এল দ্বারে-এ কেহ যে ঘরে না-আ-ই।” কিম্বা কেবল শেষ ছেদে একটি দেওয়া যেতে পারে, যেমন, “ফাগুন এল দ্বারে কেহ যে ঘরে না-আ-ই।” কিম্বা যতি একেবারেই না দেওয়া যেতে পারে।

পুনশ্চ এই ছন্দেরই মাত্রাসমষ্টি সমান রেখে এরই পদক্ষেপ-মাত্রার পরিবর্ত্তন করে যদি পড়া যায় তাহলে শ্লোকটি চোখে দেখতে একই রকম থাকবে কিন্তু কানে শুন্‌তে অন্য রকম হবে। এই খানে বলে রাখি, ছন্দের প্রত্যেক ভাগে একটা করে তালি দিলে পড়বার সুবিধা হবে এবং এই তালি অনুসারে ভিন্ন ছন্দের ভিন্ন লয় ধরা পড়বে। প্রথমে সাত মাত্রাকে তিন এবং চারে স্বতন্ত্র ভাগ করে পড়া যাক্—যেমন,

তালি তালি তালি তালি
ফাগুন এল দ্বারে কেহ যে ঘরে নাই,
পরাণ ডাকে কারে ভাবিয়া নাহি পাই।

তারপরে পাঁচ দুই ভাগ করা যাক্ যেমন,—

তালি তালি তালি তালি
ফাগুন এল দ্বারে কেহ যে ঘরে নাই,
পরাণ ডাকে কারে ভাবিয়া নাহি পাই।

এই চোদ্দ মাত্রাসমষ্টির ছন্দ আরো কত রকম হতে পারে তার কতকগুলি নমুনা দেওয়া যাক্ঃ—দুই পাঁচ দুই পাঁচ ভাগের ছন্দ—যথা—

| | |
সে যে আপন মনে শুধু দিবস গণে *
তার চোখের বারি কাঁপে আঁখির কোণে।

চার তিন চার তিন ভাগ—

| | | |
নয়নের সলিলে যে কথাটি বলিলে
রবে তাহা স্মরণে জীবনে ও মরণে।

---

* এই প্রত্যেক দণ্ডচিহ্নের অনুসরণ করে তাল দেওয়া আবশ্যক।

কিম্বা এক ছয় এক ছয় ভাগ—

| | | |
যে কথা নাহি শোনে সে থাক্ নিজমনে
কে বৃথা নিবেদনে রে ফিরে তার সনে।

সাত চার তিনের ভাগ—

| | |
চাহিছ বারে বারে আপনারে ঢাকিতে,
মন না মানে মানা মেলে ডানা আঁখিতে।

এই কবিতাটাকেই অন্য লয়ে পড়া যায়—

| | | |
চাহিছ বারে বারে আপনারে ঢাকিতে,
মন না মানে মানা মেলে ডানা আঁখিতে।

তিন তিন তিন তিন দুইয়ের ভাগ—

| | | | |
ব্যাকুল বকুল ঝরিল পড়িল ঘাসে,
বাতাস উদাস আমের বোলের বাসে।

এ'কেই ছয় আটের ভাগে পড়া যায়—

| |
ব্যাকুল বকুল ঝরিল পড়িল ঘাসে।
বাতাস উদাস আমের বোলের বাসে ॥

পাঁচ চার পাঁচের ভাগ—

| | |
নীরবে গেলে ম্লান-মুখে আঁচল টানি,
কাঁদিছে দুখে মোর বুকে না-বলা বাণী।

এই শ্লোককেই তিন ছয় পাঁচ ভাগ করা যায়—

| | |
নীরবে গেলে ম্লান-মুখে আঁচল টানি
কাঁদিছে দুখে মোর বুকে না-বলা বাণী।

এর থেকে এই বোঝা যাচ্চে, প্রদক্ষিণের সমষ্টি মাত্রা চোদ্দ হলেও সেই সমষ্টির অংশের হিসাব কে কি ভাবে নিকাস করচে তারই উপর ছন্দের প্রভেদ ধরা পড়ে। কেবল ছন্দ-রসায়নে নয়, বস্তু-রসায়নেও এইরকম উপাদানের মাত্রাভাগ নিয়েই বস্তুর প্রকৃতি-ভেদ ঘটে রাসায়নিকেরা বোধ করি এই কথা বলেন।

পয়ার ছন্দের বিশেষত্ব হচ্চে এই যে, তাকে প্রায় গাঁঠে গাঁঠে ভাগ করা চলে, এবং প্রত্যেক ভাগেই মূল ছন্দের একটা আংশিক রূপ দেখা যায়। যথা,—

ওহে পান্থ, চল পথে, পথে বন্ধু আছে
একা বসে ম্লান-মুখে, সে যে সঙ্গ যাচে।

"ওহে পান্থ"—এইখানে একটা থামবার ষ্টেশন মেলে। তার পরে যথাক্রমে, "ওহে পান্থ চল",—"ওহে পান্থ চল পথে", "ওহে পান্থ চল পথে পথে।" তার পরে "বন্ধু আছে" এই ভগ্নাংশটার সঙ্গে পরের লাইন জোড়া যায়—যেমন, "বন্ধু আছে একা", "বন্ধু আছে একা বসে", "বন্ধু আছে একা বসে সে যে।" কিন্তু তিনের ছন্দকে তার ভাগে ভাগে পাওয়া যায় না, এই জন্যে তিনের ছন্দে ইচ্ছামত থামা চলে না। যেমন, "নিশি দিল ডুব অরুণ সাগরে।" "নিশি দিল", এখানে থামা যায়—কিন্তু তাহলে তিনের ছন্দ ভেঙে যায়—"নিশি দিল ডুব" পর্য্যন্ত এসে ছয় মাত্রা পূরিয়ে দিয়ে তবেই তিনের ছন্দ হাঁফ ছাড়তে পারে।

কিন্তু আবার, "নিশি দিল ডুব অরুণ" এখানেও থামা যায় না, কেননা, তিন এমন একটি মাত্রা, যা আর একটা তিনকে পেলে তবে দাঁড়াতে পারে, নইলে টলে' পড়তে চায়—এই জন্য "অরুণ-সাগর"-এর মাঝখানে থাম্‌তে গেলে রসনা কূল পায় না। তিনের ছন্দে গতির প্রাবল্যই বেশি, স্থিতি কম। সুতরাং তিনের ছন্দ চাঞ্চল্য প্রকাশের পক্ষে ভাল কিন্তু তাতে গাম্ভীর্য্য এবং প্রসারতা অল্প। তিনের মাত্রার ছন্দে অমিত্রাক্ষর রচনা করতে গেলে বিপদে পড়তে হয়—সে যেন চাকা নিয়ে লাঠি খেলার চেষ্টা। পয়ার আট পায়ে চলে বলে তাকে যে কত রকমে চালানো যায় মেঘনাদবধকাব্যে তার প্রমাণ আছে। তার অবতারণাটি পরখ করে' দেখা যাক্। এর প্রত্যেক ভাগে কবি ইচ্ছামত ছোট বড় নানা ওজনের নানা সুর বাজিয়েচেন; কোনো জায়গাতেই পয়ারকে তার প্রচলিত আড্ডায় এসে থামতে দেন নি। প্রথম আরম্ভেই বীরবাহুর বীরমর্য্যাদা সুগম্ভীর হ'য়ে বাজ্‌ল—"সম্মুখ সমরে পড়ি বীরচূড়ামণি বীরবাহু" তার পরে তার অকাল মৃত্যুর সংবাদটি যেন ভাঙা রণ-পতাকার মত ভাঙা ছন্দে ভেঙে পড়্‌ল—"চলি যবে গেলা যমপুরে অকালে"—তার পরে ছন্দ নত হয়ে নমস্কার করলে, "কহ হে দেবি অমৃত-ভাষিণি" তার পরে আসল কথাটা, যেটা সব চেয়ে বড় কথা—সমস্ত কাব্যের ঘোর পরিণামের যেটা সূচনা, সেটা যেন আসন্ন ঝটিকার সুদীর্ঘ মেঘ-গর্জ্জনের মত এক দিগন্ত থেকে আর-এক দিগন্তে উদ্‌ঘোষিত হ'ল—"কোন্ বীরবরে বরি সেনাপতি-পদে পাঠাইলা রণে পুন রক্ষঃকুলনিধি রাঘবারি।"

বাংলা ভাষায় অধিকাংশ শব্দই দুই মাত্রার এবং তিন মাত্রার, এবং ত্রৈমাত্রিক শব্দের উপর বিভক্তি যোগে চার মাত্রার। পয়ারের পদ

বিভাগটি এমন যে, দুই, তিন এবং চার মাত্রার শব্দ তাতে সহজেই জায়গা পায়।

চৈত্রের সেতারে বাজে বসন্ত বাহার,
বাতাসে বাতাসে ওঠে তরঙ্গ তাহার।

এ পয়ারে তিন অক্ষরের ভিড়। আবার

চকমকি-ঠোকাঠুকি-আগুনের প্রায়,
চোখোচোখি ঘটিতেই হাসি ঠিকরায়।

এই পয়ারে চারের প্রাধান্য।

তারাগুলি সারারাতি কানে কানে কয়।
সেই কথা ফুলে ফুলে ফুটে বনময়।

এই খানে দুই মাত্রার আয়োজন।

প্রেমের অমরাবতী প্রেয়সীর প্রাণে,
কে সেথা দেবাধিপতি সে কথা কে জানে।

এই পয়ারে এক থেকে পাঁচ পর্য্যন্ত সকল রকম মাত্রারই সমাবেশ। এর থেকে জানা যায় পয়ারের আতিথেয়তা খুব বেশি আর সেই জন্যেই বাংলা কাব্য সাহিত্যে প্রথম থেকেই পয়ারের এত অধিক চলন।

পয়ারের চেয়ে লম্বা দৌড়ের সমমাত্রার ছন্দ আজকাল বাংলা-কাব্যে চলচে। স্বপ্ন-প্রয়াণে এর প্রথম প্রবর্ত্তন দেখা গেছে। স্বপ্ন-প্রয়াণ থেকেই তার নমুনা তুলে দেখাই—

গম্ভীর পাতাল, যেথা কালরাত্রি করাল বদনা
বিস্তারে একাধিপত্য। শ্বসয়ে অযুত ফণিফণা
দিবানিশি ফাটি' রোষে; ঘোর-নীল বিবর্ণ অনল

শিখা-সজ্ঞ আলোড়িয়া দাপাদাপি করে দেশময়
তমো-হস্ত এড়াইতে—প্রাণ যথা কালের কবল।

উচ্চারিত এবং অনুচ্চারিত মাত্রা নিয়ে পয়ার যেমন আট পদমাত্রায় সমান দুই ভাগে বিভক্ত এ তা নয়। এর একভাগে উচ্চারিত মাত্রা আট, অন্যভাগে উচ্চারিত মাত্রা দশ। এই রকম অসমান ভাগে ছন্দের গাম্ভীর্য্য বাড়ে। ছন্দে পদে পদে ঠিক সমান ওজন দাবি করা কানের যেন একটা বাঁধা মৌতাতের মত দাঁড়ায়, সেইটি ভেঙে দিলে ছন্দের গৌরব আরো বাড়ে। ইংরেজি কাব্যে এর অনেক দৃষ্টান্ত দেখ্‌তে পাই।

১ ২ ৩ ৪ ১ ২ ৩ ৪
(O) Wild West Wind, thou । breath of Autumn's
৫ ৬
being ।

এর প্রথম ভাগে চার মাত্রা, দ্বিতীয় ভাগে যতিসমেত ছয় মাত্রা। মিল্‌টনের

Hail holy light, ofspring of Heaven's first-born

এও এই ছন্দে। সংস্কৃত মন্দাক্রান্তার অসমান ভাগের গাম্ভীর্য্য সবাই জানেন—

কশ্চিৎকান্তা বিরহ গুরুণা স্বাধিকার প্রমত্তঃ

এর প্রথম ভাগে আট, দ্বিতীয় ভাগে সাত, তৃতীয় ভাগে সাত, এবং চতুর্থ ভাগে চার মাত্রা। এমনতর ভাগে কানের কোনো সঙ্কীর্ণ অভ্যাস হবার জো নেই।

সংস্কৃতের সঙ্গে সাধু বাংলা সাহিত্যের ছন্দের যে-একটি বিশেষ প্রভেদ আছে সেইটির কথা এখানে সংক্ষেপে আলোচনা করা যাক্। সংস্কৃত উচ্চারণের বিশেষত্ব হচ্চে তার ধ্বনির দীর্ঘ হ্রস্বতা। সেইজন্য সংস্কৃত ছন্দ কেবলমাত্র পদক্ষেপের মাত্রা গণনা করেই নিশ্চিন্ত থাকে না, নির্দ্দিষ্ট নিয়মে দীর্ঘ হ্রস্ব মাত্রাকে সাজানো তার ছন্দের অঙ্গ। আমি একটি বাংলা বই থেকে এর দৃষ্টান্ত তুলচি। বইটির নাম ছন্দঃ কুসুম। আজ চুয়ান্ন বছর পূর্ব্বের এটি রচনা। লেখক ভুবন মোহন রায় চৌধুরী রাধাকৃষ্ণের লীলাচ্ছলে বাংলা ভাষায় সংস্কৃত ছন্দের দৃষ্টান্ত দিয়ে ছন্দ শিক্ষা দেবার চেষ্টা করেচেন। কৃষ্ণবিরহিণী রাধা কালো রংটারই দূষণীয়তা প্রমাণ করবার জন্যে যখন কালো কোকিল কালো ভ্রমর কালো পাথর কালো লোহার নিন্দা করলেন তখন অপর পক্ষের উকীল লোহার দোষ ক্ষালন করতে প্রবৃত্ত হলেন—

॥ । । ॥ । । ॥ । । ॥ । । ॥ । । । ॥ । । ॥ । । । ॥ । ।
দেখহ সুন্দর লৌহ র থে চড়ি লৌহ প থে কত লোক চ লে
ষষ্ঠ মু হূর্ত্তক ম ধ্য করে গতি যোজন পঞ্চদশের পথে।
লৌহ-বিনির্ম্মিত তার তরে বহুদূর-অবস্থিত লোক সবে
দূর অবস্থিত বন্ধুসনে সুখচিত্ত পরস্পর বাক্য কহে।

এই কবিতাটির যুক্তি ও আধ্যাত্মিক রসমাধুর্য্যের বিচার ভার আধুনিক কালের বস্তুতান্ত্রিক উকীল রসিকদের উপর অর্পণ করা গেল—তা ছাড়া লোকশিক্ষায় এর প্রয়োজনীয়তার তর্ক তোলবার অধিকারীও আমি নই। আমি ছন্দের দিক দিয়ে বল্‌চি—এর প্রত্যেক পদভাগে একটি দীর্ঘ ও দুইটি হ্রস্ব মাত্রা—সেই দীর্ঘ হ্রস্বের ওঠা-পড়ার পর্য্যায়ই হচ্চে এই ছন্দের প্রকৃতি। বাংলায় স্বরের দীর্ঘ হ্রস্বতা

নাই কিম্বা নাই বল্লেই হয় এবং যুক্ত ব্যঞ্জনকে সাধু বাংলা কোন গৌরব দেয় না—অযুক্তের সঙ্গে একই বাট্‌খারায় তার ওজন চলে। অতএব মাত্রা সংখ্যা মিলিয়ে ঐ লোহার স্তব যদি বাংলা ছন্দে লেখা যায় তাহলে তার দশা হয় এইঃ—

দেখ দেখ মনোহর লোহার গা- ড়িতে চড়ি

লোহা পথে কত শত মানুষ চ- লিছে।

দেখিতে দে- খিতে তারা যোজন যো- জন পথ

অনায়াসে তরে' যায় টিকিট কি- নিয়া।

যে সব মানুষ আছে অনেক দূরের দেশে,

লোহা দিয়ে গড়া তার রয়েছে বলিয়া

সুদূর বঁধুর সাথে কত যে মনের সুখে

কথা চালাচালি করে নিমেষে নিমেষে।

বাংলায় আর সবই রইল—মাত্রাও রইল, আর সম্ভবত আধ্যাত্মিকতারও হানি হয় নি—কেননা ভক্তির টিকিট থাকলে লোহার গাড়ি যে কঠিন লোহার পথও তরিয়ে দেয় এবং বঁধুর সঙ্গে যতই দূরত্ব থাক স্বয়ং লোহার তারে তাদের কথা চালাচালি হতে পারে এ ভাবটা বাংলাতেও প্রকাশ পাচ্চে—কিন্তু মূল ছন্দের প্রকৃতিটা বাংলায় রক্ষা পায় নি। এ কেমন, যেমন ঢেউ-খেলানো দেশের জমির পরিমাণ সমতল দেশে জরিপের দ্বারা মিলিয়ে নেওয়া। তাতে জমি পাওয়া গেল কিন্তু ঢেউ পাওয়া গেল না। অথচ ঢেউটা ছন্দের একটা প্রধান জিনিস। সমতল বাংলা আপন কাব্যের ভাষাকে সমতল করে দিয়েচে। এ হচ্চে কাজকে সহজ করবার একটা কৃত্রিম বাঁধা নিয়ম। আমরা যখন বলি থার্ডক্লাসের ছেলে, তখন মনে ধরে নিই যেন সব ছেলেই

সমান মাত্রার। কিন্তু আসলে থার্ড-ক্লাসের আদর্শকে যদি একটা সরল রেখা বলে ধরে নিই তবে কোনো ছেলে সেই রেখার উপরে চড়ে কেউবা তার নীচে নামে। ভাল শিক্ষা প্রণালী তাকেই বলে যাতে প্রত্যেক ছেলেকে তার নিজের স্বতন্ত্র বুদ্ধি ও শক্তির মাত্রা অনুসারে ব্যবহার করা যায়—থার্ড-ক্লাসের একটা কাল্পনিক মাত্রা ক্লাসের সকল ছেলের উপরে সমান ভাবে আরোপ না করা যায়। কিন্তু কাজ সহজ করবার জন্য বহু অসমানকে এক সমান কাঠগড়ায় বন্দী করবার নিয়ম আছে। সাধু বাংলার ছন্দে তারই প্রমাণ পাই। হলন্তই হোক্ হসন্তই হোক্ আর যুক্তবর্ণ ই হোক এই ছন্দে সকলেরই সমান মাত্রা।

অথচ প্রাকৃত বাংলার প্রকৃতি সমতল নয়। সংস্কৃতের নিয়মে না হোক নিজের নিয়মে তার একটা ঢেউ খেলা আছে। তার কথার সকল অংশ সমান ওজনের নয়। বস্তুতঃ পদেপদেই তার শব্দ বন্ধুর হয়ে ওঠে। তার কারণ, প্রাকৃত বাংলায় হসন্তের প্রাদুর্ভাব খুব বেশি। এই হসন্তের দ্বারা ব্যঞ্জন বর্ণের মধ্যে সংঘাত জন্মাতে থাকে—সেই সংঘাতে ধ্বনি গুরু হয়ে ওঠে। প্রাকৃত বাংলার এই গুরুধ্বনির প্রতি যদি সদ্ব্যবহার করা যায় তাহলে ছন্দের সম্পদ বেড়ে যায়। প্রাকৃত বাংলার দৃষ্টান্ত

> বৃষ্টি পড়ে টাপুর্ টুপুর্ নদেয়্ এল বান্
> শিব্ ঠাকুরের্ বিয়ে হবে তিন্ কন্যে দান্
> এক্ কন্যে রাঁধেন্ বাড়েন্ এক্ কন্যে খান্
> এক্ কন্যে না পেয়ে বাপের্ বাড়ি যান্।

এই ছড়াটিতে দুটি জিনিস দেখবার আছে। এক হচ্চে বিসর্গের ঘটকালিতে ব্যঞ্জনের সঙ্গে ব্যঞ্জনের সম্মিলন—আর এক হচ্ছে "বৃষ্টি" এবং

"কন্ঠে" কথার যুক্ত বর্ণকে যথোচিত মর্য্যাদা দেওয়া। এই ছড়া সাধু বাংলার ছন্দে বাঁধলে পালিস করা আব্‌লুস কাঠের মত পিছল হয়ে ওঠে।

বারি ঝরে ঝর ঝর নদিয়ায় বান
শিবুঠাকুরের বিয়ে তিন মেয়ে দান।
এক মেয়ে রাঁধিছেন এক মেয়ে খান,
এক মেয়ে ক্ষুধাভরে পিতৃঘরে যান।

এতে যুক্ত বর্ণের সংযোগ হলেও ছন্দের উল্লাস তাতে বিশেষ বাড়ে না। যথা—

মন্দ মন্দ বৃষ্টি পড়ে, নবদ্বীপে বান,
শিবুঠাকুরের বিয়া তিন কন্যা দান।
এক কন্যা রান্ধিছেন, এক কন্যা খান,
এক কন্যা ঊর্দ্ধশ্বাসে পিতৃগৃহে যান।

এই সব যুক্ত বর্ণের যোগে এ ছন্দ বন্ধুর হয়ে উঠেচে বটে কিন্তু তরঙ্গিত হয় নি—কেন না যুক্ত বর্ণ যথেচ্ছা ছড়ানো হয়েচে মাত্র, তাদের মর্য্যাদা অনুসারে জায়গা দেওয়া হয়নি। অর্থাৎ হাটের মধ্যে ছোটয় বড়য় যেমন গায়ে গায়ে ভিড় করে তেমনি, সভার মধ্যে যেমন তারা যথাযোগ্য আসন পায় তেমন নয়।

ছন্দঃকুসুম বইটির লেখক প্রাকৃত বাংলার ছন্দ সম্বন্ধে অনুষ্টুভ ছন্দে বিলাপ করে বলেচেন—

পাঁচালী নাম বিখ্যাতা, সাধারণ মনোরমা
পয়ার ত্রিপদী আদি প্রাকৃতে হয় চালনা।

দ্বিপাদে শ্লোক সম্পূর্ণ তুল্য সংখ্যার অক্ষরে,
পাঠে দুই পদে মাত্র শেষাক্ষর সদা মিলে।
পঠনে সে সব ছন্দঃ রাখিতে ভাল গৌরব
পঠিছে সর্ব্বদা লোকে উচ্চারণ-বিপর্য্যয়ে।
লঘুকে গুরু সম্ভাষে দীর্ঘবর্ণে কহে লঘু,
হ্রস্বে দীর্ঘে সমজ্ঞানে উচ্চারণ করে সবে।

কবির এই বিলাপের সঙ্গে আমিও যোগ দিচ্চি। কেবল আমি এই বল্‌তে চাই প্রাকৃত বাংলার ছন্দে এমনতর দুর্ঘটনা ঘটে না, এ সব ঘটে সংস্কৃত বাংলার ছন্দে। প্রাকৃত বাংলার যে স্বকীয় দীর্ঘ-হ্রস্বতা আছে তার ছন্দে তার বিপর্য্যয় দেখিনে কিন্তু সাধু ভাষায় দেখি।

এই প্রাকৃত বাংলা মেয়েদের ছড়ায় বাউলের গানে রামপ্রসাদের পদে আপন স্বভাবে প্রকাশ পেয়েচে। কিন্তু সাধু সভায় তার সমাদর হয় নি বলে সে মুখ ফুটে নিজের সব কথা বল্‌তে পারে নি এবং তার শক্তি যে কত তারও সম্পূর্ণ পরিচয় হল না। আজকের দিনের ডিমক্রেসির যুগেও সে ভয়ে ভয়ে দ্বিধা করে চলেচে; কোথায় যে তার পংক্তি এবং কোথায় নয় তা স্থির হয়নি। এই সঙ্কোচে তার আত্ম পরিচয়ের খর্ব্বতা হচ্চে। একদিন বাঙালীকে বলা হত বাঙালী কেরাণীগিরি করতে পারে, বিশুদ্ধ বিশেষত অবিশুদ্ধ ইংরেজি লিখ্‌তে ও বলতে তার বাহাদুরী আছে কিন্তু সে রাষ্ট্রশাসন কিম্বা যুদ্ধ করতে পারে না। এমন অবিশ্বাস ও সন্দেহের কথা যত দিন বলা হবে, ততদিন আমাদের শক্তির প্রমাণ হবে না। প্রাকৃত বাংলাকেও সেইরকম অবজ্ঞা ও অবিশ্বাসের উপর রাখা হয়েচে সেই জন্যে তার পূর্ণ পরিচয় হচ্চে না। আমরা একটা কথা ভুলে যাই প্রাকৃত বাংলার লক্ষ্মীর পেট্‌রায় সংস্কৃত, পারসী ইংরেজি প্রভৃতি নানা

ভাষা থেকেই শব্দ সঞ্চয় হচ্চে—সেই জন্যে শব্দের দৈন্য প্রাকৃত বাংলার স্বভাবগত বলে মনে করা উচিত নয়। প্রয়োজন হলেই আমরা প্রাকৃত ভাণ্ডারে সংস্কৃত শব্দের আমদানি করতে পারব। কাজেই যেখানে অর্থের বা ধ্বনির প্রয়োজন বশত সংস্কৃত শব্দই সঙ্গত সেখানে প্রাকৃত বাংলায় তার বাধা নেই। আবার ফার্সি কথাও তার সঙ্গে সঙ্গেই আমরা একসারে বসিয়ে দিতে পারি। সাধু বাংলায় তার বিঘ্ন আছে—কেননা সেখানে জাতিরক্ষা করাকেই সাধুতারক্ষা করা বলে। প্রাকৃত ভাষার এই ঔদার্য্য গদ্যে পদ্যে আমাদের সাহিত্যের একটি পরম সম্পদ এই কথা মনে রাখ্‌তে হবে।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

ফরমায়েসি-গল্প।

——:*:——

মকদমপুরের জমিদার রায় মহাশয় সন্ধ্যা-আহ্নিক করে', সিকি ভরি অহিফেন সেবন করে', যখন বৈঠকখানায় এসে বসলেন, তখন রাত এক প্রহর। তিনি মসনদের উপর তাকিয়া হেলান দিয়ে বসে' গুড়গুড়ির নল মুখে দিয়ে ঝিমতে লাগলেন। সভাস্থ ইয়ার-বক্সির দল সব চুপ করে রইল; পাছে হুজুরের ঝিমুনির ব্যাঘাত হয়, এই ভয়ে কেউ টুঁ-শব্দও করলে না। খানিকক্ষণ বাদে রায় মহাশয় হঠাৎ জেগে উঠে গা-ঝাড়া দিয়ে বসে প্রথম কথা বল্লেন—"ঘোষাল! গল্প বল"।

রায় মহাশয়ের মুখ থেকে এ কথা পড়্তে না পড়্তে তাঁর ডান-ধার থেকে একটি গৌরবর্ণ ছিপছিপে টেড়িকাটা যুবক, হাসি-মুখে চাঁচা গলায় উত্তর করলে—

যে-আজ্ঞে হুজুর, বলছি।

—আজ কিসের গল্প বল্‌বি বল্ ত?

—বর্ষার গল্প হুজুর।

—একে শ্রাবণ মাস, তায় আবার তেমনি মেঘ করেছে, তাই আজ ঘোষাল বর্ষার গল্প বল্‌বে। ওর রসবোধটা খুব আছে। কি বলেন—পণ্ডিত মহাশয়?

একটি অস্থি-চর্ম্মসার দীর্ঘাকৃতি পুরুষ একটিপ নস্য নিয়ে সানু-নাসিক স্বরে উত্তর করলেন—

—তার আর সন্দেহ কি? তা না হলে কি মহাশয়ের মত গুণগ্রাহী লোক আর ওকে মাইনে করে চাকর রাখেন? তবে জিজ্ঞাস্য হচ্ছে এই যে, ঘোষাল আজ কি রসের অবতারণা করবে?

ঘোষাল তিলমাত্র দ্বিধা না করে বললে—

—মধুর রসের। বর্ষার রাত্তিরে আর কি রস ফোটানো যায়?

রায় মহাশয় জিজ্ঞাসা করলেন "কেন ভূতের গল্প চলবে না? কি বলেন স্মৃতিরত্ন?"

—আজ্ঞে চলবে না কেন, তবে তেমন জমবে না। ভয়ানক রসের অবতারণা শীতের রাত্রেই প্রশস্ত।

ঘোষাল পণ্ডিত মহাশয়ের মুখের কথা কেড়ে নিয়ে বলে উঠল—

—এ লাখ কথার এক কথা। কেননা মানুষের বাইরেটা যখন শীতে কাঁপছে, তখনি তার ভিতরটা ভয়ে কাঁপানো সঙ্গত। এই দুই কাঁপুনিতে মিলে গেলে, গল্পের আর রসভঙ্গ হয় না।

পণ্ডিত মহাশয় এ কথা শুনে মহা-খুসি হয়ে বল্লেন—

—তা ত বটেই, তা ত বটেই! আর তা ছাড়া মধুর রসের মধ্যেই ত ভয়ানক প্রভৃতি সকল রসই বর্ত্তমান, তাতেই না অলঙ্কার শাস্ত্রে ওর নাম—আদিরস।

রায় মহাশয়ের মুখ দিয়ে এতক্ষণ শুধু অম্বরি তামাকের ধোঁয়ার একটি ক্ষীণ ধারা বেরচ্ছিল—এইবার আবার কথা বেরল—কিন্তু তার ধারা ক্ষীণ নয়—

—আপনার অলঙ্কার শাস্ত্রে যা বলে বলুক, তাতে কিছু যায় আসে না। আমার কথা হচ্ছে এই, আমি এখন বুড়ো হতে চল্লুম—বয়েস প্রায় পঞ্চাশ হ'ল। এ বয়েসে প্রেমের কথা কি আর ভাল লাগ্‌বে? ও সব গল্প যাও ছেলে-ছোকরাদের শোনাও গিয়ে।

উপস্থিত সকলেই জানতেন যে রায় মহাশয় তাঁর বয়েস থেকে তাঁর তৃতীয় পক্ষের সহধর্ম্মিণীর বয়েস—অর্থাৎ ঝাড়া পোনেরো বৎসর চুরি করেছেন, অতএব তাঁর কথার আর কেউ প্রতিবাদ কর্‌লেন না। শুধু ঘোষাল বল্‌লে—

—হুজুর, ছেলে-ছোকরারা নিজেরা প্রেম কর্‌তে এত ব্যস্ত যে প্রেমের গল্প শোনায় তাদের ফুরসৎ নেই। তা ছাড়া আদিরসের কথা শোনায় ছেলেদের নীতি খারাপ হয়ে যেতে পারে—হুজুরের ত আর সে ভয় নেই!

—দেখেছেন পণ্ডিত মশায়, ঘোষাল কেমন হিসেবি লোক! যাই বলুন, কার কাছে কোন কথা বল্‌তে হয়, তা ও জানে।

—সে কথা আর বল্‌তে? শাস্ত্রে বলে যৌবনে যার মনে বৈরাগ্য আসে সেই যথার্থই বিরক্ত, আর বৃদ্ধ বয়সেও যার মনে রস থাকে সেই যথার্থ রসিক। ঘোষাল কি আর না বুঝে সুঝে কথা কয়? ও জানে আপনার প্রাণে এ বয়েসেও যে রস আছে, এ কালের যুবোদের মধ্যে হাজারে এক জনেরও তা নেই।

—ঠিক বলেছেন পণ্ডিত মশায়। আমি সেদিন যখন সেই ভৈরবীর টপ্পাটা গাইলুম, হুজুর শুনে কত বাহবা দিলেন; আর সেই গানটাই একটা পয়লা-নম্বরের M. A.-এর কাছে গাওয়াতে সে ভদ্রলোক কানে হাত দিলে। বল্‌লে অশ্লীল।

—কোন গানটা রে ঘোষাল ?

—"গোরী তুনে নয়না লাগাওয়ে যাদুডারা—"

—কি বলছিস ঘোষাল, ঐ গান শুনে ইষ্টুপিটু কানে হাত দিলে ? অমন কান মলে দিতে পারলি নে ? হতভাগাদের যেমন ধর্ম্মজ্ঞান তেমনি রসজ্ঞান। ইংরেজি পড়ে জাতটে একেবারে অধঃপাতে গেল !

এই কথা শুনে সে সভার সব চাইতে হৃষ্টপুষ্ট ও খর্ব্বাকৃতি ব্যক্তিটি অতি মিহি অথচ তীব্র গলায় এই মত প্রকাশ করলেন যে—

—অধঃপাতে গিয়েছিল বটে, কিন্তু এখন আবার উঠছে।

—তুমি আবার কি তত্ত্ব বার করলে হে উজ্জ্বল নীলমণি ?—

রায় মহাশয় যাঁকে সম্বোধন করে এ প্রশ্ন করলেন, তাঁর নাম নীলমণি গোস্বামী। ঘোষাল তার পিছন থেকে গোস্বামীটি কেটে দিয়ে সুমুখে "উজ্জ্বল" শব্দটি জুড়ে দিয়েছিল। তার এক কারণ, গোস্বামী মহাশয়ের বর্ণ ছিল, উজ্জ্বল নয় ঘোরশ্যাম ; আর এক কারণ, তিনি কথায় কথায় উজ্জ্বল-নীলমণির দোহাই দিতেন। এই নাম করণের পর সে রোগ তাঁর সেরে গিয়েছিল।

জমিদার মহাশয়ের প্রশ্নের উত্তরে গোঁসাইজি বললেন—

—আজ্ঞে, ইংরাজিনবীশদের যে মতিগতি ফিরছে তা আমি জেনে শুনেই বলছি। আমারই জনকত পাসকরা শিষ্য আছে, যাদের কাছে ঘোষাল যদি ও গানটা না গেয়ে, গান ধরত

গেলি কামিনী গজবরগামিনী

বিহসি পালটি নেহারি

তাহলে আমি হলপ করে বল্‌তে পারি তারা ভাবে একেবারে বিভোর হয়ে যেত।

—ও দুয়ের তফাৎটা কোথায় ?

—তফাৎটা কোথায় ? বল্‌লেন ভাল পণ্ডিত মশায় ! একটা টপ্পা আর একটা কীর্ত্তন !

—অর্থাৎ তফাৎ যা তা নামে !

—অবাক করলেন ! তাহলে শোরীমিয়ার সঙ্গে বিদ্যাপতি ঠাকুরের প্রভেদও শুধু নামে। নামের ভেদেই ত বস্তুর ভেদ হয়। কিন্তু এ ক্ষেত্রে আসল প্রভেদ রসে। যাক্ আপনার সঙ্গে রসের বিচার করা বৃথা। রসজ্ঞান ত আর টোলে জন্মায় না।

—বটে ! অমরু শতক থেকে সুরু করে নৈষধের অষ্টাদশ সর্গ পর্য্যন্ত আলোচনা করে যদি রসজ্ঞান না জন্মায়—তাহলে মনু থেকে সুরু করে রঘুনন্দনের অষ্টাদশ তত্ত্ব পর্য্যন্ত আলোচনা করেও ধর্ম্মজ্ঞান জন্মায় না।

—রাগ করবেন না পণ্ডিত মশায়, কিন্তু কথাটা এই যে, সংস্কৃত-কাব্যের রস আর পদাবলীর রস এক বস্তু নয়—ও দুয়ের আকাশ পাতাল প্রভেদ।

—আপনি ত দেখ্‌ছি এক কথারই বার বার পুনরুক্তি করছেন। মানলুম টপ্পা ও কীর্ত্তন এক বস্তু নয়—কাব্যরস ও পদাবলীর রস এক বস্তু নয়। কিন্তু পার্থক্য যে কোথায়, তা ত আপনি দেখিয়ে দিতে পারছেন না।

—তফাৎ আছে বৈকি। যেমন তালের রস ও তাড়ি একবস্তু নয়—

একটায় নেশা হয়, আর একটায় হয় না। সংস্কৃত কবিতা পড়ে কেউ কখন ধূলোয় গড়াগড়ি দেয়?

ঘোষালের এ মন্তব্য শুনে মায় স্মৃতিরত্ন সভাসুদ্ধ লোক হেসে উঠল। উজ্জ্বল নীলমণি মহাক্রুদ্ধ হয়ে বললেন—

—পণ্ডিত মহাশয়, আপনিও এই সব ইয়ারকির প্রশ্রয় দেন—আশ্চর্য্য! যেমন ঘোষালের বিদ্যে তেমনি তার বুদ্ধি।

রায় মহাশয় ঘোষালকে চব্বিশঘণ্টা ধমকের উপরেই রাখতেন; কিন্তু তার বিরুদ্ধে অপর কাউকেও একটি কথা বল্‌তে দিতেন না। "আমার পাঁঠা আমি লেজের দিকে কাট্‌ব, কিন্তু অপর কাউকে মুড়ির দিকেও কাট্‌তে দেব না"--এই ছিল তাঁর motto. তিনি তাই একটু গরম হয়ে বল্‌লেন—

— কেন, ওর বুদ্ধির কমতিটে দেখলে কোথায় হে উজ্জ্বল নীলমণি! তোমাদের মত ওর পেটে বিদ্যে না থাক্‌তে পারে, কিন্তু মগজে ঢের বেশি বুদ্ধি আছে। তাগমাফিক অমনি একটি যুতসই উপমা লাগাও দেখি!

—আজ্ঞে, ওর বুদ্ধি থাক্‌তে পারে—কিন্তু রসজ্ঞান নেই।

—রসজ্ঞান ওর নেই, আর তোমার আছে? করো ত অমনি একটা রসিকতা!

—আজ্ঞে ঐ রসিকতাই প্রমাণ, ওর মনে ভক্তির নামগন্ধও নেই। যার ধর্ম্মজ্ঞান নেই, তার আবার রসজ্ঞান!

স্মৃতিরত্ন এ কথা শুনে আর চুপ থাক্‌তে পারলেন না। বল্লেন—

—এ আবার কি অদ্ভুত কথা? ঘোষালের ধর্ম্মজ্ঞান না থাক্‌তে পারে, তাই বলে কি ওর রসজ্ঞান থাক্‌তে নেই?

—অবশ্য না! ও দুইত আর পৃথক জ্ঞান নয়।

—আমাদের কাছে যা সামান্য, আপনার কাছে যখন তা বিশেষ, আমাদের কাছে যা বিশেষ আপনার কাছে তা অবশ্য সামান্য; এ এক নব্যন্যায় বটে।

—শুনুন পণ্ডিত মশায়! যার নাম রসজ্ঞান তারি নাম ধর্ম্মজ্ঞান, আর যার নাম ধর্ম্মজ্ঞান তারি নাম রসজ্ঞান। নামের প্রভেদে ত আর বস্তুর প্রভেদ হয় না।

—বলেন কি গোঁসাইজি! তাহলে আপনাদের মতে, যার নাম কাম তারি নাম ধর্ম্ম, আর যার নাম অর্থ তারি নাম মোক্ষ?

—আসলে ও সবই এক। রূপান্তরে শুধু নামান্তর হয়েছে।

—বুঝছেন না পণ্ডিত মশায়, কথা খুব সোজা। গোঁসাইজি বলছেন কি যে, যার নাম ভাজা চাল তারি নাম মুড়ি—নামান্তরে শুধু রূপান্তর হয়েছে।

মদের পিঠ পিঠ এই চাটের উপমা আসায়, রায় মহাশয়ের পাত্র-মিত্রগণ মহা খুসি হয়ে অট্টহাস্যে ঘোষালের এ টিপ্পনির অনুমোদন করলেন। উজ্জ্বল নীলমণি এর প্রতিবাদ করতে উদ্যত হবামাত্র, তাঁর মাথার উপর থেকে একটা টিকটিকি বলে উঠল "ঠিক ঠিক ঠিক"। সঙ্গে সঙ্গে স্মৃতিরত্ন মহাশয়ের প্রস্ফুরিত ও বিস্ফারিত নাসিকারন্ধ্র হতে একটা প্রচণ্ড সহাস্য হেঁচ্চধ্বনি নির্গত হয়ে, উজ্জ্বল নীলমণির বক্ষদেশ যুগপৎ হাস্য ও নস্যরসে সিক্ত করে দিলে। তিনি অমনি "রাধামাধব" বলে সরে বসলেন। রায় মহাশয় এই সব ব্যাপার দেখে শুনে ভারি চটে বললেন—

—তোমরা কটায় মিলে ভারি গণ্ডগোল বাধালে ত হে! আমি শুন্‌তে চাইলুম গল্প আর এঁরা সুরু করে দিলেন তর্ক—আর সে তর্কের যদি কোনও মাথামুণ্ডু থাকে। ঘোষাল! গল্প বল।

—হুজুর, এই বল্লুম বলে।

—শীগ্‌গির, নইলে এরা আবার তর্ক জুড়ে দেবে। একি আমার শ্রাদ্ধের সভা যে, নাগাড় পণ্ডিতের বিচার চল্‌বে?

উজ্জ্বল নীলমণি বল্‌লেন—

—আজ্ঞে, সে ভয় নেই। যে সভায় ঘোষাল বক্তা, সে সভায় যদি আমি আর মুখ খুলি ত আমার নামই নয়—

"ভদ্রং কৃতং কৃতং মৌনং কোকিলঃ জলদাগমে।"

—পণ্ডিত মশায়ের বচনটি খাপে খাপে মিলে গিয়েছে। কাল যে বর্ষা, তা ত সকলেই জানেন। তার উপর গোঁসাইজির কোকিলের সঙ্গে যে এক বিষয়ে সাদৃশ্য, আছে সে ত প্রত্যক্ষ।

উজ্জ্বল নীলমণির গায়ে এই কথার নখ বসিয়ে দিয়ে ঘোষাল আরম্ভ কর্‌লে—

—তবে বলি শ্রবণ করুন।

—দেখ্ মধুর রসের বলে গল্প যেন একদম চিনির পানা করে তুলিস্ নে। একটু নুনঝাল যেন থাকে।

—হুজুর যে অরুচিতে ভুগছেন, তাকি আর জানিনে?

—আর দেখ্, একটু অলঙ্কার দিয়ে বলিস্—একেবারে যেন সাদা না হয়।

—অলঙ্কারের সখই যে আজকাল হুজুরের প্রধান সখ, তা ত আর কারও জান্‌তে বাকী নেই।

—কিন্তু সে অলঙ্কার যেন ধারকরা কিম্বা চুরিকরা না হয়।

—হুজুর, ভয় নেই। পরের সোনা এখানে কানে দেব না, তাহলে গোঁসাইজি তা হেঁচকাটানে কেড়ে নেবেন। কিন্তু এক্ষেত্রে নিজের জিনিস ব্যবহার করলে সবাই সোনাকে বল্‌বে পিতল, আর বড় অনুগ্রহ করে ত—গিল্টি।

—অন্যে যে যা বলে তা বলুক—কিন্তু আসল ও নকলের প্রভেদ আমার চোখে ঠিক ধরা পড়্‌বে।

—হুজুর জহুরি, সেই ত ভরসা। তবে শুনুন—

শ্রাবণমাস, অমাবস্যার রাত্তির, তার উপর আবার তেমনি দুর্য্যোগ। চারদিক একেবারে অন্ধকারে ঠাসা। আকাশে যেন দেবতারা আবলুশ কাঠের কপাট ভেজিয়ে দিয়েছে;—আর তার ভিতর দিয়ে যা গলে পড়্‌ছে তা জল নয়,—একদম আলকাতরা। আর তার এক একটা ফোঁটা কি মোটা, যেন তামাকের গুল—

—কাঠের কপাটের ভিতর দিয়ে জল কি করে গলে পড়্‌বে বলত মূর্খ? যখন বর্ণনা সুরু করে দিস, তখন আর তোর সম্ভব অসম্ভবের জ্ঞান থাকে না। বল্ জল চুঁইয়ে পড়্‌ছে!

—হুজুর বল্‌তে চান আমি বস্তুতন্ত্রতার ধার ধারি নে। আজ্ঞে তা নয়, আমি ঠিকই বলেছি। জল গলেই পড়্‌ছে, চুঁইয়ে নয়। কপাট বটে, কিন্তু—ফারফোরের কাজ, ভাষায় যাকে বলে জালির কাজ। সেই জালির ফুটো দিয়ে—

—দেখলেন স্মৃতিরত্ন, ঘোষালের ঠিকে ভুল হয় না।

এই শুনে দেওয়ানজি বল্‌লেন—

— দেখলে ঘোষাল! ঠিকে ভুল কর্ত্তার চোখ এড়িয়ে যায় না।

—সে আর বল্‌তে। হুজুর হিসেব নিকেশে যদি অত পাকা না হতেন তা হলে তার বাড়িতে আর পাকা চণ্ডীমণ্ডপ হয়, আগে যার চালে খড় ছিল না।

—তুমি কার কথা বল্‌ছ হে,—আমার ?

—যে নল চালায় সে কি জানে, কার ঘরে গিয়ে সে নল ঢুকবে ? যাক্ ও সব কথা, এখন গল্প শুনুন।

এই দুর্য্যোগের সময় একটি ব্রাহ্মণের ছেলে, বয়েস আন্দাজ পঁচিশ ছাব্বিশ, এক তেপান্তর মাঠের ভিতর এক বটগাছের তলায় একা দাঁড়িয়ে ঠায় ভিজছিল।

—কি বল্লি ! ব্রাহ্মণের ছেলে রাত দুপুরে গাছতলায় দাঁড়িয় ভিজছে আর তুই ঘরের ভিতর বসে মনের সুখে গল্প বলে যাচ্ছিস ? ও হবে না ঘোষাল, ওকে ওখান থেকে উদ্ধার কর্‌তে হবে !

—হুজুর, অধৈর্য্য হবেন না; উদ্ধার ত করবই। নইলে মধুর রসের গল্প হবে কি করে ? কেউ ত আর নিজের সঙ্গে নিজে প্রেম কর্‌তে পারে না।

—তা ত জানি, কিন্তু তুই হয়ত ঐখানেই আর একটাকে এনে জোটাবি ! গল্প সুরু করে দিলে তোর ত আর কাণ্ডাকাণ্ড জ্ঞান থাকে না।

—দেখুন রায় মহাশয়, ঘোষাল যদি তা করে, তাতেও অলঙ্কার শাস্ত্রের হিসেবে কোনও দোষ হয় না। সংস্কৃত কবিরাও ত অভিসারিকাদের এমনি দুর্য্যোগের মধ্যেই বার কর্‌তেন।

—দেখুন পণ্ডিত মহাশয়, সেকালে তাদের হাড় মজবুত ছিল,

একালের ছেলেমেয়েদের আধঘণ্টা জলে ভিজলে নির্ঘাৎ pneumonia হবে। এ যে বাঙ্গলাদেশ, তায় আবার কলিকাল !

এ কথা শুনে উজ্জ্বলনীলমণি আর স্থির থাকতে পারলেন না, সবেগে বলে উঠলেন—

—তাতে কিছু যায় আসে না মশায়। পদাবলী পড়ে দেখ্‌বেন,— কি ঝড়জলের মধ্যে অভিসারিকারা ঘর থেকে বেরিয়ে পড়্‌তেন, এবং তাতে করে তাঁদের কারও যে কখনো অপমৃত্যু ঘটেছে, এ কথা কোনও পদাবলীতে বলে না। আসল কথাটা কি জানেন, মনের ভিতর যার আগুন জ্বলছে, বাইরের জলে তার কি করবে ?

—হুজুর ত ঠিকই ভয় পেয়েছেন। অভিসারিকাদের চামড়া মোম-জামা হতে পারে, কিন্তু তাই বলে ব্রাহ্মণসন্তানকে জলে ভেজালে যে ব্রহ্মহত্যা হবে না, কে বল্‌তে পারে ? অভিসারক বলে ত আর কোনও জানোয়ার নেই। দেখুন হুজুর, ব্রাহ্মণের ছেলে ভিজছিল বটে, কিন্তু তার গায়ে জল লাগছিল না। তার মাথায় ছিল ছাতা, গায়ে বর্ষাতি, আর পায়ে বুট জুতো। তার পর শুনুন—

শুধু ঝড়জল নয়। মাথার উপর বজ্র ধমকাচ্ছিল আর চোখের সুমুখে বিদ্যুৎ চমকাচ্ছিল। সে এক তুমুল ব্যাপার। লাখে লাখে তুবড়ি ছুটছে, ঝাঁকে ঝাঁকে হাউই উড়ছে, তারি ফাঁকে ফাঁকে বোমা ফুটছে—সেদিন স্বর্গে হচ্ছিল দেওয়ালি।

—কি বল্‌লি ঘোষাল, শ্রাবণ মাসে দেওয়ালি,—তুই দেখছি পাঁজি মানিস নে !

—আজ্ঞে আমি মানি, কিন্তু দেবতারা মানেন না। স্বর্গেত সমস্ত-ক্ষণই শুভক্ষণ। কি বলেন পণ্ডিত মশায় ?

—তা ত ঠিকই—আমাদের পক্ষে যা নৈমিত্তিক দেবতাদের পক্ষে তা কাম্য। সুতরাং তাঁরা যখন যা খুসি তখনই সেই উৎসব কর্‌তে পারেন।

—শুধু কর্‌তে পারেন না, করেও থাকেন। স্বর্গে ত আর উপবাস নেই, আছে শুধু উৎসব। স্বর্গে যদি একাদশী থাক্‌ত তাহলে কে আর সেখানে যেতে চাইত ? আমি ত নয়ই—

—উনি ত ননই ! যেন উনি যেতে চাইলেই স্বর্গে যেতে পেতেন।

—হুজুর আমি কোথাও যেতে চাইনে—যেখানে আছি সেইখানেই থাক্‌তে চাই।

—যেখানে আছেন সেইখানেই থাক্‌তে চান ! যেন উনি থাক্‌তে চাইলেই থাক্‌তে পেলেন। তুই বেটা ঠিক নরকে যাবি !

—হুজুর যেখানে যাবেন আমি সঙ্গে সঙ্গে যাব !

—দেখছেন পণ্ডিত মশায়, ঘোষালের আর যাই দোষ থাক্, লোকটা অনুগত বটে। যাক্ ও সব বাজে কথা, যার কপালে যা আছে তাই হবে—তুই এখন বল্ তারপর কি হ'ল ?

তার পর দেবতারা একটা বিদ্যুতের ছুঁচোবাজি ছেড়ে দিলেন। সেটা ঐ কপাটের ফাঁক দিয়ে গলে এসে অন্ধকারের বুকচিরে ব্রাহ্মণের ছেলের চোখের সুমুখ দিয়ে লাউডগা সাপের মত এঁকে বেঁকে গিয়ে সামনে পড়্‌ল। তার আলোতে দেখা গেল যে দশহাত দূরে একটা পর্ব্বতপ্রমাণ মন্দির খাড়া রয়েছে। ব্রাহ্মণের ছেলে অমনি "ব্যোমভোলানাথ !" বলে হুঙ্কার দিয়ে ছুটে গিয়ে সেই মন্দিরের দুয়োরে ধাক্কা মার্‌তে লাগল। একটু পরে ভিতর থেকে কে একজন হুড়্‌কো খুলে দিলে। তারপর ব্রাহ্মণ সন্তান ঢোকবার আগেই ঝড় জল হো হা করে মন্দিরের ভিতর গিয়ে পড়্‌ল আর অমনি বাতি গেল নিবে। এই অন্ধকারের মধ্যে ব্রাহ্মণের ছেলেটি হতভম্ব হয়ে দাঁড়িয়ে রইল।

—মন্দিরে ঢুকে ভ্যাবা গঙ্গারামের মত দাঁড়িয়ে রইল? আর পায়ের জুতো খুললে না—আচ্ছা ব্রাহ্মণের ছেলে ত!

—হুজুর, সে জুতোয় কিছু দোষ নেই,—রবারের।

—এই যে বল্‌লি বুট?

—বুট বটে, কিন্তু রবারের বুট। হুজুর আমার গল্পের নায়ক কি এতই বোকা যে মন্দির অশুদ্ধ করে দেবে?

তারপর অনেক ডাকাডাকিতে কেউ জবাব না করায় সে ভদ্রলোক অগত্যা হাতড়ে হাতড়ে কপাটের হুড়কো বন্ধ করে দিলে। তারপর পকেট থেকে দিয়াশিলাই বার করে জ্বালিয়ে দেখলে যে বাঁ-দিকে একটা হ্যারিকেন লণ্ঠন কাৎ হয়ে পড়ে রয়েছে। অনেক কষ্টে সেই লণ্ঠনটি জ্বেলে সে দেখ্‌তে পেলে—ডান-দিকে দেয়ালের গায়ে—খাড়া রয়েছে চিত্রপুত্তলিকার মত—একটি মূর্ত্তি। আর সে কি মূর্ত্তি! একেবারে মারবেল পাথরে খোদা। ব্রাহ্মণ সন্তান একদৃষ্টে সেই মূর্ত্তির দিকে চেয়ে রইল। সে দেখবার মত জিনিসও বটে। নাকটি তিলফুলের মত, চোখ দুটি পদ্মফুলের মত, গাল দুটি গোলাপফুলের মত, ঠোঁট দুটি ডালিম ফুলের মত, কাণ দুটি—

—রাখ্ তোর রূপবর্ণনা। লোকটা দেখ্‌ছি অতি হতভাগা। দেবতার দিকে হাঁ করে চেয়ে রইল, প্রণাম কর্‌লে না!

—আজ্ঞে তার দোষ নেই। মূর্ত্তিটি যে কোন্ দেবতার তা সে ঠাওর কর্‌তে পারছিল না। কালী, শীতলা, মনসা, চণ্ডী প্রভৃতি কোনও জানাশুনো দেবতা ত নয়।

—তা নাই হোক্, দেবতা ত বটে। দেবতা ত তেত্রিশ কোটি—মানুষে কি তাদের সবাইকে চেনে? আর চেনে না বলে প্রণাম কর্‌বে না?

—আজ্ঞে লোকটা সন্ন্যাসী। ওদের ত কোন ঠাকুরদেরতাকে প্রণাম কর্‌তে নেই—ওরা যে সব স্বয়ংব্রহ্ম।

—দেখ্‌ ঘোষাল, মিথ্যে কথা তোর মুখে আর বাধে না দেখ্‌ছি। এই মাত্র বলেছিস ব্রাহ্মণের ছেলে।

—আজ্ঞে মিথ্যে কথা নয়, তার গলা-ওল্টানো কোটের ভিতর দিয়ে পৈতা দেখা যাচ্ছিল।

—আবার বলছিস্‌ সন্ন্যাসী! দেখ্‌ যে, কখনো সাধুসন্ন্যাসী দেখে নি তার কাছে গিয়ে এই সব ফক্কুড়ি কর্‌। পরমহংস বলো, অবধূত বলো, নাগা বলো, আকালি বলো, গিরি বলো, পুরি বলো, ভারতী বলো, বাবাজি বলো, আর কত নাম করব—রামায়েৎ লিঙ্গায়েৎ কাণফাটা ঊর্দ্ধবাহু, দাদুপন্থী অঘোরপন্থী,—দেশে এমন সাধুসন্ন্যাসী নেই যে আমার পয়সা খায় নি, আর যার ওষুধ আমি খাই নি। কিন্তু কারও ত কখন পৈতা দেখি নি—এক দণ্ডী ছাড়া। তাদেরও ত বাবা পৈতা গলায় ঝোলানো থাকে না, দণ্ডে জড়ানো থাকে।

—হুজুর এ, ছোকরা ও সব দলের নয়। এ হচ্ছে একজন স্বদেশী সন্ন্যাসী।

—সন্ন্যাসী ত বিদেশীই হয়ে থাকে। তুই আবার স্বদেশী সন্ন্যাসী কোথেকে বার করলি? জানিসনে, গেঁয়ো যোগী ভিখ্‌ পায় না।

—হুজুর আমি বার করি নি, এরা নিজেই বেরিয়েছে। এরা ভিখ চায়ও না, নেয়ও না। এদের পয়সার অভাব নেই। এরা আপনার ছাইমাখা কোপনি-আঁটা টোঁ টোঁ কোম্পানীর দল নয়। এরা দীক্ষিত নয়—শিক্ষিত সন্ন্যাসী। এরা গেরুয়াও পরে, জুতো মোজাও পরে,

স্বামীও হয়, পৈতাও রাখে। এরা একসঙ্গে ভবঘুরে ও সহুরে, এক রকম গেরস্ত সন্ন্যাসী।

—এরা কিছু মানে টানে?

—আজ্ঞে এরা কিছুই মানে না, অথচ সবই মানে।

—কথাটা ভাল বুঝলুম না।

—বোঝা বড় শক্ত হুজুর। এরা হচ্ছে সব বৈদান্তিক শাক্ত।

—বৈদান্তিক শাক্ত আবার কি রে! এ বেখাপ্পা ধর্ম্মমত পয়দা কর্‌লে কে?

—হুজুর, জর্ম্মাণরা। যার সঙ্গে যা একদম মেলে না, তার সঙ্গে তা বেমালুম মিলিয়ে দিতে ওদের মত ওস্তাদ দুনিয়ায় আর কে আছে? ওরা যেমন পাটে আর পশমে মিলিয়ে কাশ্মীরী শাল বুনে এদেশে চালান দেয়—তেমনি ওরা শঙ্করের সঙ্গে শঙ্করী মিলিয়ে এদেশে চালান দিয়েছে।

—চোর বেটারা যেন ভেল চালায়, কিন্তু দেশের লোক তা নেয় কেন?

—আজ্ঞে সস্তা বলে।

অনেকক্ষণ চুপ করে থাকা উজ্জ্বলনীলমণির ধাতে ছিল না। তিনি বল্‌লেন—

—ঘোষাল যাদের কথা বল্‌ছে তারা সব প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধ। আমার পাসকরা শিষ্যেরাই হচ্ছে খাঁটি বৈদান্তিক বৈষ্ণব।

—অর্থাৎ এঁদের কাছে সাকার ও নিরাকারের ভেদ শুধু উপসর্গে; এবং সে ভেদজ্ঞানও এঁদের নেই, এঁরা খুসিমত সা'র জাগায় নি এবং নি'র জায়গায় সা বসিয়ে দেন!

রায় মহাশয়ের আর ধৈর্য্য থাক্‌ল না। তিনি বেজায় রেগে উঠে চীৎকার করে বল্‌লেন—

—তোমার টীকা টিপ্পনি রাখো হে ঘোষাল! আমার কাছে ও-সব বুজরুকি চল্‌বে না। ইষ্টপিটরা দুপাতা ইংরেজি পড়ে সব সোঽহং হয়ে উঠেছে। আমি জানি এরা সব কি—হয় বর্ণচোরা নাস্তিক নয় বর্ণ-চোরা খৃষ্টান। ঐ অকালকুষ্মাণ্ডটা বৈদান্তিক শাক্তই হোক আর বৈদান্তিক বৈষ্ণবই হোক, গেরস্তই হোক আর সন্ন্যাসীই হোক, স্বদেশীই হোক আর বিদেশীই হোক, তোমার ঐ ব্রাহ্মণের ছেলের ঘাড় ধরে ঐ দেবতার পায়ে মাথা ঠেকাও।

—হুজুর, ওকে দিয়ে যদি এখন প্রণাম করাই তাহলে আমার গল্প মারা যায়।

—আর যদি প্রণাম না করে ত কান ধরে মন্দির থেকে বার করে দে।

—হুজুর, তাহলেও আমার গল্প মারা যায়।

—যাক্‌ মারা। আমি ঐ সব গোঁয়ারগোবিন্দ লোকের যথেচ্ছা-চারের কথা শুন্‌তে চাইনে।

—হুজুর যদি জোর করেন ত আমি নাচার। গল্প তাহলে এই-খানেই বন্ধ করলুম।

—বেশ! এ মাসের মাইনেও তাহলে এইখানেই বন্ধ হল।

এই কথা শুনে ঘোষাল শশব্যস্তে বলে উঠল—

—হুজুর, আপনি মিছে রাগ কর্‌ছেন। মূর্ত্তিটে যদি দেবী না হয়ে মানবী হয়?

—এ আবার কি আজগুবি কথা বার করলি ? এই ছিল দেবতা আর এই হয়ে গেল মানুষ !

—দেবতা যে মানুষ আর মানুষ যে দেবতা হয়, এ ত আর আজগুবি কথা নয়। এ কথা ত সকল দেশের সকল শাস্ত্রেই আছে। তবে আমি ত আর পুরাণকার নই। এরকম ওলটপালট আমি কর্‌লে কেউ তা মানবে না—আপনিও বলবেন ওর ভিতর বস্তুতন্ত্রতা নেই। ব্যাপারখানা আসলে কি তা বল্‌ছি। হুজুর মনোযোগ কর্‌বেন। ব্রাহ্মণের ছেলে যখন মন্দিরের দরজা ঠেলছিল তখন ভিতরে যদি জন প্রাণী না থাকৃত, তাহলে হুড়কো খুলে দিলে কে ? আর যখন দেখা গেল যে মন্দিরের মধ্যে অপর কোনও কিছু নেই, তখন আগে যাঁকে প্রতিমা বলে ভুল হয়েছিল, তিনিই যে ও দ্বার মুক্ত করেছিলেন, সে বিষয়ে আর কোনও সন্দেহ থাক্‌তে পারে না। সেটি যখন দেখতে দেবীর মত অথচ দেবী নয়—তখন অপ্সরা না হয়ে আর যায় না।

—খুব কথা উল্টে নিতে শিখেছিস্‌ বটে।

ব্রাহ্মণের ছেলে যখন দেখলে যে সেই মূর্ত্তিটির চোখে পলক পড়ছে, নাকে নিঃশ্বাস পড়ছে, তখন্‌ আর তার বুঝতে বাকী থাকল না যে, স্বর্গের কোনও অপ্সরা অভিসারে বেরিয়েছিল, অন্ধকারে পথ ভুলে পৃথিবীতে এসে পড়েছে আর এই ঝড়বৃষ্টির ঠেলায় এই মন্দিরে এসে আশ্রয় নিয়েছে। বেচারা মহা ফাঁপরে পড়ে গেল। দেবী হলে পূজো করতে পারত, মানবী হলে প্রণয় করতে পারত, কিন্তু অপ্সরাকে নিয়ে সে কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়ল। তার মনের ভিতর এক দিক থেকে ভক্তি আর একদিক থেকে প্রীতি ঠেলে উঠে পরস্পর লড়াই করতে লাগল।

—কি বল্‌লি—ভক্তি ও প্রীতি পরস্পর লড়াই কর্‌তে লাগল? ও দুই ত এক সঙ্গেই থাকে।

—ও দুই শুধু একসঙ্গে থাকে না—একই জিনিস। আমাদের মতে ভক্তি পরাপ্রীতি আর প্রীতি অপরা-ভক্তি।

—মাপ করবেন গোঁসাইজি। ভক্তির জন্ম ভয়ে, আর প্রীতির জন্ম ভরসায়। ও দুই একসঙ্গে ঘর করে বটে, কিন্তু সে বোন্ সতীনের মত।

—ব্রাহ্মণের ছেলেকে ওরকম অকাট্যবন্ধে ফেলে রাখা ঠিক নয়! অপ্সরাদের প্রতি ভক্তি! রামো, সে ত হবারই জো নেই, তবে প্রণয়ে দোষ কি?

—হুজুর, দোষ কিছু নেই, সম্পর্কে বাধে না। তবে লোকে বলে অপ্সরার সঙ্গে প্রেম করলে মানুষে পাগল হয়।

—আরে তাতে কি গেল এল? যার সঙ্গেই হো'ক না প্রেম করলেই ত মানুষে পাগল হয়।

—কথা ঠিক, কিন্তু সে হচ্ছে একরকম সৌখীন পাগলামি। স্ত্রী-লোকের সঙ্গে ভালবাসায় পড়্‌লে লোকে মাথায় মধ্যম-নারায়ণ মাখে না, মাখে কুন্তলবৃষ্য। আর আপ্সরার টানে মানুষ হয় উন্মাদ পাগল। তখন স্বর্গে না গেলে আর মানুষের নিস্তার নেই—অথচ সেখানে প্রবেশ নিষেধ। কি বলেন পণ্ডিত মশায়?

—প্রমাণ ত হাতেই রয়েছে,—বিক্রমোর্ব্বশী।

—শুনলেন হুজুর, পণ্ডিত মশায় কি বল্‌লেন? এ অবস্থায় ও ব্রাহ্মণ সন্তানটিকে কি করে ভালবাসায় ফেলি?

—তাহলে কি গল্প এইখানেই বন্ধ হ'ল?

—আজ্ঞে তাও কি হয়? যা হল তা শুনুন—

ব্রাহ্মণের ছেলেকে অমন উসখুস করতে দেখে, সেই মূর্ত্তিটিও একটু ভীত ত্রস্ত হয়ে উঠল, অমনি তার কাঁধ থেকে অঞ্চল পড়ল খসে। ব্রাহ্মণের ছেলে দেখতে পেলে তার কাঁধে ডানা নেই, ব্যাপারটা যে কি তখন আর তার বুঝতে বাকি থাকল না। এখন বুঝছেন হুজুর, ওকে দিয়ে প্রণাম করালে কি অনর্থটাই ঘটত? একে তরুণ বয়েস, তাতে আবার হাতের গোড়ায়, পড়ে-পাওয়া ডানাকাটা পরি! তার উপর আবার এই দুর্য্যোগের সুযোগ। এ অবস্থায় পঞ্চতপা ঋষিদেরই মাথার ঠিক থাকে না—ব্রাহ্মণের ছেলে ত মাত্র বালা-যোগী। পরস্পর পরস্পরের দিকে চাইতে লাগল—ব্রাহ্মণ যুবক সিধে ভাবে, আর যুবতীটি আড়ভাবে। চার চক্ষুর মিলন হবামাত্র সেই সুন্দরীর নয়ন-কোণ থেকে একটি উল্কাকণা খসে এসে ব্রাহ্মণের ছেলের চোখের ভিতর দিয়ে তার মরমে গিয়ে প্রবেশ করলে। ব্রাহ্মণের ছেলের বুক বিলেতি বেদান্ত পড়ে পড়ে শুকিয়ে একেবারে সোলার মত চিমসে ও খড়খড়ে হয়ে গিয়েছিল—কাজেই সেই সুন্দরীর চোখের চকমকি-ঠোকা আগুনের ফুলকিটি সেখানে পড়বা মাত্র সে বুকে আগুন জ্বলে উঠল। আর তার ফলে, তার বুকের ভিতর যে ধাতু ছিল সে সব গলে একাকার হয়ে উথলে উঠতে লাগল আর অমনি তার অন্তরে ভূমিকম্প হতে সুরু হল। তার মনে হ'ল যেন তার পাঁজরা সব ধসে যাচ্ছে। সঙ্গে সঙ্গে তার সর্ব্বাঙ্গ থর থর করে কাঁপতে লাগল, মুখের ভিতর কথা জড়িয়ে যেতে লাগল, মাথা দিয়ে ঘাম পড়তে লাগল। এক কথায় ম্যালেরিয়া-জ্বর আসবার সময় মানুষের যে অবস্থা হয় তার ঠিক সেই অবস্থা হ'ল। ব্রাহ্মণের ছেলে বুঝলে তার বুকের ভিতর ভালবাসা জন্মাচ্ছে।

এই বর্ণনা শুনে উজ্জ্বল নীলমণি অত্যন্ত ঘৃণাব্যঞ্জক স্বরে বলে উঠলেন—

—আহা! পূর্ব্বরাগের কি চমৎকার বর্ণনাই হ'ল। রসশাস্ত্রে যাকে

বলে সাত্ত্বিক ভাব তার উপমা হ'ল কি না ম্যালেরিয়া-জ্বর। ঘোষাল যখন মধুর রসের কথা পেড়েছিল, তখনই জানি ও শেষটা বীভৎস রস এনে ফেলবে। আর লোকে বলবে ঘোষাল কি রসিক।

ঘোষাল এ সব কথার কোন উত্তর না করে স্মৃতিরত্নের দিকে চাইলে। সে চাউনির অর্থ—মশায় জবাব দিন। স্মৃতিরত্ন বল্‌লেন—

—ত্রিগুণের সাম্যাবস্থাতেই ত চিত্ত প্রকৃতিস্থ থাকে। আর তুমি যাকে সাত্ত্বিকভাব বল্‌ছ সেও ত একটা চিত্তবিকার ছাড়া আর কিছুই নয়। সুতরাং ও মনোভাবকে মনের জ্বর বলায় ঘোষাল কি অন্যায় কথা বলেছে?

—পণ্ডিত মশায়, শুধু তাই নয়। ম্যালেরিয়ার সঙ্গে ও জিনিসের আরও অনেক মিল আছে। দুয়ের চিকিৎসাও এক, মধুর রসেরও ওষুধ তিক্তরস। তত্ত্বকথার কুইনিন্ খাওয়ালে ভালবাসা মানুষের মন থেকে পালাতে পথ পায় না।—

দেওয়ানজি এ কথার প্রতিবাদ করে বল্‌লেন—কুইনিনে বুঝি জ্বর ছাড়ে? শুধু আট্‌কে দেয়। শিশি শিশি কুইনিন্ গিলেছি কিন্তু আমার পিলে—

রায় মহাশয় এতক্ষণ অন্যমনস্ক হয়ে কি ভাবছিলেন। উজ্জ্বল-নীলমণি ও স্মৃতিরত্নের কথায় তিনি কাণ দেন নি, কিন্তু দেওয়ানজির কথাটি তাঁর কাণে পৌঁছেছিল। তিনি মহা গরম হয়ে বললেন—

—চুপ করো হে দেওয়ানজি, তোমার পিলে কত বড় হয়ে উঠছে, সে কথা শুনে শুনে আমার কাণ পচে গেল। ঘোষালের যে যকৃৎ শুকিয়ে যাচ্ছে, কৈ ও ত তা নিয়ে রাত নেই দিন নেই যার তার কাছে

মাকে কাঁদতে বসে না। পিলে যকৃতের চাইতে যা দশগুণ বেশী সাংঘাতিক, তাই হয়েছে ঐ ব্রাহ্মণের ছেলের,—হৃদরোগ। ও যে কি ভয়ানক রোগ তা আমি ভুগে ভুগে টের পেয়েছি। সে যা হোক, ঘোষাল যে একটা ব্রাহ্মণের ছেলেকে রাতদুপুরে একটা তেপান্তর মাঠের ভিতর একটা মন্দিরের মধ্যে একটা মেয়ের হাতে সঁপে দিলে, অথচ তার কে বাপ্ কে মা, কি জাত কি গোত্র জানা নেই; সে বিষয়ে দেখছি তোমাদের কারও খেয়াল নেই। হ্যা দেখ্ ঘোষাল, তুই ব্রাহ্মণের ছেলের জাত মারবার আচ্ছা ফন্দি বার করেছিস! উজ্জ্বল-নীলমণি যে বলেছিল তোর ধর্ম্মজ্ঞান নেই এখন দেখছি সে কথা ঠিক।

—আজ্ঞে সে কথা আমি অন্য সূত্রে বলেছিলুম। যা ঘটনা হয়েছে তাতে ঘোষালের দোষ নেই। পূর্ব্বরাগ ত আর জাতবিচার করে হয় না। এ বিষয়ে বিদ্যাপতি ঠাকুর বলেছেন "পানি পিয়ে পিছু জাতি বিচারি"—

—বটে! তবে যাও মুসলমানের ঘরে খাও পানি, বদনায় করে। তারপরে এখানে একবার জাতবিচার করতে এসে দেখো কি হয়।

—হুজুর, গোঁসাইজি কথা ঠিকই বলেছেন—শুধু একটা কথায় একটু ভুল করেছেন। "পানি" না বলে ব্রাণ্ডিপানি বল্‌লে আর কোনও গোলই হত না। জল্ল অবশ্য যার তার হাতে খাওয়া যায় না, কিন্তু মদ সকলের হাতেই খাওয়া যায়। আর ভালবাসা জিনিসটে ত দুনিয়ার সেরা মদ।

—তোর দেখছি হতভাগা শুঁড়িখানা ছাড়া আর কোথায়ও উপমা জোটে না। তোরা দুটোয় মিলেছিস্ ভাল। একে মনসা তায় ধূনোর গন্ধ। একে ঘোষাল মূলগায়েন তার উপর আবার উজ্জ্বলনীলমণি

দোহার। এ বিষয়ে পণ্ডিত মশায়ের মত শুন্‌তে চাই—তোদের কথা শুন্‌তে চাই নে।

—অজ্ঞাত-কুলশীলার প্রতি ভালবাসার ঐরূপ আচম্বিতে জন্মলাভটা স্মৃতির হিসেবে নিন্দনীয়, কিন্তু কাব্যের হিসেবে প্রশস্ত। শকুন্তলা, দময়ন্তী, মালবিকা, বাসবদত্তা রত্নাবলী মালতী প্রভৃতি সব নায়িকারই ত—

—তাহলে কি আপনি বল্‌তে চান স্মৃতির ধর্ম্ম এক আর কাব্যের ধর্ম্ম আলাদা?

—আজ্ঞে তা ত হবেই। স্মৃতির কারবার মানুষের জীবন নিয়ে আর কাব্যের কারবার তার মন নিয়ে।

—কাব্যের শিক্ষা আর স্মৃতির শিক্ষা যদি উল্টো হয়, তাহলে মানুষে কোনটা মেনে চল্‌বে?

—দুটোই। কাজকর্ম্মে স্মৃতি আর লেখাপড়ায় কাব্য।

—দেখুন রায় মহাশয়, ঐখানেই ত স্মার্ত্ত ভট্টাচার্য্য মহাশয়দের সঙ্গে আমাদের মতের অমিল। আমরা বলি রস এক—তা সে জীবনেই হোক আর কাব্যেই হোক।

—তাহলে আপনারা কি চান, যে গল্পটা হোক জীবনের মত আর জীবনটা হোক্ গল্পের মত?

—আজ্ঞে তা নয় হুজুর। ভট্টাচার্য্য-মতে, জীবনে ফেন ফেলে দিয়ে ভাত খেতে হয় আর কাব্যে ভাত ফেলে দিয়ে ফেন খেতে হয়; কিন্তু গোস্বামী-মতে কি জীবনে কি কাব্যে একমাত্র গলা ভাতেরই ব্যবস্থা আছে।

—তুমি থামো ঘোষাল, এ সব বিষয়ে বিচার করবার অধিকার তোমার নেই। পরিণামবাদ কাকে বলে যদি বুঝতে……

—ঘোষাল তা না বুঝতে পারে, কিন্তু অপরিণামবাদ কাকে বলে তা বুঝলে আপনি ও সব বাক্য মুখ দিয়ে উচ্চারণ করতেন না। অলঙ্কার শাস্ত্র যদি ধর্ম্মশাস্ত্রের সিংহাসন অধিকার করে, তাহলে তার পরিণাম সমাজের পক্ষে কি ভীষণ হয় ভেবে দেখুন ত।

—ঠিক বলেছেন পণ্ডিত মশায়, উনি কাব্যে ও সমাজে ভেস্তে দিতে চান—যে দুয়ের প্রভেদ আকাশপাতাল। সমাজে হয় আগে বিয়ে, পরে সন্তান, তারপরে মৃত্যু; আর কাব্যে হয় আগে ভালবাসা তারপর হয় বিয়ে নয় মৃত্যু। এক কথায় মানুষের জীবনে যা হয় তার নাম প্রাণান্ত। কাব্য কিন্তু হয় মিলনান্ত নয় বিয়োগান্ত; হয় ঘটক নয় ঘাতক হওয়া ছাড়া কবিদের আর উপায় নেই।

—তাহলে তুই দেখ্‌ছি ঐ ব্রাহ্মণের ছেলের হয় জাত মার্‌বি নয় প্রাণ মার্‌বি।

—আজ্ঞে প্রাণে মার্‌তে পারি কিন্তু জাত কিছুতেই মার্‌ব না। হুজুরের কাছে গল্প বলছি, আর আমার নিজের প্রাণের ভয় নেই?

—দেখ তোকে আগেই বলেছি ব্রহ্মহত্যা কিছুতেই হতে দেব না।

—আজ্ঞে যদি আখেরে মাথায় বাজ পড়ে লোকটা মারা যায় সেও কি আমার দোষ?—এ দুর্য্যোগ কি আমি বানিয়েছি?

—কি বল্‌লি? ব্রাহ্মণের অপমৃত্যু, মন্দিরের ভিতরে আর আমার সুমুখে, বেটা আজ গাঁজা টেনে এসেছিস বুঝি! যেমন করে পারিস মিলনান্ত কর্‌তেই হবে—বিয়োগান্ত কিছুতেই হতে দেব না।

—আজ্ঞে আমিও ত সেই চেষ্টায় আছি। তবে ঘটনাচক্রে কি হয়

তা বল্‌তে পারি নে। একটা কথা আপনার পা ছুঁয়ে বল্‌ছি, যেমন করেই হোক আমি ওর জাত আর প্রাণ-দুই টিঁকিয়ে রাখব—তারপর যা হয়। হুজুর আমার বেয়াদবি মাপ করবেন, যদি একটু ধৈর্য্য ধরে না থাকেন তাহলে গল্প এগুবে কি করে, আর যদি না এগোয় ত তার অন্তই বা হবে কি করে।

—আচ্ছা বলে যা।

—তবে শুনুন।

ব্রাহ্মণের ছেলে প্রথমটা যতটা হতবুদ্ধি হয়ে পড়েছিল, শেষে আর ততটা থাক্‌ল না। সব বিপদের মত ভালবাসার প্রথম ধাক্কাটা সামলানো মুস্কিল, তার পর তা সয়ে আসে। ক্রমে যখন তার জ্ঞানচৈতন্য ফিরে এল, তখন সে সেই মেয়েটিকে ভাল করে খুঁটিয়ে দেখ্‌তে লাগলে। প্রথমেই তার চোখে পড়্‌ল যে মেয়েটির মাথার চুল কপালের উপর চুড়ো করে বাঁধা—আমাদের মেয়েরা নেয়ে উঠে চুল যেমন করে বাঁধে তেমনি করে,—বোধহয় চুল ভিজে গিয়েছিল বলে। তারপর চোখে এসে ঠেকল তার গড়ন। সে অঙ্গসৌষ্ঠবের কথা আর কি বল্‌ব। তার দেহটি ছিল তার চোখের মত লম্বা, তার নাকের মত সোজা আর তার ঠোঁটের মত পাতলা। কিন্তু বেচারি ভিজে একেবারে সপসপে হয়ে গিয়েছিল। তার শাড়ী চুঁইয়ে দরবিগলিত ধারে জল পড়্‌ছিল, মনে হচ্ছিল যেন তার সর্ব্বাঙ্গ রোদন কর্‌ছে। এই দেখে ব্রাহ্মণের ছেলের ভারি মায়া হল, সঙ্গে সঙ্গে তার বুকের ভিতরও আত্মাপ্রাণী কাঁদতে সুরু করে দিলে।

—"চলে নীলশাড়ী নিঙাড়ি নিঙাড়ি
পরাণ সহিত মোর।"

—কি? কি? উজ্জ্বল নীলমণি আবার কি বলে?

—হুজুর, গোঁসাইজির ভাব লেগেছে তাই ইনি পদাবলী আওড়াচ্ছেন। উনি বল্‌ছেন—

"চলে নীলশাড়ী নিঙাড়ি নিঙাড়ি
পরাণ সহিত মোর।"

—ঘোষাল! মেয়েটার পরণে কি রঙের শাড়ী ছিলরে?

—হুজুর, লাল।

—আঃ! ঐ এক কথায় সব মাটি কর্‌লে হে।

"চলে লাল শাড়ী নিঙাড়ি নিঙাড়ি
পরাণ সহিত মোর"

বল্‌লে ও কবিতার আর থাকে কি? আর যার তুল্য কবিতা ভু-ভারতে কখন হয়ও নি হবেও না, তারই কি না জান মেরে দিলে?

—গোঁসাইজি গোসা কর্‌ছেন কেন? আমি যে রঙ চড়িয়েছি তাতেই ত উপমা মেলে। মানুষের পরাণ যদি কেউ নিঙড়ায় তা হলে তা থেকে যা বেরবে তার রঙ ত লাল। তবে বল্‌তে পারিনে, হতে পারে যে কারও কারও রক্তের রঙ ও চামড়ার রঙ এক—ঘোর নীল।

—নাই পেয়ে পেয়ে এখন দেখছি তুমি ভদ্রলোকের মাথায় চড়্‌ছ।

—রাগ করেন কেন মশায়। কোনও সাহেবকে যদি বলা যায় যে তোমার গায়ের রক্ত নীল, তাহলে ত সে না চাইতে চাকরি দেয়।

আবার একটা বকাবকির সূত্রপাত দেখে রায় মহাশয় হুঙ্কার ছেড়ে বললেন,—

—যদি কথায় কথায় তর্ক তুলিস তাহলে রাত দুপুরেও গল্প শেষ হবে না—আর তুই ভেবেছিস এইখানেই আজ রাত কাটাব—

—হুজুর, তর্ক আমি করি? আমি একজন গুণী লোক—নভেলিষ্ট।

কথায় বলে যাদের আর গুণ নেই তাদের ছার গুণ আছে। যারা গল্প কর্‌তে পারে না তারাই ত তর্ক করে।

—ভারি গুণী ! কি চমৎকার গল্পই বল্‌ছেন।

—বটে ! আমি এইখান থেকেই ছেড়ে দিচ্ছি, আপনি গোঁসাইজি তারপর চালান দেখি ত কতক্ষণ চালাতে পারেন--হুজুরের এক প্রশ্নের ধাক্কাতেই উল্‌টে চিৎপাত হয়ে পড়্‌বেন—

—ওরে ঘোষাল, ভাল কথা মনে করিয়ে দিয়েছিস। আমার আর একটা প্রশ্ন আছে—মেয়েটার বয়েস কত ?

—উনিশ কি বিশ।

—সধবা না বিধবা ?

—কুমারী। কাব্যে হুজুর কুমারী ছাড়া আর কিছু ত চলে না।

—আমাকে বোকা পেয়েছিস না খোকা পেয়েছিস্ ? ছ-ছেলের মা র বয়েসী, আর তিনি হলেন কুমারী ! বাঙ্গালীর ঘরে কোথায় এত বড় আইবুড়ো মেয়ে দেখেছিস বল ত ?

—হুজুর, মেয়েটি ত বাঙ্গালী নয়—হিন্দুস্থানী।

—যেই একটা মিথ্যে কথা ধরা পড়েছে অমনি আর একটা মিথ্যে কথা বানাচ্ছিস। কোথাও কিছু নেই—বলে দিলি হিন্দুস্থানী !

—হুজুর, তার গায়ে ঝুলছিল সলমাচুমকির কাজ করা ওড়না, আর তার শাড়ীর সুমুখে ঝুলছিল কোঁচা।

—হো'ক না হিন্দুস্থানী। হিন্দুস্থানী ও ত হিন্দু। আর তোদের চাইতে ঢের পাকা হিন্দু। তাদের মেয়েদের পেটে থাক্‌তেই পাত্র ঠিক ও পত্র হয়ে যায়। জানিস দুধের দাঁত পড়্‌বার আগে মেয়ের

বিয়ে না হলে তাদের জাত যায়? কোন হিন্দুস্থানী হিঁদুর বাড়ীতে অত বড় মেয়ে আইবুড় দেখেছিস—বলৃত গাধা!

—হুজুর, মেয়েটা হিঁদু নয়, মুসলমান।

—কি বললি—মুসলমান? হিন্দুর মন্দিরে যেখানে শূদ্রের প্রবেশ নিষেধ, সেইখানে রাসকেল মুসলমান ঢুকিয়েছিস! মন্দির অপবিত্র হবে, ব্রাহ্মণের ছেলের জাত যাবে, কি সর্ব্বনাশের কথা! লক্ষ্মীছাড়িকে এখনি মন্দির থেকে বার করে দে!

—হুজুর, এই দুর্য্যোগের মধ্যে—

—দুর্য্যোগ ফুর্য্যোগ জানি নে, এই মুহূর্ত্তে ঐ মুসলমানীকে দে অর্দ্ধচন্দ্র।

—হুজুর, বাইরে ত দেবতা অপ্রসন্ন আর ভিতরেও যদি দেবতা আশ্রয় না দেন্ ত বেচারা যায় কোথায়? হো'ক না মুসলমান, মানুষ ত বটে,—আমাদের মত ওরও রক্ত-মাংসের শরীর।

—খোপ্‌সুরতি দেখে বেটার ধর্ম্মজ্ঞান লোপ পেয়েছে! আমার হুকুম মানবি কি না বল্? হয় ওকে মন্দির থেকে বার কর্ নয় তোকে ঘর থেকে বার করে দিচ্ছি,—এই জমাদার! ইস-কো গরদান পাকড়কে নিকাল দেও!

—হুজুর, একটু সবুর করুন। হুজুরের হুকুম তামিল না করতে হলে আমাকে কি আর এতটা বেগ পেতে হ'ত? ওকে কি আমাকে কাউকে গরদানি দিতে হবে না। মেয়েটি হিন্দুস্থানীও নয়, মুসলমানীও নয়, বাঙ্গালী কুলীন ব্রাহ্মণের মেয়ে।

—আবার মিথ্যে কথা? কুলীনের মেয়ে গায়ে ওড়না ওড়ে আর কোঁচা দিয়ে শাড়ী পরে।

—হুজুর, ও আমার দেখবার ভুল। শাড়ীটে ভিজে সুমুখের দিকে জড় হয়ে গিয়েছিল তাই দেখাচ্ছিল যেন কোঁচা—আর গায়ে ছিল চেলির চাদর তাই ওড়না বলে ভুল করেছিলুম।

—এই যে বল্‌লি সলমা চুমকির কাজ করা ?

—হুজুর, ঐ চাদরের উপর গোটাকতক জোনাকি বসেছিল তাই চুমকির মত দেখাচ্ছিল।

– তাই বল্‌। আঃ! বাঁচা গেল। ঘাম দিয়ে জ্বর ছাড়ল!

—হুজুর, আপনার না হোক আমার ত তাই। জমাদারের নাম শুনে ভয়ে ত আমার পাঁচ প্রাণ দশদিকে উড়ে গেছল। ভুল করে একটা কথা……

—অমন ভুল করিস কেন ?

—হুজুর, অমন ভুল অনেক বড় বড় কবিরাও করেন, আমি ত কোন্ ছার—তবে তাঁদের বেলায় সে সব ছাপার ভুল বলে পার পেয়ে যায়।

—সে যাই হোক। ঘোষাল এতক্ষণে গল্পটা বেশ গুছিয়ে এনেছে। কুলীন ব্রাহ্মণের মেয়ে, এতদিন বিয়ে হয় নি, শেষটা ভগবানের অনুগ্রহে কেমন বর জুটে গেল। একেই ত বলে প্রজাপতির নির্ব্বন্ধ। ঘোষাল, তোর মুখে ফুলচন্দন পড়ুক। তুই যে খালি ব্রাহ্মণের ছেলের জাত বাঁচিয়েছিস্ তাই নয়—ব্রাহ্মণের মেয়ের বাপেরও জাত বাঁচিয়েছিস্। এখন নিশ্চিন্ত মনে গল্প বলে যা। কি খেয়ে গল্প বলিস্ বল্ ত ? এবার তোকে বিলেতি খাওয়াব।

—হুজুরের, প্রসাদ চরণামৃত জ্ঞানে পান কর্‌ব, তারপরে মুখ দিয়ে বেরবে অনর্গল বিলেতি গল্প। এখন যা হল শুনুন।

ভালবাসা জিনিসটে অন্ততঃ কাব্যে একটা সংক্রামক ব্যাধি। কবিরা এক-জনের মনের সিগরেট থেকে আর একজনের মনের সিগরেট ধরিয়ে নেন। কাব্যের এ হচ্ছে মামুলি দস্তুর। তাই আমাকে বল্‌তেই হবে যে ব্রাহ্মণের ছেলের ভালবাসার ছোঁয়াচ লেগে সেই কুলীন-কুমারীর মনে, শ্যাম্পেনের নেশার মত আস্তে আস্তে ভালবাসার রং ধর্‌তে সুরু কর্‌লে।

—কি বল্‌লি—শ্যাম্পেনের নেশার মত আস্তে আস্তে? গাছে না উঠতেই এক কাঁধি—বিলেতির নাম শুনেই অজ্ঞান হয়েছিস্ আর বেফাঁস বকছিস। বেটা খাঁটির খদ্দের, শ্যাম্পেনের গুণাগুণ তুই কি জানিস? পোর্ট বল্ ক্লারেট বল্ জিন বল্ রম্ বল্ হুইস্কি বল্ ব্রাণ্ডি বল্,—আমার ত আর কিছু জান্‌তে বাকী নেই। শ্যাম্পেনের নেশা হয় ধরেনা, নয় চট্ করে মাথায় চড়ে যায়। ভালবাসার নেশা যদি আস্তে আস্তে চড়াতে চাস্ ত সেরীর সঙ্গে তুলনা দে,—গেলাসের পর গেলাসে যা রেক্তার গাঁথুনি গেঁথে যায়।

—হুজুর ঠিক বলেছেন, মেয়েমানুষের মনে ভালবাসা আস্তে আস্তে বাড়ে বটে, কিন্তু তার বনেদ্ খুব পাকা হয়। ওদের মনে ও বস্তু একবার শিকড় গাড়লে তা আর উপড়ে ফেলা যায় না—কেননা সে শিকড় শুধু ভিতরের দিকেই ডুব মারে। কিন্তু হুজুর এইখানে একটু মুস্কিলে পড়েছি। স্ত্রীলোকের ভালবাসা বর্ণনা করা যায় না, কেননা তার কোনও বাইরের লক্ষণ দেখা যায় না; আর যদি দেখা যায়, তাহলেই বুঝতে হবে সে সব হাবভাব, ভিতরে সব ফাঁকা।

—তবে কি ওদের মনের কথা জানবার যো নেই?

—আমি ত তা বলিনি,—আমি বলছি জানা দুঃসাধ্য কিন্তু অসাধ্য নয়। ওদের মুখ ওদের বুকের আয়না নয়। যেমন পুরুষের পাণ্ডুরোগ,

তেমনি স্ত্রীলোকের হৃদ্‌রোগ ধরা পড়ে চোখে, এখানেও মেয়েটা ঐ চোখেই ধরা দিলে। কি হল শুনুন।

তার চোখের ভিতর একটা অতি ঢিমে অতি ঠাণ্ডা আলো ফুটে ওঠল। কিন্তু সে আলো বিদ্যুতের। সে বিদ্যুৎ স্ত্রী-বিদ্যুৎ বলে অত ঠাণ্ডা। সেই স্ত্রী-বিদ্যুতের টানে ব্রাহ্মণের ছেলের চোখ থেকে পুং-বিদ্যুৎ ছুটে বেরিয়ে এল—তারপর সেই দুই বিদ্যুৎ মিলে লুকোচুরি খেলতে লাগল।

"নয়ন ঢুলাঢুলি লহু লহু হাঁস
অঙ্গ হেলাহেলি গদগদ ভাষ।"

—উজ্জ্বল নীলমণি আবার কি বলে হে?

—আজ্ঞে ওঁর ভাবোল্লাস হয়েছে তাই উনি আখর দিচ্ছেন।

—আখরই দিন আর যাই দিন্ আমি বলে রাখছি যে আখেরে ঐ "নয়ন ঢুলাঢুলি লহু লহু হাসের" বেশী আর আমি যেতে দেব না।

—আজ্ঞে এর একটা ত আর একটার অবশ্যম্ভাবী পরিণাম।

—রাখো হে তোমার পরিণামবাদ, অমন ঢের ঢের দর্শন দেখেছি।

—হুজুর, গোঁসাইজির কথা শুধু দর্শন নয়. বিজ্ঞানসম্মতও বটে। কোন বস্তুর ভিতর বিদ্যুৎ সেঁদুলে তা আপনি হয়ে ওঠে চুম্বক।

—বটে! হতভাগারা মরবার আর জায়গা পেলে না। দেবমন্দিরকে করে তুললে একটা কুঞ্জবন। যেমন আক্কেল ঘোষালের, তেমনি উজ্জ্বল নীলমণির—এখন দেখছি এ দুটো মাসতুতো ভাই।

—হুজুর, বড় বড় কবিরাও এ কাজ পূর্ব্বে করে গিয়েছেন।

—সত্যি নাকি পণ্ডিত মশায়?

—আজ্ঞে আমি ত কোন সংস্কৃত কাব্যে দেখি নি যে দেবালয় হয়েছে প্রেমের রঙ্গালয়।

—আমাদের পদাবলীতেও ও সব ব্যাপার মন্দিরের বাইরেই ঘটে। বিদ্যাপতি ঠাকুর বলেছেন—"যব গোধুলী সময় ভেলি ধনী মন্দির বাহির ভেলি।"

—ঘোষাল নিজে কর্‌বি কুকীর্ত্তি আর বড় বড় কবিদের ঘাড়ে চাপাবি দোষ।

—হুজুর, আমি মিথ্যে কথা বলি নি—বাংলার বড় বড় লেখকেরা এ কাজ না কর্‌লে আমার কি সাহস যে আমি আগে ভাগেই তা করে বস্‌ব,—আমি ত একজন ছোট গল্পকার। মহাজনো যেন গতা স পন্থা হিসেবেই আমি চলি।

—বাংলা আবার ভাষা, তার আবার লেখক, তার আবার নজির। মন্দিরের ভিতর আমি মধুর রসের চর্চ্চা আর বেশী কর্‌তে দেব না, কে জানে তোদের হাতে পড়ে সে রস কতদূর গড়াবে।

—তাহলে বলি হুজুর, ওটা আসলে মন্দির নয়, ভোগের দালান।

—আবার মিথ্যে কথা? এই হাজার বার বলেছিস্ মন্দির আর এখন বলছিস ভোগের দালান।

—হুজুর, মন্দির হলে আর তার ভিতর ঠাকুর থাক্‌ত না? আগেই ত বলেছি যে সেখানে একটি ছাড়া দুটি মূর্ত্তি ছিল না।

—তাও ত বটে। খুব ডিগ্‌বাজি খেতে শিখেছিস্। তুই আর জন্মে ছিলি গেরবাজ।

—হুজুরের কৃপায় এখন লোটন না হলেই বাঁচি!

—আচ্ছা যাক্, এখন তুই গল্প বলে যা, গল্পটা এতক্ষণে জমছে।

—হুজুর তার পর—

ব্রাহ্মণ সন্তানটি এমনি স্নেহভরে ব্রাহ্মণ কন্যাটির দিকে দৃষ্টিপাত করতে লাগল যে তার গায়ে সাত্ত্বিকভাবের লক্ষণগুলি সব ফুটে উঠল। তার কপাল বেয়ে ঘামের সঙ্গে সিঁথের সিঁদুর গলে তার ঠোঁটের উপর পড়্‌ল আর তার অধর পান-খাওয়া ঠোঁটের মত লাল টুকটুকে হয়ে উঠল।

—রোস্ রোস্ সিঁদুরের কথা কি বললি ?

—কই হুজুর, সিঁদুরের নামও ত ঠোঁটে আনি নি !

—উঃ তুই কি ঘোর মিথ্যাবাদী ! সিঁদুর শুধু নিজের ঠোঁটে আনিস নি, ওর ঠোঁটেও মাখিয়েছিস—

—তাহলে হুজুর, ও মুখ ফস্কে হয়ে গেছে।

—ও সব জুয়োচ্চুরি কথা আর শুনছি নে। একটা সধবাকে রাসকেল আমাকে ঠকিয়ে কুমারী বলে চালিয়ে দিচ্ছিল।

—আজ্ঞে সধবাই যদি হয় তাতেই বা ক্ষতি কি ?

—কি বল্‌লে উজ্জ্বল নীলমণি, ক্ষতি কি ?

—আজ্ঞে আমি বলছিলুম কি, নায়িকা ত পরকীয়াও হয়—

এ কথা শুনে সভাসুদ্ধ লোক একবাক্যে ছি ছি করে উঠল। উজ্জ্বল নীলমণি তাতে ক্ষান্ত না হয়ে বললেন—

—হয় কি না হয় তা বিবর্ত্তবিলাস, মীরাবাইয়ের করচা প্রভৃতি পড়ে দেখুন, এমন কি কবিরাজ গোস্বামী পর্য্যন্ত.........

এই কথায় একটা মহা হৈ চৈ পড়ে গেল, সকলে এক সঙ্গে কথা বল্‌তে সুরু করলে—কেউ কারও কথায় কান দিতে রাজি হল না। উজ্জ্বল নীলমণি তাঁর মিহি মেয়েলি গলা তারায় চড়িয়ে বক্তৃতা সুরু করলেন। "পিকোলোর" আওয়াজ যেমন ব্যাণ্ডের গোলমালকে

ছাড়িয়ে ওঠে—তাঁর আওয়াজও এই হৈ চৈ-এর উপরে উঠে গেল। সকলে শুন্‌তে পেলে তিনি বলছেন—

—আগে আমার কথাটা শেষ কর্‌তে দিন—তারপর যত খুসি চেঁচামেচি কর্‌বেন। স্বকীয়া ত পদকর্ত্তাদের মতে "কর্ম্মীনারী"—সে না হলে সংসার চলে না ; কিন্তু রস-সাহিত্যে তার স্থান কোথায়? দেখান ত পদাবলীতে·········

—রক্ষা করুন গোঁসাইজি থামুন, আপনার ও সব মত এখানে চল্‌বে না, আপনার পাস-করা শিষ্যেরা হ'লে ওর যা হয় তা একটা আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা বার কর্‌তে পারত, কিন্তু দেখছেন না পণ্ডিত মশায় রাগ করে উঠে যাচ্ছেন। আপনার পাপের বোঝা আমার ঘাড়ে নিতে আমি মোটেই রাজি নই। দাঁড়ান পণ্ডিত মশায়। ব্যাপারটা কি তা না বুঝেই আপনারা সব চঞ্চল হয়ে উঠেছেন। আসলে ঘটনা এই যে, মেয়েটি সধবা বটে কিন্তু পরকীয়া নয়।

—তুই দেখছি বেটা একেবারে বেপরোয়া হয়ে গিয়েছিস—যা মুখে আস্‌ছে তাই বলছিস। স্ত্রীলোকটা হ'ল সধবা অথচ কারও স্ত্রী নয়। এমন অসম্ভব কাণ্ড মগের মুলুকেও হয় না।

—হুজুর, আমি মিছে কথা বলি নি। মেয়েটির বিয়ে হয়েছিল বটে কিন্তু দশ বৎসর স্বামী নিরুদ্দেশ। আর সে যখন স্বামীর পথ চেয়ে বসে বসে শেষটা হতাশ হয়ে পথে বেরিয়ে পড়েছে—তখন তাকে বে-ওয়ারিশ হিসেবেই ধর্‌তে হবে।

—"নষ্টে মৃতে প্রব্রজিতে" এ বচন শাস্ত্রে থাকলেও কাব্যে নেই। একালে ও ওসব কথা মুখে আন্‌তেও নেই, কেননা তা শুনে অর্ব্বাচীনদের মতিভ্রম হতে পারে। আজ যদি তোমরা ও সব কাব্যে

চালাও, দু'দিন পরে তা সমাজে চল্‌বে, তারপর সব অধঃপাতে যাবে। দেখো ঘোষাল, তুমি আমার অতিশয় প্রিয়পাত্র, পুত্রতুল্য, কেননা তোমার নব নব উন্মেষশালিনী বুদ্ধি আছে; কিন্তু রঙ্গরসের ভূত যখন তোমার ঘাড়ে চাপে—তখন তুমি এত প্রলাপ বকো যে প্রবীণ লোকের পক্ষে সে ক্ষেত্রে তিষ্টোনো ভার। আজ যেরকম উচ্ছৃঙ্খলতার পরিচয় দিচ্ছ, তাতে আমি তোমাকে ত্যাগ করতে বাধ্য হচ্ছি।

এই বলে পণ্ডিত মশায় ঘর থেকে বেরিয়ে যাচ্ছিলেন, কিন্তু বিকচ্ছ হওয়ায় তাঁর গতিরোধ হ'ল। এই সুযোগে ঘোষাল তাঁর কাছে জোড়হস্তে নিবেদন করলে—

—আপনি আমার ধর্ম্ম-বাপ। আপনার পায়ে ধরি আমাকে বিনা অপরাধে ত্যজ্যপুত্র করে চলে যাবেন না। এতটা উতলা হবার কোনই কারণ নেই। সিঁথেয় সিঁদুর থাকলে যে সধবা হতেই হবে এমন ত কোনও কথা নেই। ও মেয়েটি ছিল ভৈরবী, তাই না তার মাথায় ছিল রুলি।

এ কথা শুনে সভা আবার শান্ত হ'ল, স্মৃতিরত্ন তাঁর আসন গ্রহণ করলেন। রায় মহাশয় কিন্তু খাড়া হয়ে বসে বজ্র-গম্ভীর স্বরে বল্‌লেন—

—ঘোষাল, তোর গল্প বন্ধ কর্—নইলে কত যে মিথ্যে কথা বানিয়ে বল্‌বি তার আর আদি অন্ত নেই—আজ তোর ঘাড়ে রসিকতার নয়, মিথ্যে কথার ভূত চেপেছে, ঝাঁটা দিয়ে না ঝাড়লে তা নামবে না।

—হুজুর, আমার একটি কথাও মিছে নয়। ভৈরবী না হলে কি

গেরস্তর ঝি বউ লাল শাড়ী পরে, লাল দোপাট্টা ওড়ে, কাছা কোঁচা দেয়, মাথার চুল চূড়ো করে বাঁধে, এক কপাল সিঁদুর লেপে—

—হোক না ভৈরবী, তাতেই তুই বাঁচিস কি করে? ভৈরবীর আবার প্রেম কিরে—

—হুজুর এতক্ষণই যদি ধৈর্য্য ধরে থাকলেন, তবে আর একটু থাকুন। গল্পের শেষটা শুনলে আপনি নিশ্চয়ই খুসি হবেন। শুনুন—

ঐ ভৈরবীটি আর কেউ নয়, ঐ ব্রাহ্মণের ছেলেরই স্ত্রী। ভদ্রলোক দশ বৎসর নিরুদ্দেশ হয়েছিল। দেশের লোক বল্লে তার মৃত্যু হয়েছে। কিন্তু পতিপ্রাণা রমণী সে কথায় বিশ্বেস করলে না। "আমার সিঁথের সিঁদুরের যদি জোর থাকে, তবে আমার হাতের লোহা নিশ্চয়ই ক্ষয় যাবে। আমি দিব্যচক্ষে দেখতে পাচ্ছি আমার স্বামী হয়েছেন স্বামীজি।" এই বলে সে স্বামীর সন্ধানে ভৈরবী সেজে বেরিয়ে পড়্ল। ভগবানের ইচ্ছায় এই পুণ্যস্থানে দুজনের আবার মিলন হ'ল। স্ত্রী স্বামীকে দেখামাত্রই চিন্‌তে পেরেছিল, কারণ এই দশ বৎসর শয়নে স্বপনে সে ঐ মূর্ত্তিই ধ্যান করেছিল। কিন্তু স্বামী তাকে চিন্‌তে পারে নি দেখে সে স্বামীকে একটু খেলিয়ে সন্ন্যাসের ঘোলাজল থেকে গার্হস্থ্যের শুকনো ডাঙ্গায় তোলবার মতলবে এতক্ষণ জড়সড় হয়ে ও মুড়িশুড়ি দিয়ে ছিল। তারপরে যখন সে চাদরখানি মাথা থেকে ফেলে দিয়ে সটান এসে স্বামীর সুমুখে দাঁড়াল, তখন ব্রাহ্মণ সন্তান বুঝতে পারলে "এই সেই"; অমনি সেই বৈদান্তিক-শাক্ত "তত্ত্বমসি" বলে ছুটে তাকে আলিঙ্গন করতে গিয়ে হাতের মধ্যে কিছুই পেলে না, শুধু দেয়ালে তার মাথা ঠুঁকে গেল। সঙ্গে সঙ্গে একটা দমকা হাওয়ায় মন্দিরের দুয়োর খুলে গেল আর তার ভিতরে ভোরের আলোয় দেখাগেল মন্দির একেবারে শূন্য

—এ আবার কি অদ্ভুত কাণ্ড ঘটালি।

—হুজুর ভূতের গল্প শুন্‌তে চেয়েছিলেন তাই শোনালুম।

বলা বাহুল্য ঘোষালের হাতে গল্পের এইরূপ অপমৃত্যু ঘটায়, সব

চেয়ে ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলেন উজ্জ্বল নীলমণি। তিনি দাঁত-খিঁচিয়ে বল্‌লেন—

—ভূতের গল্প না তোমার মাথা! পেত্নীর গল্প!

এই সময় বাড়ীর ভিতর থেকে খবর এলো যে মা-ঠাকুরাণীর মাথা ধরেছে। রায় মহাশয় অমনি হুড়মুড় করে উঠে ব্যতিব্যস্ত হয়ে তাঁর পঁয়ষট্টী বৎসরের ভোগায়তন দেহের বোঝা কায়ক্লেশে অন্দর মহলে নিয়ে গেলেন। সঙ্গে সঙ্গে সভাও ভঙ্গ হ'ল।

শ্রীপ্রমথ চৌধুরী।

বর্ণানুক্রমিক সূচী।

(আশ্বিন—চৈত্র)